প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

প্রচ্ছদ
তপন কর

প্রকাশক :
এস. চৌধুরী
লোকনিকেতন
২০/এ সেণ্ট্রাল রোড
কলিকাতা-৩২

মুদ্রাকর :
অজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

নিবেদন

বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতি আমার অনুরাগ আশৈশব। গানের দেশ বাংলাদেশ। পঞ্চাশ বছর আগেও কবিরদল, যাত্রা আর মুখা-নাচের দল আসত মেলায়, চৈত্র-গাজনোৎসবে। এদের দেখেছি মুগ্ধ নয়নে। অনুরাগে করেছি আপন, কখনও সজ্ঞানে আবার কখনও বা অজ্ঞানে। শৈশবের মুগ্ধ অনুরাগ, যৌবনের সপ্রশ্ন এষণায় পরিণত হলো একদিন। সেদিন লৌকিক জগতের আলো-আঁধারে পথের দিশারী ছিলেন স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। এঁরাই দেখালেন পথ, আর হাতে তুলে দিলেন পাথেয়। পরম আশ্বাসে তাই যাত্রা করেছিলাম এই দুর্গম লোকপথে, বাংলার গ্রামে-গ্রামান্তরে।

আমার গবেষণায় বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগে তিনি আমাকে ১৯৬৪ সালে 'রামতনু লাহিড়ী গবেষক' রূপে নিযুক্ত করেছিলেন। চরম দৈহিক সংকটের মধ্য দিয়েও যে উপদেশ ও নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও স্মরণ করি। তাঁর মৃত্যুহীন স্মৃতির প্রতি জানাই পরম শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন [নয়াদিল্লী] ১৯৬৬ সালে আমাকে 'লোক-সংস্কৃতিতে' গবেষণার জন্য 'ফেলোশিপ' বৃত্তি দিয়ে অপরিসীম সাহায্য করেছিল। ফলে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিক্রমা করে লোকসংস্কৃতির বহু মূল্যবান্ তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। 'বাংলার লোকোৎসব' আমার সুদীর্ঘ তিন বছরের সংগ্রহ, সংকলন ও বিচার-বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি।

অনেকে বলেন, লোকসংস্কৃতি ফসিল্। চার্লস ফ্রান্সিস পটার লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন: 'লোকসংস্কৃতি এমন এক প্রাণময় ফসিল যে কখনও মরে না।' মরতে পারেনা। কারণ মানুষের সৃষ্টি, মানুষের সংস্কৃতি কখনও মরে না। শুধু পরিবর্তিত হয় কাল থেকে কালান্তরে।

অতীত ও বর্তমানের সংযোগ সেতু লোকসংস্কৃতি। বঙ্গ সংস্কৃতির যে বিশাল স্বরূপ আজকে আমাদের সামনে বিকাশ লাভ করেছে, তার মূলে লোকসংস্কৃতির অবদান সমধিক। কোন জাতিকে জানতে হলে তার লোকসংস্কৃতির আন্তর পরিচয় জানা একান্ত প্রয়োজন। কেননা লোকসংস্কৃতি এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মানসলোকের অভিজ্ঞান। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ ও সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ডঃ বিনয়

সরকার বলেছেন : 'লোকায়ত অংশ বাদ দিলে বঙ্গসংস্কৃতির প্রায় সব কিছুই বাদ পড়ে। হাজার হাজার বছরের বাঙালীদের আসলধর্ম বাঙালীধর্ম, হিন্দু ধর্ম নয়।...লোকায়তের জয়জয়কার চলিতেছে বাঙালী সমাজে।'

যে কোন দেশের লোকের প্রকৃত এবং সার্থক মানস ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করতে হলে, সেই দেশের লোকাচার, লোকায়তদর্শন, ধর্ম ও উৎসবের ইতিহাস এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ সংগ্রহ, সংকলন, বিচার ও বিশ্লেষণ একান্ত জরুরী। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, : 'মানব-সমাজের অগ্রযাত্রায় সংস্কৃতিকর্ম অপরিহার্য। সর্বদেশে সর্বকালে সংস্কৃতি কর্মের ভেতর দিয়েই মানুষ জীবনের পথে অগ্রসর হয়।' সুতরাং মানবজীবনের মৌলিক পরিচয় তার সংস্কৃতির মর্মমূলে নিহিত। প্রকৃত মানব ইতিহাসের উৎস লোকায়ত সংস্কৃতি। বাঙালী মানসের দর্পণ তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ, নব নব বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার লগ্ন আজ সমাগত।

উনিশ শতকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রেরণায় বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান, [যেমন ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গান, উৎসব, গীতিকা ইত্যাদি], সংগৃহীত হয়েছে। আজও সেইধারা অব্যাহত। সে যুগে রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন ও চন্দ্রকুমার দে এবং আরো অনেকে এই কঠোর ব্রতের পুরোহিত ছিলেন। বিভিন্ন উৎসাহী কর্মী, গবেষক, চিন্তানায়ক, দেশপ্রেমিক এই মহানব্রতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের সাধনা লব্ধ সত্য ও তথ্য আমাদের আজকের অনুসন্ধান ও সমীক্ষার ধ্রুবতারা।

বাংলার লোকউৎসব আলোচনা প্রসঙ্গে আমি সমগ্র বাংলাদেশকে গ্রহণ করেছি। কারণ রাজনৈতিক কারণে বিভক্ত বাংলা দেশের সংস্কৃতিকে পূর্ব বা পশ্চিম আখ্যা দেওয়া চলে না। একই ভৌগোলিক ও জাতিগত পটভূমিতে বিকশিত একটি অখণ্ড সংস্কৃতির বিকাশধারা সীমার দেয়াল দ্বারা চিহ্নিত করা চলে না। মানুষের মনন ও সৃষ্টি সীমাতিক্রমী। লোকচক্ষুর অন্তরালে সেই সৃষ্টিশীল মানব-মন নিত্য নূতন উপাচার শাশ্বতকালের দেউলে অর্ঘ্য সাজিয়ে দিচ্ছে। ভাব ও ভাষা বাঁধনহারা পাহাড়ী নদীর মত। বাংলার পূর্ব-পশ্চিমের জীবন-তটভূমি তাই ভেঙে গেছে আমাদের অজ্ঞাতে। দুই প্রান্তের মানুষ সৃষ্টি স্বর্গের তীর্থে এক হয়েছে, অভিন্ন হয়েছে। উভয়ের সহযাত্রায় বাংলার সংস্কৃতির অমরাবতী। রাজনৈতিক খাতন্ত্র্য স্বীকার করেও বলতে হয় বাংলার সংস্কৃতি এক এবং অবিভাজ্য।

পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ও অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের অকুণ্ঠ স্নেহ, প্রেরণা ও নির্দেশ না পেলে এই দুর্গম পথে আমার যাত্রা সম্ভব ও সফল হত না। অসীম শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি তাঁদের যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলার গ্রামান্তর পরিক্রমা কালে আমাকে আতিথ্যদান ও সাহায্য করেছেন। বাংলার গ্রামের সেই সরল স্নেহশীল মানুষদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাঁদের কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। কারণ তাঁরাই আমার দুর্গম পথের একমাত্র বন্ধু।

পরম শ্রদ্ধা জানাই প্রয়াত আচার্য ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের পবিত্র পুণ্য স্মৃতির প্রতি, কারণ তাঁরাই ছিলেন পরম গুরু, আমার পি. এইচ. ডি. গবেষণাপত্রের অন্যতম পরীক্ষক।

প্রায় বিশ বছর আগে সংগৃহীত উপাদানের আলোকে রচিত নিবন্ধটির কিছু সংক্ষেপন, বর্জন ও সংযোজন করতে বাধ্য হয়েছি।

ডঃ সনৎকুমার মিত্র কয়েকটি ব্লক দিয়ে সাহায্য করেছেন। ডঃ মিত্রকে মুদ্রণের জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাই গ্রন্থমুদ্রণে অর্থানুকূল্যের জন্য। কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁদের রচনাংশ এই নিবন্ধে ব্যবহার করেছি তাদের সকলকে।

দুলাল চৌধুরী

উৎসবের দিন

মানুষের উৎসব কবে। মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। যেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দ্বারা চালিত করি সেদিন না; যেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বারা ক্ষুব্ধ করি সেদিন না; যেদিন প্রাকৃতিক নিয়ম পরম্পরের হস্তে আপনাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলির মতো ক্ষুদ্র ও জড়ভাবে অনুভব করি সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে—সেদিন তো আমরা জড়ের মতো উদ্ভিদের মতো, সাধারণ জন্তুর মতো—সেদিন তো আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্বজয়ী মানবশক্তি উপলব্ধি করি না—সেদিন আমাদের আনন্দ কিসের। সেদিন আমরা গৃহে অবরুদ্ধ, সেদিন আমরা কর্মে ক্লিষ্ট; সেদিন আমরা উজ্জ্বলভাবে আপনাকে ভূষিত করি না, সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহ্বান করি না, সেদিন আমাদের ঘরে সংসারচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায় কিন্তু সংগীত শোনা যায় না।

প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ; সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।

মাঘ/১৩১১ —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র

হলকর্ষণ উৎসব [নন্দলাল : শ্রীনিকেতন]
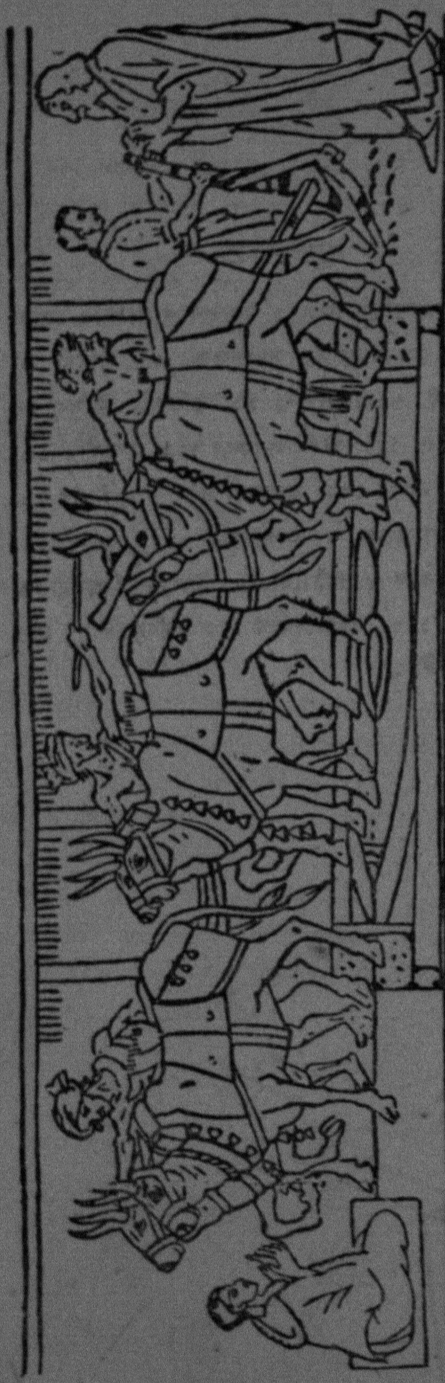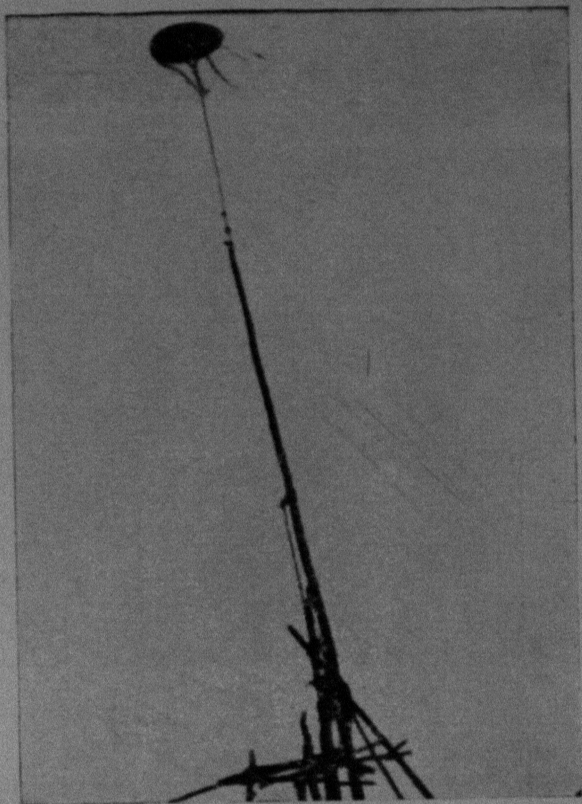
ছাতা পরব [চাকোলতোড় ঃ পুরুলিয়া]

গম্ভীরার শিবপূজা [মালদা]

বিচিত্র বেশী বোলান ভক্ত্যা [কেতুগ্রাম ঃ বর্দ্ধমান]
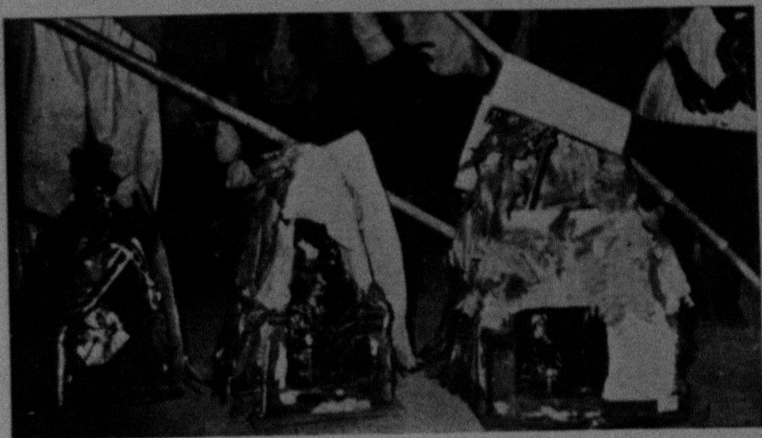
ঘেটু যায় খোশ পালায় [কানপুর ঃ হাওড়া]

ঘোড়ায় ধর্মঠাকুর [বেলিয়াতোড় ঃ বাঁকুড়া]

বাংলার লোকউৎসব

বাঙালী ও বঙ্গসংস্কৃতির উৎস

'বঙ্গ' নাম বৈদিক সাহিত্যে অনুপস্থিত। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' আর্যগোষ্ঠীর বহির্ভূত লোকসমাজকে বলা হয়েছে 'দস্যু'। এই 'দস্যু'-বাচক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে 'পাণ্ডু' নাম। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। 'ঐতরেয় আরণ্যকে'র 'বয়াংসি বঙ্গবগধাশ্চেরাপাদঃ' বাক্যে 'বঙ্গ-মগধ' শব্দের উল্লেখ জাতিবাচক 'বঙ্গ' শব্দের দ্যোতনা করে।* জৈন ধর্মগ্রন্থ 'বোধায়নের ধর্মসূত্রে' বঙ্গভূমির উল্লেখ ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর। আলোচ্য গ্রন্থে ভারতভূমিকে জাতিগত ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন: (ক) আর্যাবর্ত-হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গা-যমুনা অববাহিকা ভূমি। (খ) মালব-পূর্বদক্ষিণ বিহার, দাক্ষিণাত্য ও সিন্ধুউপত্যকা। (গ) আরট্ট পাঞ্জাব, বঙ্গ (মধ্য ও পূর্ববঙ্গ বোঝাত), পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), সৌবির (দক্ষিণ পাঞ্জাব), কলিঙ্গ (উড়িষ্যা)। রামায়ণে ও মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, পুণ্ড্র, মল্লার প্রভৃতি জনপদের একাধিক উল্লেখ রয়েছে। 'আচারঙ্গসূত্রে' বঙ্গকে রাঢ় বা লাঢ় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দেশের জনগণকে 'চোয়াড়' বলা হয়েছে। এই দেশে পথে-ঘাটে নিরাপদে চলাফেরা করা সম্ভব ছিল না। আগন্তুককে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হতো। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরকে কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার বিশদ বর্ণনা রয়েছে ঐ গ্রন্থে। তখন বঙ্গভূমি দুই খণ্ডে বিভক্ত ছিল: (ক) বজ্রভূমি, (খ) সুহ্মভূমি।

আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরীতে'ও বঙ্গভূমির সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। পালি ধর্মগ্রন্থ 'মিলিন্দপন্‌হে' 'বঙ্গনটপুত্ত' শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। এমন কি কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ও বাৎসায়নের 'কামশাস্ত্রে' গৌড় ও বঙ্গের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যাবে। আলেকজান্ডারের ঐতিহাসিক টলেমি, প্লিনি 'গঙ্গারিডির সবিশেষ

---

* 'বঙ্গ' ও 'বাঙ্গালা' শব্দদ্বয়ের ঐতিহাসিক বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য Hobson Jobson—A Glossary of Anglo-Indian Colloquial Words and Phrases. [London] 1978) /Col. Henry Yule & A. C. Burnell. দ্রষ্টব্য

উল্লেখ করেছেন তাঁদের বিবরণে। বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতায়' 'উপবঙ্গের' কথা কয়েকবার বলা হয়েছে। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত 'আশ্চর্যচর্যাচয়'[১] পদাবলীতে বর্ণিত হয়েছে ভুসুকুপাদ চণ্ডালীকে বিবাহ করে 'বঙ্গালী' হয়েছিলেন।[২] শুধু তাই নয় বাংলা ভাষার আদি অভিজ্ঞান আবিষ্কারের পূর্ববর্তী সংস্কৃত রচনায়ও বাংলা বা বঙ্গের ইতস্তত উল্লেখ আমাদের বিস্মিত করেছে। যেমন জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে', কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনীতে', ধোয়ীর 'পবনদূতে' ও সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে'। এই প্রসঙ্গে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'কালবিবেক' ও 'শেকশুভোদয়া' গ্রন্থও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহম্মদ বক্তিয়ার প্রণীত 'তবাকৎ-ই-নাসিরি' (১২৫০) গ্রন্থে 'লক্ষণাবতী', 'বঙ্গ' ও 'কামরূপ' প্রভৃতি জনপদের কথা বিশদ উল্লেখ রয়েছে। মার্কোপোলো, ইবন বতুতা 'বাঙ্গালা' শব্দের উল্লেখ করেছেন তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই 'বঙ্গ' শব্দ 'আল্' প্রত্যয়ান্ত হয়ে 'বঙ্গাল' রূপ নিয়েছিল। অবশ্য ত্রয়োদশ শতকের অনেক মুসলমান লেখকের রচনায় 'বঙ্গ' জনপদের 'লক্ষণাবতী' (প্রধাননগর) নাম পাওয়া গেছে। একাদশ শতকের 'তাঞ্জোর প্যাগোডার' উৎকীর্ণ লিপিতে 'বঙ্গালম্' (Vangalam) শব্দটি পরিদৃষ্ট হয়। পারসিক কবি হাফিজের কাব্যেও 'বাঙ্গালার' উল্লেখ আমাদের মুগ্ধ করে। পোর্তুগীজদের নথিপত্রে ও পর্যটকদের বিবরণী 'Citade de Bengalla' অথবা 'Citade de Chetia'. 'Citade de Bengala' বঙ্গালা ও চট্টগ্রাম (চাটিগা) শব্দদ্বয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রয়েছে।[৩] ষোড়শ—সপ্তদশ শতকে চট্টগ্রাম ছিল বাঙ্গালার প্রথম সীমান্ত বন্দর। এই বন্দর দিয়ে সুদূর প্রাচ্যে মসলিন ও মশলা রপ্তানী করা হোত। 'গঙ্গে' নামেও এরকম একটা বন্দর ছিল নিম্নবঙ্গে।

'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে'র একটি শ্লোকে 'বঙ্গ' শব্দটি দেশবাচকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ।

'কামসূত্রে' 'বঙ্গ' দেশের অবস্থান প্রসঙ্গে ভাষ্যকার যশোধর বলেছেন :

---

১ আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নাম দিয়েছিলেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। ডক্টর শহীদুল্লাহ নাম দিয়েছেন 'আশ্চর্যচর্যাচয়' (বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত)। এই বৌদ্ধ সহজিয়াপদাবলী বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন।

২ আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী॥ চর্যাপদ/৪৯ সংখ্যক পদ/ভুসুকুপাদ

৩ Journal of the Royal Asiatic Society | Vol. XI/1949/No. 1 |

'বঙ্গা লোহিত্যাৎ পূর্বেন'[১]। তিরুমলয় লিপিতে 'বঙ্গাল' এবং 'অভিধান চিন্তামণি' প্রণেতা হেমচন্দ্র ('বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়া') বঙ্গ ও হরিকেলের উল্লেখ করেছেন। এমন কি ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে গ্যাষ্টালডি তাঁর মানচিত্রে 'Bengala' শব্দের অবস্থান নির্দেশ করেছেন। সম্রাট আকবরের সমসাময়িককালে 'সুবা বাঙ্গালা' সুরমা তীরবর্তী শ্রীহট্ট, কৌশিকী বিধৌত কর্কজল (Karkjol) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২] আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে (১৫৯০) বলেছেন: পাহাড়ের নীচে ঢালু জমিতে 'আল্' (বাঁধ) দিতেন বঙ্গের প্রাচীন অধিপতিরা। তাই 'বঙ্গ' ভূমির নাম হলো বঙ্গাল বা বাঙ্গাল।[৩] এই বাঙ্গাল নাম দেশবাচক না জাতিবাচক—এ নিয়েও বহু মতবাদ প্রচলিত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'বঙ্গ' দেশবাচক। এই ভূখণ্ডে যে জনগোষ্ঠী বাস করত তাদের বলা হত 'অসভ্য দাস'। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেই বঙ্গভূমিতে আর্যরা আগমন করেন। হিমালয় সানুদেশের কিরাত জনগোষ্ঠীই ছিল আর্যদের প্রতিবেশী। সম্ভবত গাছের মূল এবং গুল্ম ব্যবহার কিরাত মেয়েরাই আর্যদের শিখিয়েছিল। 'ঐতরেয় আরণ্যকে' মগধের সঙ্গে 'বঙ্গ' জনগোষ্ঠীর নাম একাধিকার উচ্চারিত হয়েছে। পূর্বত্তর ভারতের 'অন্নামে' সপ্তম শতকে যে নরগোষ্ঠী অভিযান করেছিল তাদের মধ্যে একদল ছিল দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোক। আর অন্য দলের নাম 'বঙ্গালী'। অন্নামে যিনি রাজা হলেন তাঁকে বলা হোত 'লাক লাম'।[৪] 'বার্মার ইতিহাস'[৫] ও অন্যান্য নথিপত্র থেকে জানা গেছে রাজা লাকলোম অউকি (Aoki) নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। এই 'লাকলোম' গোষ্ঠি 'বংলং' (Bonglong) নামে অভিহিত ছিল। আরো জানা গেছে এই বংলংরা নাগ—উপাসক ছিল। প্রসঙ্গতঃ পূর্বভারতের মনিপুর ও নাগাভূমির নাগাদের কথা স্মর্তব্য। বিজয়চন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, আর্যাবর্তের কাছে অপরিচিত এই 'বংলং' মূলতঃ 'বাঙ্গালা' শব্দের উৎস।[৬] 'লং' একটা আমামিক

---

১ Kamasutra : Chowkamba Sanskrit Book Depot/New Delhi.
২ Studies in Indian Antiquities (1932)/Hemchandra Roy Chaudhuri.
৩ 'বঙ্গ'-শব্দজাত 'বঙ্গাল' শব্দটি পাইতেছি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দ হইতে। অনেকে মনে করেন যে 'বঙ্গাল' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ, "আল" প্রত্যয়যোগে গঠিত।...মনে হয় 'রাখাল', 'গোয়াল', 'সাঁওতাল' ইত্যাদির মতো 'বঙ্গাল' শব্দও "পাল" অন্তক সমাসনিষ্পন্ন শব্দের ত্রস্ব রূপ। অর্থাৎ 'বঙ্গপাল' (বঙ্গদেশের বা জলাভূমির রক্ষক, বাসিন্দা) হইতে 'বঙ্গাল' উদ্ভূত। সমগ্র বাঙ্গালা দেশ বুঝাইতে 'গৌড়বঙ্গাল' শব্দটি 'রামসোল্লাস'-এর গজনব বিভাগে উল্লিখিত আছে।
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস/১ম খণ্ড/পূর্বার্ধ (১৯৭০)/ডঃ সুকুমার সেন
৪ The History of the Bengali Language/BejoyChandra Mazumdar. (Calcutta University/1920)
৫ History of Burma : Colonel Phayre.
৬ Op cit. pp. 28

প্রত্যয়। অনার্য 'লা' প্রত্যয় 'লা'এর সঙ্গে তুলনীয়। 'বং' শব্দও 'বঙ্গ'এর সাদৃশ্য-বাচক। 'বঙ্গ', 'বংলং' বস্তুত আর্যেতর আদিবাসী। 'বাঙালা' শব্দও 'বঙ্গ' শব্দের মত প্রাচীন।[১] বাংলাভাষায় 'লা' প্রত্যয়ান্ত বেশ কিছু শব্দ প্রচলিত আছে। যেমন ঘোগলা, কোকলা, খোড়লা, কঞ্চিলা, গেলা ইত্যাদি। এই 'লা' প্রত্যয় স্বভাবতই অতীতকালবাচক। 'বংলং' বা 'বাঙালা' যে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার কোন অংশ বা প্রদেশের নাম ছিল এ বিষয়ে বিজয়চন্দ্র মজুমদার সংশয়াতীত ছিলেন। তাঁর মতে 'বঙ্গ' মূলত জাতিবাচক শব্দ। পাল বংশের শাসনকালে বাংলার বিভিন্ন প্রত্যন্তভূমি বরেন্দ্র, উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ় বঙ্গ নামে খ্যাত হয়েছিল।

পতঞ্জলি 'মহাভাষ্যে' (খ্রীঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দ) পূর্বভারতের তিনটি দেশ নাম উল্লিখিত হয়েছে—অঙ্গ, বঙ্গ ও সুহ্ম। 'বঙ্গ' বলতে তখন সুন্দরবন যশোর খুলনা ফরিদপুর ঢাকা ময়মনসিংহ ত্রিপুরা সিলেট ও নোয়াখালি নিয়ে বিস্তীর্ণ টিলা ও জলময় অঞ্চলকে বোঝাত। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন: বাঙ্গালা নামটি মুসলমান অধিকারকালের গোড়ার দিকেই চলিত হইয়াছিল। ফরাসী "বঙ্গালহ," হইতে পোর্তুগীজ Bongala ও ইংরেজী Bengal আসিয়াছে। মুসলমান অধিকারের আগে বাঙ্গালা দেশের কোন নির্দিষ্ট নাম ছিল না। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দ হইতে এদেশে সমগ্রভাবে সাধারণত গৌড় অথবা গৌড়দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইত। তাহার আগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল।[২] বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ঐতিহাসিক বলেন, 'একদা এদেশ গৌড়ভূমি বলে পরিচিত হয়েছিল, পরে মুসলমান যুগ থেকে এদেশের একাংশ বঙ্গের (পূর্ববঙ্গ) নামানুসারে গোটা ভূ-খণ্ডটাই বঙ্গ, বাঙ্গালা, বঙ্গাল প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হল, পাশ্চাত্য বণিকেরাও এই বাংলাদেশকে ভূগোলে স্বীকার করে নিল, রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ সবই আজ বঙ্গ-বাংলা নামের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।'[৩]

অনেক ঐতিহাসিক তাঁদের গবেষণালব্ধ গ্রন্থাদিতে 'বঙ্গ' নামটি জাতিবাচক বলে দাবী করেছেন। যেমন ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে 'বঙ্গ' একটি গোষ্ঠীবাচক

---

১ I am inclined to think that this "long" is the Annamese form of the non-Aryan suffix "la" and that not only the name Bong or Vanga as the name of a tribe, but the word "Bangla" is as old as the word Vanga. Op cit pp 28-29.

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস/প্রথম খণ্ড/পূর্বার্ধ (১৯৭০)

৩ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত/দ্বিতীয় সংস্করণ/১৩৭৭/ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম মাত্র। ভেনিস পরিব্রাজক মার্কপোলো বাঙ্গলা শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।[১] আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরীতে বলেন, এদেশের আদিনাম ছিল 'বঙ্গ'; তার সঙ্গে সংস্কৃত 'আলি' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হল 'বঙ্গালী' বা 'বঙ্গালি'। বঙ্গালি বলতে বাংলার অধিবাসীদের এখনও বোঝায়। দেশ বোঝাতে বলা হোত বঙ্গাল। ঐতরেয় আরণ্যকে 'বয়াংসি বঙ্গবগধাশ্চেরপাদাঃ' পদে বঙ্গ, বগধ (মগধ) ও চেরপাদাদের বৈদিক বিশ্বাস বহির্ভূত 'অব্রত', 'পক্ষী', 'ব্রাত্য' বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলি রাজার উপাখ্যানে[২] বলা হয়েছে যে তাঁর পঞ্চপুত্র। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম। সুতরাং 'বঙ্গ' শব্দ এখানেও জাতি বাচক[৩]। অষ্টম শতকে রচিত 'আর্যমঞ্জুশ্রীকল্প' গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ড্রের অধিবাসীকে 'অসুর ভাষাভাষী' বলা হয়েছে। দক্ষিণ বা মধ্যভারতে একদা যে 'আসুর সভ্যতার' বিস্তার ছিল, তা' সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে। এখানে বঙ্গ শব্দ দেশবাচক। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'বঙ্গ অতি প্রাচীন দেশ।'[৪] অবশ্য মহাভারতের আদিপর্ব ও রামায়ণে অন্যান্য জনদের সঙ্গে বঙ্গ জনদের উল্লেখ রয়েছে। মুঘল আমলে 'সুবা বাঙ্গালা' ও মধ্যযুগের 'বাঙ্গালা' সমার্থক হয়। 'যে বঙ্গদেশ আল্ বা আলিবহুল, যে বঙ্গদেশের উপরিভূমির বৈশিষ্ট্যই হইতেছে আল্ সেই দেশই বাঙ্গালা, বা বাংলাদেশ।'[৫] প্রকৃতপক্ষে গৌড়, বাঙ্গাল, রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি নাম কালক্রমে আত্মসাৎ করে বঙ্গ হয়ে উঠলো 'বাঙ্গালা'।[৬] আর এই বাঙ্গালা মধ্যযুগেই বাংলাদেশ নাম অর্জন করে বাঙ্গালীর সর্বক্ষেত্রের নত্রভূমিরূপে পরিচিত হলো। ইতিহাসের আর এক অনিবার্য গতিতে একদা দ্বিধাখণ্ডিত (১৯৪৭) বাংলা (Bangala) পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে পরিণত হয়েছিল। কালক্রমে ইতিহাসের ভ্রান্ত গতি চূর্ণ করে পূর্বপাকিস্তানের গর্ভ থেকে জন্ম নিলো হারানো সেই 'বাংলাদেশ'। প্রাচীন রাঢ়, সুহ্মভূমি আজও পশ্চিমবঙ্গ নাম নিয়ে আপন অস্তিত্বকে বহন করে চলেছে।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদগুলি প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কাল হতে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা-

১ Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal /Calcutta University/1942/ : Benoy Chandra Sen.
২ হরিবংশ দ্রষ্টব্য
৩ Ethnic Settlements in Ancient India/1955/Sashi Bhusan Chaudhuri.
৪ বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)/পৃঃ ১০৬
৫ প্রাগুক্ত/পৃঃ ১০৭
৬ 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' একাদশ শতকে দুই পৃথক জনপদ ছিল।'—প্রাগুক্ত

দেশ পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ (অথবা ব্রহ্ম), তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। সম্ভবতঃ সপ্তম শতকের প্রথমদিকে রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে এই জনপদগুলি ঐক্যবদ্ধে একটি দেশে পরিণত হয়। 'গৌড়' নাম তখন প্রাধান্য লাভ করে। যেমন বঙ্গপতি বলতে বোঝাত গৌড়েশ্বর, গৌড়াধিপ, গৌড়েন্দ্র ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে 'Bengal' এই শব্দটি পোর্তুগীজ 'Bengala' থেকেই উদ্ভূত নয়; তুটি শব্দই মুসলমান (মুঘল) যুগের 'বাঙ্গালা' থেকেই গৃহীত।[২]

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি বঙ্গ, বাঙ্গালা শব্দের প্রাচীনত্ব ও এই শব্দগুলি দেশবাচক না জাতিবাচক। কিছু কিছু ঐতিহাসিকের প্রাসঙ্গিক তথ্য উদ্ধৃতি সহকারে সেই আলোচনাকে যথাসম্ভব বাস্তব নির্ভর করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'ঐতরেয় আরণ্যক' আমাদের দৃষ্টিকে সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' শব্দের প্রতি আকর্ষণ করে। সেখানে 'বঙ্গ' শব্দ জন ও দেশ তুই বুঝিয়েছে। কালিদাস 'রঘুবংশে' বঙ্গকে গঙ্গা অববাহিকার দেশ রূপে চিহ্নিত করেছেন। বঙ্গ, উপবঙ্গ শব্দগুলি যে দেশবাচক আবুল ফজল[৩] তা সুনির্দিষ্টরূপে বলেছেন :

"The original name of Bangalah was Bang. Its former rulers raised mounds ten yards in height and twenty in breadth throughout the province which were called al. From this suffix, the name Bangalah took its rise and currency."

অনেকে আবার বলেছেন বঙ্গ ও বাঙ্গালা অভিন্ন ও সমার্থক।[৪] কিন্তু গ্রীয়রসন বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন যে 'বঙ্গালয়' শব্দই বাঙ্গালা শব্দের উৎস।[৫] বঙ্গের আলয় অর্থে বঙ্গালয় অর্থাৎ 'বঙ্গ' শব্দ শুধু জাতিবাচক। 'বঙ্গ' জাতি যেখানে বাস করেন তার নাম 'বঙ্গালয়'। ইতিহাসের বিচারে গ্রীয়রসন সাহেবের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ শুধু ভাষাতাত্ত্বিকের অনুমান মাত্র।

'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' শব্দদ্বয় দেশবাচক গ্রহণ করে এবার বাঙ্গালীর জাতিগত উৎস অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ভারতে আর্যদের আগমন ঘটেছে প্রায়

---

১ প্রাগুক্ত/পৃঃ ১৪৪

২ The English name Bengal, and its Portuguese form Bengala, were both derived, not from Vanga, as is generally supposed but from Vangala which the Muslim rulers adopted as the name of the provinces.
History of Ancient Bengal (1971) R. C. Mazumdar.

৩ আইন-ই-আকবরী

৪ Indian Historical Quarterly/XIX/P297/Dr. D. C. Ganguly.

৫ Linguistic Survey of India/Vol. V/Part 1/P. 11.

পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। অথচ গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাদের আগমন ঘটেছে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে। সুতরাং বাংলার অধিবাসীরা সরাসরি আর্যজন উদ্ভূত নয়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ইতিহাসের নজীর নিরীক্ষণ করে মন্তব্য করেছেন, 'বাংলাদেশে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমুদয় অন্ত্যজ জাতি দেখা যায় ইহারাই আদিম অধিবাসীদিগের বংশধর।'[১] এই মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ জনতত্ত্বের বিচারে দেখা গেছে বাঙ্গালী আর্যদের তুলনায় এক স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি। বাঙ্গালী জাতি সংকর জাতি—এ'কথা অনেকেই বলেছেন।

এবার বাঙ্গালী বলতে আমরা কাদের বুঝি তার একটা সূত্র নির্ণয় করা যাক। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গতঃ বলেছেন, "বাঙ্গালী জাতি" বলিলে, যে জনসমষ্টি বাঙ্গালাভাষাকে মাতৃভাষারূপে বা ঘরোয়া ভাষারূপে ব্যবহার করে, সেই জনসমষ্টিকে বুঝি।[২] বাঙ্গালা দেশের আদিম অধিবাসী মাত্রেই কি তবে বাঙ্গালী? নৃ-বিজ্ঞান অবশ্য এই প্রসঙ্গে আরো বৈচিত্র্যমণ্ডিত তথ্য পরিবেশন করে। কারণ বঙ্গ, বঙ্গাল, সমতট, সুহ্ম বা পুণ্ড্রে শুধু 'বাঙ্গালী' নামক একটি অখণ্ড জাতি বাস করত। 'মাত্র হাজার দুই বছর কি তার চেয়েও কম সময় নিয়ে' বাঙালীর অতীত ইতিহাস; খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে জাতিতত্ত্বের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা; মাগধী প্রাকৃতকে অবলম্বন করে বাঙলাভাষার বুনিয়াদ স্থাপন।'[৩] প্রকৃতপক্ষে দশম-দ্বাদশ শতকের 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা চর্যাপদ মূলতঃ বাঙ্গালীর প্রথম লিখিত সাহিত্যকর্মের অভিজ্ঞান। একটি জাতির সঙ্গে তার ভাষা অন্তরঙ্গভাবে জড়িত। অনেক সময় জাতি, ভাষা ও দেশ একাত্ম হয়ে যায়। দশম শতাব্দ থেকে বাংলাভাষা কি ভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা' এই ভাবে দেখানো যেতে পারে।[৪]

বৈদিক কথিত ভাষা→প্রাচ্য অঞ্চলের কথিত ভাষা→কথিত মাগধী প্রাকৃত→মাগধী অপভ্রংশ→প্রাচীন বাংলা→মধ্যযুগের বাংলা→আধুনিক বাংলা ভাষা।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্যযুগে সম্ভবতঃ আর্য প্রভাব বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করে এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে প্রত্যক্ষ সীমায় বিস্তারিত হয়। সপ্তম শতকেই আর্যবিস্তারের পরিসমাপ্তি। উয়াঙ চুয়াঙের (Hiuen Tsang) ভ্রমণ-

---

১ বাংলাদেশের ইতিহাস/পৃঃ ১০/ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

২ জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য/১৩৫২/পৃঃ ১

৩ বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা/১৯৬২/পৃঃ ৪৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৪ প্রাগুক্ত

লিপিতে এই মতের প্রতিষ্ঠা। তিনি আরো বলেছেন, 'কামরূপ পর্যন্ত আর্যভাষা প্রভাব বিস্তার করেছিল।' আর্য ভাষা বা সভ্যতা বিস্তারের পূর্বেই বাংলাদেশের নিজস্ব একটা কৃষ্টি ও সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। সেই সময় এই দেশে যেমন বহু জনপদ ছিল; তেমনি ছিল বহু কথ্যভাষা, আঞ্চলিক কৌমভাষা বা উপভাষা। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতালি, হো, মুণ্ডারি (এরা একই ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত), মালটো, কুরুখ (ওরাও)—এই উপভাষা পশ্চিমবাংলার সীমান্তে সহজ দৃষ্ট। পূর্বাঞ্চলের সীমানায় ভোটব্রহ্মশাখার লেপচা, রঙ, ধীমাল, লিম্বু, খাম্বু দাংজং-কা বা সিকীমীয়, লোকে বা ভুটানীয় (তিব্বতীয় বংশজ) ভাষা প্রচলিত। আর উত্তরে পাব বোড়ো বা কাছারি। কোচ, মেচ, রাভা), গারো, দিমাস, ম.., টিপ্রা, খাসী, মৈতেই, বার্মার সীমান্তবর্তী আরাকানী ইত্যাদি।[১]

আমরা জানি, বাংলাভাষা মাগধী প্রাকৃত, অপভ্রংশের বিবর্তনে উদ্ভূত। অসমীয়া, উড়িয়া হিন্দী ভাষার মতনই বাংলাভাষার জননী সংস্কৃত। কিন্তু বাংলার আদি অধিবাসীরা আর্য নন। বাংলার প্রাচীন জনপদের বৈচিত্র্যের মতই বাঙ্গালীর জাতিগত বৈচিত্র্যও কম চমকপ্রদ নয়। বাংলার শব্দসম্ভার বিশ্লেষণ করলেই আমরা দেখতে পাই যুগে যুগে যারাই বাংলাদেশে এসেছেন, তারা কিছু কিছু শব্দগত প্রভাব রেখে গেছেন। বাংলাভাষায় পোর্তুগীজ, আরবী, ফারসী, ইংরাজী, ডাচ, বর্মী, হিন্দী শব্দাবলী যেমন আছে, তেমনি আছে অসংখ্য দেশজ শব্দ। এই দেশজ শব্দাবলীর পরিমাণ অজস্র, যাদের উৎস হাজার বছরের বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে। লিখিত পাণ্ডুলিপি, পুঁথি অথবা দলিল-দস্তাবেজের উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে সেই হারানো আদিম বাঙ্গালার কোন সার্থক পরিচয় আমরা পুনরুদ্ধার করতে পারিনি। শুধু অনুমান ও সাম্প্রতিক নৃ-বিজ্ঞানের বা প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় কিছু কিছু আভাস, ইঙ্গিত পাচ্ছি মাত্র। বাংলাভাষার ইতিহাস যতটা

১ Within the Western boundary of Bengal is found Santali (Santali), a dialect of the Kol (Munda) group (of the Austro-Asiatic branch of the Austric family of speeches); and Ho and Mundari also Kol speeches closely related to Santali, are found to the West of Bengal. Besides two Dravidion dialects, intimately connected with each other, are found to the West of Bengal: Malto, which is spoken in the Raj Mahal Hills, and Kuruk (Kuruk) or Oraon (Orao), which just touches Bengali at its extreme Western fringe. In the north and east, Bengali comes in in touch with a number of speeches which are members of some six different groups of the Tibeto-Burman branch of the Tibeto-Chinese family. To the north, we have Lepcha or Rong, a dialect of the Tibeto-Himalayan group: Dhimal, Limbu and Khambu, which are 'pronominalised' speeches belonging to the same group, and are spoken by small numbers in the

রচিত হয়েছে, প্রায় সব কয়টাই লিখিত পুঁথি নির্ভর। অথচ যে বিপুল পরিমাণ অলিখিত মৌখিক ভাষাগত উপাদান বাংলাদেশের পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে ছড়িয়ে রয়েছে তার সংগ্রহ-সংকলন আজও আমরাও করতে পারিনি। ডঃ সুনীতিকুমারের (O. D. B. L.) বাংলাভাষার গবেষণার পর বিশেষ অগ্রসর হয়নি। হয়ত কেউ কেউ আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে কিঞ্চিৎ কাজ করেছেন। গ্রীয়ারসন সাহেবের Linguistic Survey of India গ্রন্থের পর আর কোন সুনিয়ন্ত্রিত ভাষা সমীক্ষা এদেশে হয়নি। ফলে যে নব নব বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব ইতোমধ্যে বিশ্বে আবিষ্কৃত হয়েছে তার ফলভোগে আমরা বিমুখ। চমস্কী / সোভিয়েত / প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদের সঞ্জননী ব্যাকরণ (Transformational Grammar) অথবা সমাজতাত্ত্বিক ভাষা বিচারের কোন ফলশ্রুতি বাংলা ভাষা গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলো না। তাই জনতত্ত্ব বিচারের এক বিশেষ দিক আমাদের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

বাংলাভাষার গোড়ায় যেহেতু আর্যেতর প্রভাবই বেশি, প্রত্যন্ত সীমার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী প্রতিদিন কিছু না কিছু আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করছে আর লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে কিছু কিছু উপকরণ বাংলাভাষা, সংস্কৃতিকে দিয়ে চলেছে। শিষ্ট সাহিত্যে এর প্রভাব অনুপস্থিত অথচ লোকসাহিত্যে বা সংস্কৃতিতে এর অতলান্ত প্রভাব কেউ অস্বীকার করতে পারব না। আমরা এখানে ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ফলশ্রুতি সযত্নে প্রয়োগ করে বাঙ্গালী জাতির এক সার্থক পরিচয় রচনার প্রয়াস পাব।

সপ্তম শতকের পূর্বে। আর্য আগমনের পূর্বে। বাংলাদেশে দুটি ভাষাগোষ্ঠীর লোক সম্ভবত বাস করত যেমন, অষ্ট্রীক বা কোল এবং দ্রাবিড়। ডঃ সুনীতিকুমার মনে করেছেন, পাঁচটি জাতির পাঁচটি ভাষা উত্তর ভারতের জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। নৃতত্ত্বের মতে সেই পাঁচটি জাতির নাম

---

extreme north ; Danjong-ka or Sikkimee and Lho-ke or Bhutanese, which are closely related forms of Tibetan. To the north-east and east, Bengali meets dialects of the Bodo group : Bodo (Bara) or Kachari (also known as Koe, Mee and Rabha), Garo, Dimasa as well as Mrung or Tipura ; it touches the area of the dialects of the Naga group ; and dialects of the Kukichin and Burma groups like Meithei (or Manipuri) and Lusai and Arkanese. Another aboriginal language not related to the Tibeto-Burman dialects mentioned above is spoken on the eastern frontier of Bengal, namely Khasi belonging to the Mon-Khemer group of the Austro-Asiatic languages and thus connected with the Kol speeches of West Bengal/O. D. B. L. Vol. 1/P 2-3/1970.

হলো : নেগ্রিটো (Negrito) ২. অষ্ট্রিক (Austric) ৩. দ্রাবিড় (Dravidian) ৪. আর্য (Aryan) ৫. ভোটচীন (Tibeto-Chinese)

বাংলাদেশের গ্রাম-নাম, খাদ্য-নাম ও কৃষিকর্ম-পদ্ধতি ও উপকরণ বিচার করলে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। উত্তর ভারতের আর্যভাষায়— কি সংস্কৃতে, কি প্রাকৃতে, কি আধুনিক আর্যভাষাগুলিতে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক প্রভাব খুব বেশি।[১] আচার্য সুনীতিকুমার কিছু কিছু গ্রাম-নাম, নদী-নামে আর্যেতর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। যেমন অনার্য ভোট ব্রহ্ম ভাষায় 'দিস্তা' হয়েছে 'তিস্তা' ও 'ত্রিস্রোতাঃ', কোল ভাষায় 'কব-দাক' থেকে 'কপোতাক্ষ', 'দাম-দাক' থেকে 'দামোদর', বিকৃত অনার্য নাম যথা প্রাচীন বাঙ্গালার 'আউম্বাগড্ডি', 'দিজ্জয়ক্কা জোলী', 'বদট' বা 'বড্ড', 'বাল্লহিট্ঠা', মোড়াসন্দী' ইত্যাদি, আধুনিক বাঙ্গালার বাগুইটি, মুড়াগাছা, বাঁকুড়া, চুঁচুড়া, পাবনা, বগুড়া ইত্যাদি।[২] আর্য আগমনের পূর্ব থেকেই অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী লোকেরা বাংলাদেশে বাস করছেন এবং তাদের প্রভাব বিভিন্ন বস্তুতে রেখে গেছেন। বাঙ্গালী সেই উত্তরাধিকারের উত্তরসূরী। সুতরাং আর্য প্রভাব বিমুক্ত বাংলাদেশের দেশ-নাম, গ্রাম-নাম, পল্লী বা কোলাচক্র, দেব-দেবী কল্পনা ইত্যাদির মধ্যেই বাঙ্গালীর সার্বিক পরিচয় নিহিত। চাষ, ধান, পান, হলুদ, সিন্দুর, কলা, সুপারি, এমনকি 'গঙ্গা' নামটিও অষ্ট্রিক ভাষাজাত। তুলার কাপড়ের উদ্ভাবকও এই অষ্ট্রিকরা।

বাংলাদেশের জনবিন্যাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে হলে শুধু ভাষাতত্ত্বের পরিচয় যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসের সংবাদ তথ্য। বাঙ্গালী মিশ্র জাতি বলেই তার কাঠামোতে অনেক রহস্য জট বেঁধেছে। উপরন্তু উপযুক্ত তথ্যাদির অভাবে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো দুরূহ ব্যাপার। তবুও আলোচ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমরা সম্ভাব্য সকল প্রকার তথ্য ব্যবহার করতে চেষ্টা করব।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছিলেন, 'বাঙালীর জনতত্ত্ব নিরূপণের কিছুটা সহায়ক উপায়, বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ।' অবশ্য একথা সত্য যে, ভাষা বিশ্লেষণের সাহায্যে নরতত্ত্ব ঠিক নির্ণয় করা চলে না ; কারণ মানুষ নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অথবা ধর্মগত কারণে ভাষা বদলায় ; একজন অন্যজনের ভাষা গ্রহণ করে এবং সেই ভাষাই দুই তিন পুরুষ পরে নিজেদের জাতীয় ভাষায় পরিণতি লাভ করে ;

১ জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য/ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
২ প্রাগুক্ত/পৃঃ ১৭

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।[১] তবে নরতত্ব বিচারে ভাষা যে কিঞ্চিৎ সহায়ক একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

বাংলাদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী প্রসঙ্গে তেমন কোন কোন নৃ-বিজ্ঞান সম্মত তথ্য আমরা পুঁথি-পত্রে পাই না। মহাকাব্য ও পুরাণাদির মধ্যে যে সামান্যতম উল্লেখ পাই, তারই আলোকে একটা ঐতিহাসিক পরিচয় এখানে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করব। মহাভারতে বঙ্গজনদের 'ম্লেচ্ছ' বলেছেন মহাকবি, এবং ভাগবতে সুহ্মদের 'পাপী' বলা হয়েছে; সুহ্মদের হুণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পাকসস, অবির, যবন ও খাসদের সমজাতীয় বলা হয়েছে। বোধায়নের ধর্মসূত্রে পুণ্ড্র ও বঙ্গজনদের সঙ্গে সহবাস অত্যন্ত নিন্দনীয় কর্ম বলে উল্লিখিত। এমনকি এই জনপদে সমাগমে প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। মহাভারতের কালে বঙ্গভূমি ছিল ম্লেচ্ছদের আবাস।[২]

মহাভারতের সভাপর্বে 'বঙ্গ' ও 'পুণ্ড্রদের' ক্ষত্রিয়জ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সিলভা লেভি ভাষার নিরিখে সিদ্ধান্ত করেছেন যে বঙ্গভূমির আদিমজনেরা আর্যেতর ছিলেন এবং তাদের ভাষা ছিল দ্রাবিড় থেকেও ভিন্ন।[৩] কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম ও চণ্ডাল এরাই বাংলার আদিম অধিবাসীর বংশধর। সাধারণভাবে এদের নিষাদ শ্রেণীর বলা হয়। নব্যপ্রস্তর যুগের এই বঙ্গ-মানব গোষ্ঠী যে অষ্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। এই অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে পরবর্তী বা সমসাময়িককালে দ্রাবিড় ও ভোটব্রহ্মী ভাষা-গোষ্ঠীর লোকেরা পূর্ব ও পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমায় সংশ্লেষিত হয়। আর এই ত্রিবেণী সংগমে 'বাঙ্গালীর' আত্মপ্রকাশ। এই সমীকরণ, প্রবাসন সমন্বয় ও ভাষাগত বিরোধের ইতিহাস নিঃসন্দেহে বিচিত্রতর। অথচ বঙ্গ-ইতিহাস এই প্রসঙ্গে নীরব। ঐতিহাসিককালে আর্য প্রভাবে একটি ভাষার দুরন্ত প্রভাবে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন আদিম মানবগোষ্ঠীর সমীকরণ ও একীকরণ সম্ভব হলো। শুধুমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক কারণে অখণ্ড ভূ-সীমায় একই পরাক্রান্ত রাজা বা সামন্ত প্রভুর শাসনে দুর্বল,

১ বাঙালীর ইতিহাস (আদপর্ব)/পৃঃ ৩১

২ In the Mahabharata peoples of Bengal are called Mlechchhas, the Bhagavata Purana (11. 4. 18) classes the Suhmas as a sinful (papa) tribe along with the Kiratas, Hunas, Adhras, Pulindas, Pukkasas, Abhiras, Yavanas and khasas, while the Dharama Sutra of Bodhayana prescribes expiatory rites after a sojourn amongst the Pundras and the Vangas.
History of Bengal/Vol 1/D. U. (1963) Edited : R. C. Majumdar.

৩ Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India/pp. 124-25
(Trnslation by P. C. Bagchi)

দরিদ্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী একই ফরমানের প্রতি নম্র স্বীকৃতি জানালো। তারই ফল-শ্রুতি আজকের 'বাঙ্গালী', বাংলার লোকায়ত সমাজ ও সংস্কৃতি। যুগে যুগে সংঘর্ষ যে পরাক্রমশালী ভূস্বামী বা সামন্তরাজের সঙ্গে দুর্বল নরগোষ্ঠীর হয়নি এমন নয়, অথচ ভাষা ও প্রশাসনের দুর্দমনীয় প্রভাবে, একই আর্থনীতিক প্রকরণে এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতায় সমস্ত শ্রেণী ভেদাভেদ চাপা পড়ে গেল।

জাতিতত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে এক সময়ে অনেক ঐতিহাসিক বা নৃতাত্ত্বিক রক্ত ও দেহগঠনের বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিতেন। সাম্প্রতিককালে এই পদ্ধতি ততটা কার্যকরী নয়। কারণ মানুষের অবিরাম মিলন-মিশ্রণে রক্তের ও দৈহিক রূপগত বিশুদ্ধতা বজায় থাকতে পারে না। বাঙ্গালী মিশ্র জাতি। সুতরাং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বা চণ্ডালের মধ্যে রক্ত ও দেহগত পরিমাপের পার্থক্য খুব ব্যাপক নয়। বর্ণ ভিত্তিক বিচারেও ঐ একই ফল আমরা পাব।

সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের সহায়তায় বাঙ্গালীর জনতত্ত্ব বিচার করা বর্তমান যুগে অনেক সাফল্যজনক ফল লাভ সম্ভব। সেইজন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগ বা বর্তমানের বাঙ্গালীর বাস্তব সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতির রেণু বিশ্লেষণে অধিকতর সাফল্য অর্জনও সম্ভব। বর্তমান নৃ-বিজ্ঞান গবেষণায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গবেষণার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব বিচারে আমরা এই বিজ্ঞানের গবেষণার ফলশ্রুতি গ্রহণ করতে পারি। তবে আমাদের শাস্ত্রে, সংহিতায় বা পুরাণে বাঙ্গালীর জাতিগত পরিচয় কতটুকু বিধৃত তাও আলোচনা করা দরকার। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' ব্রাহ্মণ, শূদ্রাদির যে বর্ণবিভাগ করেছেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক. উত্তম সংকর বিভাগ : করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, গান্ধিক, বণিক, শাংখিক কংসকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্মকার, গোপ, দাস, রাজপুত্র, নাপিত, মোদক, বারজীবী, সূত (সূত্রধর) মালাকার, তাম্বুলী, ও তৌলিক = বিশটি বর্ণ

খ. মধ্যম সংকর বিভাগ : তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আভীর, তৈলকারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক = বারটি বর্ণ

গ. অধম সংকর অন্ত্যজ বা বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃত : মলেগ্রহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, চর্মকার, ঘট্টজীবী বা ঘট্টজীবী, ডোলবাহী, মল্ল ও তক্ষ = নয়টি বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃত জাত।[১]

---

১ বৃহদ্ধর্মপুরাণ

প্রবাদে আছে বাঙালীর 'ছত্রিশ জাত'। আলোচ্য গ্রন্থে বত্রিশটি বর্ণ আর নয়টি বর্ণাশ্রম বহির্ভূত জাতের কথা জানা গেল। সেন যুগে বাংলাদেশের জাতিগত বর্ণবিভাগের ক্ষেত্রে আরো কিছু 'কুলীন' যুক্ত হয়ে বর্ণ প্রকরণকে সম্প্রসারিত করেছিল। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' অবশ্য আরো কয়েকটি ম্লেচ্ছ ও কোমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেমন, দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, গণকগ্রহবিপ্র, বাদক, পুলিন্দ, পুক্কশ, খসা, যবন, সুহ্ম, কম্বোজ, শবর, খর ইত্যাদি। রিজলী সাহেব বাঙালীর নরতত্ত্ব সম্পর্কে[১] যে মন্তব্যগুলি করেছেন তা' একটু আলোচনা করা যাক। তাঁর মতামত নিম্নে সাজানো হল :

১ বাঙালীরা প্রধানতঃ মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট। (Dravido—Munda Longheads+Mangolian short heads= Bengalee)

২ বাঙালীদের প্রকাণ্ড মুণ্ডের ধারা মঙ্গোলীয় শোণিতের দান, আর ব্রাহ্মণ কায়স্থদের উন্নত সুগঠিত নাসা ভারতীয় আর্য রক্তের মিশ্রণ-ফল।

রিজলীর মন্তব্যে কিছু ত্রুটি বিদ্যমান। কারণ যে 'দ্রাবিড়' নরগোষ্ঠীর কথা তিনি বলেছেন তা' ভ্রমাত্মক। দ্রাবিড় মূলতঃ একটি ভাষাগোষ্ঠী। অষ্ট্রিক[২] ভোট-চীনীয়, আর্য ও তেমনি ভাষাগোষ্ঠী। ভাষা থেকে জাতিগত পরিচয় সুচিহ্নিত করা সহজ নয়। অনেক সময় ভ্রান্ত পদ্ধতি বলে বিবেচিত। আর্যদের পূর্বেই ভারতে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর লোক বাস করত। বর্তমান দক্ষিণ ভারতেই এই ভাষাগোষ্ঠীর লোকের প্রাধান্য। এই দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরাই একদা ভারতের সুপ্রাচীন হরপ্পা ও মাহেন-জো-দড়ো সভ্যতা গড়ে তুলেছিল বলে মনে হয়।

দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মলয়ালম্, গোণ্ডী, কুই, কোলামী, কুরুখ (ওরাওঁ), মালতো এবং ব্রাহুই। ভারতের জনসংখ্যার বিংশ শতাংশ দ্রাবিড়ভাষী। অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা সাধারণত ইন্দোচীন, মাডাগাস্কার ও নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত। বর্তমান ব্রহ্মদেশের মার্তাবান উপসাগরীয় অঞ্চলে মোন্‌খমের ভাষা প্রচলিত রয়েছে। একাদশ শতকে মোন্‌

---

১ Tribes and Castes of Bengal, Vol. 1

২ ল্যাটিন Auster (অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ প্রান্ত) হতে Austric শব্দটি উদ্ভূত হইয়াছে। অষ্ট্রিক অর্থ দক্ষিণ দেশীয় জাতির মানুষ। বর্মার মোন্, কম্বোজের খমের, মাদাগাস্কার দ্বীপের 'মালাগাসি', নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি জাতির ভাষা—এ সকলই অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

ভাষার ইতিহাস/দ্বিতীয় পর্ব/১৯৬৯/শ্রীসুকুমার সেন

প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। খমের ভাষা শ্যাম (থাইল্যাণ্ড) ও ব্রহ্মদেশের প্রান্তিক অঞ্চলে প্রচলিত। এই অস্ট্রিক ভাষার একটি শাখার নাম অস্ট্রো-এশিয়াটিক (Austro-Asiatic)। অন্য শাখার নাম দক্ষিণ দ্বীপের শাখা (Austronesian)। মুণ্ডা (কোল), খাসী, নিকোবরী, মোন্‌খেমর (Monkhemer), নিকোবরী। মুণ্ডা শাখা আবার দ্বিস্রোতাঃ পশ্চিমা ও পূর্বী। পশ্চিমা শাখায় রয়েছে কোরকু, খাড়িয়া, জুয়াং, শবর আর পূর্বী শাখায় রয়েছে সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, ভূমিজ, কোড়া[১] মুণ্ডা বা কোল শ্রেণীর ভাষা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচলিত।

ভোটচীনীয় ভাষা-ভাষীরা মঙ্গোল জাতীয় মানুষ। তিব্বত থেকে ভোট-চীন জাতির বোদ বা ভোটরা ভারতে প্রবেশ করে। এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম ভাষাগুলি হলো তিব্বতী, লেপ্‌চা, কিরান্তি, গুরুং, আকা, আবর, দাফলা, বোড়ো, নাগা, মেইতেই, কাচিন, লুসেই, নাগাকুকি, গারো, ত্রিপুরা, শ্যামী, শান, আহোম, খাম্‌তি প্রভৃতি। রিজলে ভারতীয় প্রজাতিসমূহকে সাতভাগে বিভক্ত করেছেন।[২]

ভাষা সব সময় জাতিবাচক নয়। জাতি বিচার নৃ-বিজ্ঞানের বিষয়। তথাপি আমাদের দেশে পুরাণাদি বা সাহিত্যে কিছু কিছু জাতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' ব্রাহ্মণ বাদে অন্য সমস্ত জাতিই শূদ্র বলে কথিত। চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাপদে অন্ত্যজ বাঙালির কিছু উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। যেমন কাপালিক, যোগী, ডোম্বী, চণ্ডালী, শবরী, ব্যাধ, তাঁতি, ধুনরী, শুঁড়ি, মাহুত, নট-নটি, পতিতা প্রভৃতি বাঙালীর বর্ণ-সৌধের নিম্নভূমিবাসী। চর্যাগীতির ৪৯ সংখ্যক পদে সহজিয়া সাধক ভুসুকুপাদ বলেছেন :

> বাজ নাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
> অদঅ বঙ্গাল দেশ লুড়িউ।
> আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
> ণিঅ ঘরনী চণ্ডালী লেলী ॥

এখানে 'বঙ্গাল দেশ' ও 'বঙ্গালী' (স্ত্রী অর্থে) খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এমনকি চর্যাপদের কোন কোন পদে যে রাগের উল্লেখ আছে তাতেও 'বঙ্গাল' রাগের কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন : 'সঙ্গীতেতিহাসের দিক

১ ঢাকার ইতিহাস/দ্বিতীয় খণ্ড/১৩৯৯/শ্রীমুরারীমোহন সেন

২ a. Dravidian b. Mongoloid c. Mongolo-Dravidian d. Arya-Davidian e. Seytho-Dravidian f. Indo-Aryan g. Turko-Iranian.
The Ethnological Survey of India/1891

হইতে চর্যাগীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাগ শবরী ও বঙ্গালরাগ। শবরীরাগ তো নিঃসন্দেহে শবরদের মধ্যে প্রচলিত রাগ। এই লোকায়ত রাগটির মার্গীকরণ কবে হইয়াছিল বলা কঠিন, তবে ইহার উল্লেখ শুধু চর্যাগীতিতেই পাইতেছি, আগে বা পরে সে উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। বঙ্গাল রাগও যে কি ধরণের আজ আর তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই, তবে এই রাগটিও যে এক সময় গুর্জরী, মালশ্রী বা মালসী, শবরী প্রভৃতি রাগের মত স্থানীয় লোকায়ত রাগ ছিল সন্দেহ নাই। অথচ ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে বঙ্গাল-রাগ এক সময় সুপরিচিত রাগ ছিল, এবং অষ্টাদশ শতকের রাজস্থানী চিত্রনিদর্শনে বঙ্গাল রাগের চিত্রও দুর্লভ নয়।[১]

দশম-দ্বাদশ শতকের বাংলাদেশে 'বঙ্গাল' বা বাঙ্গালী জাতি যে শবর, পুলিন্দদের সঙ্গে সহাবস্থান করত তার চিত্র চর্যাপদে রয়েছে। বাঙ্গালীর কৌম সত্তা এতে প্রমাণিত। কুলজী গ্রন্থ বা বৃহদ্ধর্মপুরাণের পূর্বে বাঙ্গালী আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এক সুনির্দিষ্ট জাতি হিসাবে। 'বঙ্গ' যার স্বদেশ ও যে বঙ্গ-ভাষাভাষী, সেই বাঙ্গালী নামে পরিচিত। ইতিহাসের অনিবার্য প্রবাহে শবর পুলিন্দ-সুহ্ম-বঙ্গ একাত্ম হয়ে গিয়েছিল বঙ্গভূমিতে। চর্যাপদের একধিক পদে শবরদের উল্লেখ রয়েছে যেমন :

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥

'পূর্বভারতে শবরদের এক সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত সংস্কৃতির অবশেষ আমাদের জীবনযাত্রার নানা ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট। পাহাড়পুর মন্দিরের অসংখ্য মাটির ফলকে, শবর নরনারীদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ছবি যে ভাবে উৎকীর্ণ আছে, মনে হয়, জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। বাংলার নানা স্থানে। যেমন উত্তর বঙ্গে, এই শবররা কালক্রমে আমাদের হিন্দুসমাজের নিম্নতম স্তরে স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গিয়াছে।'[৩] শবররা আষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে অনুমিত হয়। বৌদ্ধদের। তিব্বতের। 'পর্ণশবরী' দেবী এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

---

১ 'প্রথমে আমরা দেখছি 'বঙ্গাল' বিংশতি প্রকার রাগের অন্যতম। দুই প্রকার বঙ্গাল রাগের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। একটিতে গ্রহ এবং অংশস্বর-নি, মন্দ্র-গান্ধার এবং তার মধ্যমের ব্যবহার আছে। অপরটি ষড়জগ্রামের অন্তর্ভুক্ত মন্দ্রহীন। এর গ্রহ, অংশ, ন্যাস-সা। এর পর আমরা বঙ্গালকে পাচ্ছি মালবকৌশিক গ্রামরাগের ভাষা হিসাবে।'

সঙ্গীত সমীক্ষা/১৩৬৬/পৃঃ ১০২/রাজ্যেশ্বর মিত্র

২ প্রাগুক্ত/পৃঃ ৭৬৩

৩ 'বাঙালীর আবির্ভাব'/বিশ্বভারতী/পত্রিকা/চতুর্থ সংখ্যা/ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

বাংলাদেশে অনার্য-ভাবিতার প্রধান লক্ষণ বাঙলার গ্রাম আর পল্লীর নাম।[১] পশ্চিমবাংলার পশ্চিম সীমানায় এখনও ভূমিজ, সাঁওতাল, ওরাওঁ বা মাল-পাহাড়ীরা বসবাস করছেন। রাঢ়ের ডোম চতুরঙ্গ সেনা (লাউসেন কাহিনী/ধর্মমঙ্গল) একদা এই অঞ্চলে ডোমদের প্রাধান্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পশ্চিমবঙ্গে দ্রাবিড় ভাষাভাষীর, পূবে ও উত্তরবঙ্গে মঙ্গোলদের প্রাধান্য ঐতিহাসিক কালেও ছিল। শ্রী পুশিলুসকি[২] কোলভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলার শব্দ অর্থের প্রকরণে তাবার প্রভাব কতকটা আলোচনা করেছেন। রাঢ় অঞ্চলে দুর্ধর্ষ অনার্য জাতি 'রাঢ়' যে একদা আধিপত্য বিস্তার করেছিল তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই কবি-কঙ্কন চণ্ডীতে।

'Austric ভাষী Proto-Austroloid বা দক্ষিণ জাতির লোকদের আর্যগণ প্রথম হইতেই 'নিষাদ' নামে অভিহিত করিত বলিয়া অনুমান হয়, 'শবর' ও পুলিন্দ এই নাম দুইটিও ইহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত।'[৩] সংস্কৃত সাহিত্যে বা রামায়ণে নিষাদদের উল্লেখ রয়েছে। এদের বলা হয়েছে 'অনাসা', কৃষ্ণবর্ণ। সম্ভবত 'প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড' জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এঁরা।[৪]

"প্রতিহাররাজ ভোজের সাগরতালের শিলালিপিতে 'ধর্মপালকে' 'বঙ্গপতি' এবং তাঁহার সেনাগণকে 'বাঙ্গালী' (বঙ্গান) বলা হয়েছে (গৌড়রাজমালা /২১ পৃষ্ঠা.)। প্রথম রাজেন্দ্র চোলদেবের তিরুমলয় পর্বতের লিপিতে 'বঙ্গলাদেশ' শব্দটা [Vangala-desh, where the rain-wind never stopped—ডাক্তার হুলজ (Hulzsch) কৃত ইংরাজী অনুবাদ] পাওয়া যায়। বঙ্গান্ হইতে 'বাঙ্গাল', 'বাঙ্গালা' সহজেই হতে পারে। তাঞ্জোরে একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে 'বঙ্গলম্' পদ দেখা যায়। বঙ্গ + আল্ > বঙ্গাল = বাঙ্গাল"।[৫] প্রাকৃতপৈঙ্গলে 'বংগাল' (বংগলা ভংগলা, বংঙ্গা, ভঙ্গাঃ) শব্দ 'বঙ্গবাসী' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

---

১ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ১৯৩২/পৃঃ ৪০

২ Pre-Aryan and and Pre-Dravidian

৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা/পঞ্চম বর্ষ। ২য় সংখ্যা। কার্তিক-পৌষ ১৩৫৩/পৃঃ ৯০ 'কোলজাতির সংস্কৃতি'—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৪ Racial Elements in the Populatioo/1944/B. S. Guha

৫ সংস্কৃত 'বঙ্গ' ইহার মূল শব্দ। ভিন্নভূমিতে পর্বতের পাদদেশে ব্রাহ্মণ যে সকল মৃত্তিকার 'আলি' দিয়াছিলেন, 'আল' সেই 'আলির' অপভ্রংশাকৃতি (Ayeen-E-Akbery, Vol. II, Part I,—The Soobah of Bengal)/মতান্তরে বঙ্গ+অলম্ (দ্রাবিড়ীয় ধাতু 'a'—to possess)—বঙ্গাল (বঙ্গদেশ), 'বাঙ্গাল',—লী (দ্র. বঙ্গ শব্দ)।

বঙ্গীয় শব্দকোষ/২য় খণ্ড/পৃঃ ১৪০৯/১১০৭—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন দেশ বা জাতির অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় সেই দেশের ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামো দ্রুত পরিবর্তনশীল। রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও শক্তির প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ফলে ভৌগোলিক কাঠামো প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। ভৌগোলিক সীমা নির্ধারিত হয় ভূ-প্রকৃতিগত সীমা ও ভাষার প্রসার দ্বারা। প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি ছিল বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত। যেমন পুণ্ড্র-গৌড়-সুহ্ম-রাঢ়া-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-হরিকেল ইত্যাদি। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বঙ্গভূমির বিচ্ছিন্ন জনপদ এক অখণ্ড ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করল। নাম হলো বঙ্গ। এই বঙ্গদেশ বা বঙ্গ মুসলমান আমলে 'সুবা বাংলা' নামে পরিচিত ছিল। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে বঙ্গে গমন করলে শুদ্ধিলাভার্থে যজ্ঞাদির বিধান দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।

তীর্থ যাত্রাংবিনা গচ্ছন পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাংলা নামের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন। বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল্[১] প্রত্যয় যুক্ত করে বাংলা বা বাঙ্গলা শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। পলি-বহুল বাংলা দেশে আল্ অনিবার্য প্রয়োজনে জমিতে ব্যবহার করা হয়েছে। মধ্যযুগের পর্যটকেরা বাংলার নাম করেছেন—Bengala, কিন্তু প্রাচীন বাংলায় 'বঙ্গাল' বলতে যে ভূ-খণ্ড বোঝাত, তা' বর্তমান বাংলার সমার্থক নয়। কারণ ঐতিহাসিক কারণে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামো আজ পরিবর্তিত।

বেদে বঙ্গ শব্দের উল্লেখ না থাকলেও, ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে সর্ব প্রথম এই দেশের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়।[২] "বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের পাদাঃ" পদে বঙ্গ জনদের বগধের (সম্ভবতঃ মগধ) সঙ্গে সমান মনে করা হয়েছে। বঙ্গ ও মগধ প্রাচীন কালে একই ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক সীমার মধ্যে ছিল। মহাভারতের আদি পর্বে বঙ্গ জনপদের উল্লেখ করা হয়েছে অঙ্গ-কলিঙ্গ-পুণ্ড্র এবং সুহ্ম জনপদের সঙ্গে। রামায়ণেও অনুরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে রাজা শশাঙ্ক গৌড়ের রাজ পদে অধিষ্ঠিত হন। শশাঙ্কের আমলেই রাঢ় থেকে উৎকল

১ সংস্কৃত 'আলি' প্রত্যয়। পূর্ববঙ্গে বলে "আইল"। এর অর্থ সীমা, যেমন জমিতে আল্ বা আইল দেওয়া হয়।

২ Marco Polo প্রভৃতি নাম

পর্যন্ত এক অখণ্ড ঐক্য দেখা দেয়। এবং গৌড় নামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তখন থেকেই বৃদ্ধি পায়।" পাল-রাজারা বঙ্গপতি হওয়া সত্বেও গৌড়াধিপ, গৌড়েন্দ্র, গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত হইতেই ভাল বাসিতেন।"[২] অষ্টম শতকে পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ প্রায় সমার্থক এবং একই ভূ-খণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "কিন্তু গৌড় নাম লইয়া বাংলার সমস্ত জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করিয়াছিলেন সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই, গৌড় নামের ললাটে সেই সৌভাগ্য অঙ্কিত বোধ হয় ছিল না। সেই সৌভাগ্য লাভ ঘটিল বঙ্গ নামের, যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, এবং যে-বঙ্গ নাম ছিল পাল ও সেন রাজাদের কাছে কম গৌরব ও আদরের, কিন্তু সমগ্র বাংলা দেশের বঙ্গ নাম লইয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নাই, তাহা ঘটিল তথা কথিত পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবরের আমলে, যখন সমস্ত বাংলা দেশ সুবা নামে পরিচিত হইল। ইংরাজ আমলে বাংলা নাম পূর্ণতর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।'

"সমগ্র দেশ বোঝাতে 'বাঙ্গালা' এই নাম মোগলদের অধিকার কালেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। তার আগে সমগ্র বাংলা দেশ বোঝাতে 'গৌড়-বঙ্গ' বা 'গৌড়-বাঙ্গালা' শব্দ ব্যবহার হত। বাঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি 'বঙ্গপাল' থেকে বলে মনে হয়। বাংলা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল সেকালে প্রধানত জলা জায়গা ছিল। এই জলা জায়গার সাধারণ নাম ছিল বঙ্গ। আর বঙ্গের অধিবাসীরা বঙ্গাল নামে খ্যাত ছিল অন্ততপক্ষে একাদশ শতাব্দী থেকে। প্রাচীন কালে আধুনিক বাংলা দেশ প্রধানত চার বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল বরেন্দ্রী, সুহ্ম, বা (রাঢ়) বঙ্গ ও কামরূপ। গৌড় বলতে সাধারণতঃ রাঢ়, বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিম বাংলা আর বঙ্গ শব্দে বঙ্গ কামরূপ অর্থাৎ পূর্ব ও উত্তর পূর্ব বাংলা বোঝাতো। শাসন কার্যের জন্যে বাংলা দেশ তখন চার ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল পৌণ্ড্রবর্ধমান ভুক্তি, দণ্ড ভুক্তি এবং প্রাগজ্যোতিষভুক্তি। পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে ছিল উত্তর ও পূর্ব বাংলা, বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল পশ্চিম বাংলা, দণ্ডভুক্তির অন্তঃপাতী ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা আর উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের সংলগ্ন অংশ, এবং প্রাগজ্যোতিষভুক্তির মধ্যে ছিল কামরূপ বা উত্তর-পূর্ব বাংলা ও আসাম।"[২]

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করল। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব দ্বিধা খণ্ডিত করা হল রাজনৈতিক প্রয়োজনে। কিন্তু ভাষা-

১ বাঙালীর ইতিহাস ([illegible]) পৃঃ ১৪৪/ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
২ [প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী/ ডঃ সুকুমার সেন]

সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করতে পারল না। যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে বহু যুগ ধরে ভারতবর্ষ রচিত করেছে, সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ছিন্ন করতে পারল না বৃটিশ সরকার। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ভাষা আচার সংস্কৃতির দিক থেকে আজও অখণ্ড এবং এক। বাংলার সংস্কৃতির বিচার ও বিশ্লেষণ করতে হলে অখণ্ড বাংলার সাংস্কৃতিক উপকরণ অবশ্যই বিচার্য। কেননা বহু যুগের সাধনায় যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একই জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা পেয়েছি তার কোন উপকরণ, উপাদান খণ্ডিত করা অপরাধ বলে মনে হয়। আমাদের আলোচনায় অখণ্ড বঙ্গদেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক উপকরণই গৃহীত এবং মূল্যায়িত হবে।

বাংলার ভৌগোলিক সীমা উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তটরেখা পর্যন্ত সুবিস্তৃত, পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমি ছুঁয়ে পূর্বে আসামের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশাল ভূ-খণ্ডকে ইংরাজ আমলে শাসন কাজের সুবিধার জন্য প্রায় আটাশটি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল। সংস্কৃতির দিক থেকে সিংভূম, মানভূম এবং পূর্ণিয়ার কতকাংশ এবং পূর্বে সিলেট, কামরূপ (প্রাগজ্যোতিষপুর) বাংলার অন্তর্ভূক্ত বলা চলে। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেমন ভূ-প্রাকৃতিক তারতম্য রয়েছে, তেমনি আঞ্চলিক ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যও রয়েছে। কারণ বাংলার প্রত্যেকটি অঞ্চল একই সঙ্গে গড়ে উঠেনি এবং লোক বসতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশ এক দিনে বিস্তার লাভ করেনি। বাংলার জনগোষ্ঠীর ইতিহাসেই বাঙালীর সংস্কৃতির উৎস নিহিত রয়েছে।

বাংলার নদ-নদীগুলো বাংলার জনপদজীবনের গতি-প্রকৃতি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে. গঙ্গা-ভাগীরথী, পদ্মা-মেঘনা, তিস্তা-মহানন্দা বাংলার লোকায়ত জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। পৃথিবীর বড় বড় সভ্যতাগুলি নদীর তীরকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। মিশরের সভ্যতায় নীল নদের, চীনের সভ্যতায় ইয়াংসি, ভারতের গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর দান অপরিসীম। কৃষিই সভ্যতার প্রথম শুকতারা। কৃষি ও কৃষিজীবনকে আশ্রয় করে প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশ। কিন্তু স্থায়ী সভ্যতার উন্মেষের পূর্বে অরণ্যচারী ও যাযাবর মানুষ বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করছিল। প্রাকৃতিক, অতি প্রাকৃত, ভৌতিক, দৈবিক শক্তির প্রতি ভয়, বিস্ময়, প্রতিরোধ এবং ভক্তিই মানুষের মনে দেবতার কল্পনার প্রেরণা দিয়েছিল। বৈদিক আর্যদের দেব কল্পনার পেছনেও অনুরূপ মনোভাব কাজ করেছিল। কিন্তু আর্য মানসিকতা ও কল্পনার সঙ্গে অরণ্যচারী মানুষের বা আর্যেতর মানুষের মানসিকতা ও কল্পনার পার্থক্য ছিল

প্রচুর। আর্য কল্পনায় দেবতারা কল্যাণের প্রতীক, আর্যেতর কল্পনায় দেবতারা প্রলয়ের প্রতীক। দেব-অসুরের বিরোধ এখান থেকেই শুরু।

বাংলার সংস্কৃতিকে 'মিশ্র সংস্কৃতি' বলেছেন বিশেষজ্ঞরা। এই মন্তব্যের কারণ অনুসন্ধান করা যাক্। বাংলাদেশে আর্যীকরণ এক দিনেই সম্ভব হয় নি। বহুদিন ধরে চলেছে আর্য উপনিবেশ স্থাপনের পালা। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে রচিত 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের লোকদের বলা হয়েছে 'দস্যু' এবং 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে বঙ্গ ও বগধ বা মগধ দেশের মানুষকে বলা হয়েছে 'অসুর'। বাংলা দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে কিরাত জনগোষ্ঠীর এবং রাঢ়ভূমিতে নিষাদ জনগোষ্ঠী যে প্রাচীন কালে বাস করত এই প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[১] আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বাংলার জনগোষ্ঠী উত্তর ভারতের জনগোষ্ঠী থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। বাঙ্গালার প্রাচীনতম অধিবাসীরা ছিল 'অনাসা,' 'কৃষ্ণগর্ভ'[২], 'মৃধ্রবাক', 'অকর্মণ', 'অদেবায়', 'অব্রাহ্মণ', 'অযজ্ঞবান্', 'অন্যব্রত', 'দেবপিয়' এবং 'শিশ্নদেব'। বেদে এদের বলা হয়েছে 'দাস' ও 'দস্যু'। নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা এবং গবেষণা প্রমাণ করেছে বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা ছিল উত্তর ভারতের চেয়ে ভিন্নতর। আদিম অধিবাসীদের বলা হয়েছে 'প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড' বা আদি অস্ত্রাল। এদের সীমাহীন অবদান রয়েছে বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতিতে। কালক্রমে অষ্ট্রিক (মুণ্ডা), দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠীর লোক আদি-অস্ত্রালদের সঙ্গে মিশ্‌লো। এদের উপর কালক্রমে আর্য সংমিশ্রণ ও প্রভাব পড়ল। আর্য ও আর্যেতর জনগোষ্ঠীর সমন্বিত প্রবাহের ফলশ্রুতি আজকের বাঙ্গালী।

"বাঙালী জাতি" বললে আমরা বুঝি বাংলা-ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে। বাঙালা দেশে, বাঙালা-ভাষী জনসমষ্টির মধ্যে, দেশের জলবায়ু ও তাহার আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবন যাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া এবং মুখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই "বাঙালী সংস্কৃতি"।[৩] বাংলার সংস্কৃতি মূলত গ্রাম্য জীবনধারাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। গ্রামগুলি

১ Kirata-Jana-Kriti—Dr. S. K. Chatterjee

২ "The earliest inhabitants of the land were a long-headed, broad-nosed and dark-skinned race, whom modern anthopologists call proto-Austro-loid or Veddaic race. They are the real Adivasis of the land".—History and Culture of Bengal/P. 25/A. K. Sur

৩ জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য/পৃঃ ১/ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আবার কৃষিভিত্তিক জীবনধারায় লালিত। অতএব এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বাংলার সংস্কৃতি কৃষি মৌল। আর্যেতর ভাষার মধ্যে অস্ট্রিক ভাষা বাংলা ভাষাকে বিশেষ প্রভাবিত করেছে। বাংলার গ্রামনামগুলি আর্যেতর ভাষার পরিচয়বহ। যেমন : 'ড়া' অন্ত নাম বাঁকুড়া, হাওড়া, রিষড়া, গোবড়া, বহুলাড়া ইত্যাদি। 'গুড়ি' অন্তিক নাম শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি লাঠাগুড়ি, ইত্যাদি। 'জুলি' অন্তিক নাম—নয়নজুলি ইত্যাদি। শোল-অন্তিক নাম-আসানশোল, কাঁকড়াশোল, নেকড়াশোল, হাতিশোল, আমড়াশোল, কুসুমাশোল, লোধাশোল ইত্যাদি। 'তোড়' অন্তিক শব্দ—খালতোড়, মহুলতোড়, বেলতোড়, মৌতোড়, চাক্‌লতোড়, ফুলতোড় প্রভৃতি। এ'ছাড়া আরো অংখ্য নাম উল্লেখ করা চলে, যাদের সঙ্গে অস্ট্রিক ভাষার এবং ভাষাগোষ্ঠীর জনসাধারণের কল্পনা ও মানসিকতার প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। অস্ট্রিকভাষীরা বা আদি অস্ত্রাল জনগোষ্ঠীর মানুষেরা একাধিক জীবনের কল্পনা করত। পুনর্জন্মবাদ ও পরলোকবাদে তারা বিশ্বাস করত। মৃত দেহের কবর দেওয়া এবং কবরে প্রস্তরস্তম্ভ বা পাথর স্থাপন (মেন্‌হির বা ডোলোমেন) করা তাদের ধর্মীয় রীতি। 'লিঙ্গ' পূজাও তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 'লিঙ্গ' শব্দটাই অস্ট্রিক ভাষার দান। অস্ট্রিক ভাষীরা বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল-ফুল, পশু-পক্ষী ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করত। বাংলার গ্রামনামগুলি বিশ্লেষণ করলে এর সত্যতা প্রমাণিত হবে।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন : বাংলা দেশে পাড়াগাঁয়ে গাছপূজা তো এখনও বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে সেঁওড়া গাছ ও নিম, বটগাছ, আর পাথর ও পাহাড় পূজাও একেবারে অজ্ঞাত নয়। বিশেষ বিশেষ ফল-ফুল-মূল সম্বন্ধে যে সব বিধি-নিষেধ আমাদের মধ্যে প্রচলিত, যেসব ফলমূল আমাদের পূজার্চনায় উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব প্রচলিত, আমাদের ঘরের মেয়েরা যেসব ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি করিয়া থাকেন, ইত্যাদি বস্তুত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচার অনুষ্ঠানই এই আদিম অস্ট্রিক ভাষা-ভাষী জনদের ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।......বাংলাদেশে বিশেষভাবে পূর্ব বাংলায়, এক বিবাহ ব্যাপারেই 'পানবিলি', গাত্রহরিদ্রা 'গুটিখেলা', ধান ও কড়ির স্ত্রী আচার প্রভৃতি যে সব অবৈদিক, অস্মার্ত ও অব্রাহ্মণ, অপৌরাণিক, অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেখা যায় তাহাও তো এই কৃষি সভ্যতা ও কৃষি-সংস্কৃতির স্মৃতিই বহন করে।" [বাঙালীর ইতিহাস। আদি পর্ব]।

আমাদের শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, শবর, ভূমিজ, হো প্রভৃতির পিতৃপুরুষের পূজার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। সম্ভবত তাদের আনুষ্ঠানিক

ঐতিহ্য আমাদের সংস্কৃতি প্রবাহে সঞ্চারিত হয়েছে। আর্যরা মূর্তিপূজা জানত না। কেননা বৈদিক সাহিত্যে তার কোন উল্লেখ নেই। মূর্তিপূজা প্রাক্‌বৈদিক যুগের আর্যেতর জনসমাজের সংস্কৃতি বলে মনে হয়। সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফলে আর্যদের মধ্যেও মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। দ্রাবিড়ভাষী লোকদের প্রভাবে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে মূর্তিপূজা, মন্দির, পশুবলি ইত্যাদি প্রচলিত হয়। বাংলার লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে আর্য ও আর্যেতর জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ের চিত্রটা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।

বাংলাদেশে বিশেষতঃ মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট অঞ্চলে সাঁওতাল, চাকমা, গারো, হাজং, মনিপুরীরা বসবাস করছেন সুদীর্ঘ কাল ধরে। তাদের লোকায়ত জীবনচর্চা ও লোকমানস বৃহত্তর বঙ্গসংস্কৃতিকে নানাদিক থেকে প্রভাবিত করেছে। মৈমনসিংহে গীতিকায় গারো এবং হাজংদের জীবনাচরণের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। কৃষিভিত্তিক জীবনে যে সংস্কৃতির জন্ম হয়, তা সর্বত্রই প্রায় একই ধারাকে অনুসরণ করে বিকাশ লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গে মাহাতো, কুর্মি, সাঁওতাল, ওরাওঁ, ডোম, বাগ্‌দী, বাউড়ী, কালিন্দী, উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ও টোটোদের জীবন চর্যা প্রায় সমজাতীয়। এরা অধিকাংশই অস্ট্রিক—মঙ্গোলয়েড ভাষাগোষ্ঠীর লোক। বাংলার জনবিন্যাসে এদের গুরুত্ব খুব বেশি। চাউল, তাম্বুল, কদলী, ময়ূর, কুড়ি (সংখ্যাবাচক) ঢেঁকি, ডোঙা প্রভৃতি শব্দ অস্ট্রিক ভাষাজাত।[১] ভারতীয় জনবিন্যাস ও সংস্কৃতিতে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের অবদান প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন: The descendents of the Austrics are found among the lower classes all over India and the Austrics have largely entered into the formation of the Hindu and Moslem people of India to-day.[২]

চিরায়ত সংস্কৃতি এবং লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। কারণ ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনে, স্মৃতিশাসিত কৌলিন্য সমাজের আচার-আচরণের একটা শাস্ত্রীয় রীতি আছে। লোকায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই রীতির বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রীয় পূজাপার্বণে যেমন সূর্যোৎসব, উপনয়ন, বিবাহ, প্রভৃতিতে অনুশাসনই মুখ্য এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত অপরিহার্য। পক্ষান্তরে লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বনে নিম্নবর্ণের (হাড়ি, বাগ্‌দী, ডোম, প্রভৃতি) প্রাধান্যই বেশি। কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণ লৌকিক পূজা-পার্বণে অপরিহার্য নয়। তাছাড়া মূর্তি কল্পনায়

১ 'The Austro-Asiatic people perhaps form the substratum of the masses of the Bengali people'. Traditional Culture in East Pakistan/P. 3
Dr. Md. Sahidulah & Dr. Md. Abdul Hai

উৎসে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। হিন্দুদের শাস্ত্রীয় পূজায় যেমন শাস্ত্রীয় দেবমূর্তির অধিকাংশই নর-নারীর প্রতিকৃতি এবং সঙ্গে অবশ্য বাহন বা সহচর থাকে পশু-পক্ষী ইত্যাদি। 'অশাস্ত্র ব্রতদের উৎসবে, পার্বণে তেমনি দেখছি গাছপালা নদী, পাহাড়, গোবরডেলা, শঙ্খ, সূর্য, আকাশ, পৃথিবী, পাথর, ধ্বজা প্রভৃতি। এই ধরণের মূর্তি পরিকল্পনার পেছনে আদিম প্রতীক মানসিকতা সক্রিয় রয়েছে। প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক শক্তির প্রভাব রয়েছে অসামান্য। এমনকি হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-আচরণে অনেক উপাদান রয়েছে যা' মূলত আর্যেতর সংস্কৃতির ফসল। যেমন দুর্গোৎসবে 'নব পত্রিকা' পূজা এবং 'শত্রুবলি' ইত্যাদি। বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ বিনয় সরকার বলেন: "বঙ্গ হিন্দুধর্মের পূজাপার্বণের আবহাওয়ার প্রায় ষোল আনাই লৌকিক, অনার্য।[১] এই লোকায়ত ধ্যান ধারণা, আচার বাংলার পূজাপার্বণ বঙ্গসংস্কৃতির মূল বুনিয়াদ।

লোকসংস্কৃতি কোন একক ব্যক্তির সৃষ্ট নয়। বরং সমগ্র সমাজের সৃষ্ট। বাংলার লোকসাধারণের সৃষ্ট সংস্কৃতির নাম লোকসংস্কৃতি। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, ভূমিজ, হো, গারো, রাজবংশী, হাজং এদের সমগোত্রীয় ডোম, বাগ্দী, বাউড়ী, বাঁশফোঁড়, নমঃশূদ্র, মাল মুসলমান প্রভৃতির সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি। গোষ্ঠীবদ্ধ সংহত জীবনে সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব। অরণ্যচারী নিঃসঙ্গ মানুষের একক প্রচেষ্টায় কোন উন্নত সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। গোষ্ঠীবদ্ধ পঞ্চায়েতী জীবনে আদিবাসীদের অন্তহীন আস্থা। সাঁওতালরা তাই বলেন: 'সিংমারে সিংবোঙ্গা ওতেরে পঞ্চ'—অর্থাৎ আকাশে সূর্য, মাটিতে পঞ্চায়েত। সূর্য যেমন তাদের উপাস্য, তেমনি পঞ্চায়েতী জীবন তাদের আন্তরিক কাম্য। লোকায়ত সমাজে যেখানে সংহতি যত দৃঢ় এবং বহিরাগত উপকরণ জাতীয়করণে সক্ষম, তাদের সংস্কৃতি ততই উন্নত হয়। কোন জাতির ইতিহাস রচনায়, সেই জাতির লৌকিক সংস্কৃতির উপাদান আহরণ অপরিহার্য। বাংলাদেশের লৌকিক ইতিহাসই বাঙালীর ইতিহাস। মানস-সংস্কৃতির পরিচয় ব্যতীত কোন জাতির প্রকৃত ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। লোকসংস্কৃতিতে মানস-ইতিহাস নিহিত থাকে। কারণ "Folklore, in fact is the expression of the psychology of every man, whether in the fields of philosophy, religion, science, in social organisation and ceremonial, or in the more strictly intellectual religions of history, poetry and other literature".

১ Indian Culture/P. 43

২ বিনয় সরকারের বৈঠকে/পৃঃ ৫৮৩/বিনয় সরকার

লোকমানসের অলিখিত বস্তু-ইতিহাস হচ্ছে লোকসংস্কৃতি বা ফোক্‌লোর। বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও এমন অনেক অলিখিত উপকরণ রয়েছে যা' সংগৃহীত এবং সংকলিত হলে বাংলার জনসাধারণের এক অভূতপূর্ব ইতিহাস রচনা সম্ভব। আমাদের দেশের প্রান্তে প্রান্তে এখনও অনেক আচার অনুষ্ঠানের অলিখিত ইতিবৃত্ত ছড়িয়ে আছে। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে' (বৈশাখ, ১৩১২) বলেছিলেন: 'সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত-পার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে-ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় পরবর্তীকালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন। লোকায়ত জীবনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "জ্ঞানের আদি নিকেতন", সেখানেই সজীব মানুষ এবং সজীব ইতিহাস।"[১]

বাংলার সংস্কৃতি মিশ্র। জনগোষ্ঠীর বিভিন্নতার জন্য সংস্কৃতির বহু মৌল উপাদান স্তবকিত হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে। পূর্বেই আমরা দেখেছি বাংলা দেশে আর্যীকরণ এবং লোকবসতি একইকালে সর্বত্র সম্ভব হয় নি। ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার ঘটেছে। ফলে ধর্মীয় এবং বাস্তব জীবনবেগে গতিও ধীর-মন্থর হয়েছে এবং পরিণামে অঞ্চল বিশেষে কতগুলি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে মৈমনসিং, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট জেলার সীমা পেরিয়ে আসামের গারো পাহাড়ের সীমা পর্যন্ত একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। গাথা বা গীতিকার অধিকাংশই গারো-হাজং-চাকমা এবং মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যদিও লোকসাহিত্যের এবং সংস্কৃতির উপকরণগুলো নিরন্তর ধূলিকণার মত ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু একথা ঠিক যে যেখানে কৃষিভিত্তিক সমাজ দৃঢ় হয়ে গড়ে উঠেছে, সেখানে সহসা কোন পরিবর্তন ঘটে না। তবে দেওয়া-নেওয়া চলেছে বহু প্রাচীনকাল থেকে এবং এই একইভাবে চলছে ও চলবে। বিশেষ আচার-আচরণ, পূজা-পার্বণ যে সব অঞ্চলে গড়ে উঠেছে, তাদের অগোচরে সাংস্কৃতিক উপাদানের সীমারেখাও টেনে দেওয়া হয়। যেমন দক্ষিণবঙ্গের গ্রাম্য দেবদেবীর মিছিল চলেছে প্রধানত বনবনানীকে কেন্দ্র করে। কেননা সুন্দরবন ও 'জঙ্গল

---

১ A Hand Book of of Folklore—Charlotte Sophia Burne (London 1914)

মহল'কে আশ্রয় করে এবং সমুদ্র-নদীচারী, শিকারী ও মৎস্যজীবীদের মধ্যে বনদেব-দেবী পরিকল্পনা ও পূজার প্রচলন হয়েছে বেশী। বাংলাদেশের অন্যত্র দক্ষিণ রায়, বনবিবি, পঞ্চানন, গাজী সাহেব, পীর, সাতবিবি, মনসা প্রভৃতির চিত্র সুলভ নয়। আবার উত্তরবঙ্গে শিব, ধর্মরাজ, বিষহরি সুপ্রতিষ্ঠিত ; রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, মনসা এবং শিব বিভিন্ন নামে বিরাজ করছেন।[১] 'থান' বা জঙ্গলে গাছের তলায় কুদ্রাসিনি, ভৈরব প্রভৃতি গ্রামদেবতার মিছিলও এই অঞ্চলে সহজলভ্য। পূর্ববঙ্গে মনসা, শীতলা, শ্মশানকালী যেমন আছেন, তেমনি রয়েছেন 'পীর' (চট্টগ্রামে), কালভৈরব প্রভৃতি। সূর্য, গ্রহ প্রভৃতিও দৃষ্ট হয়। বাংলাদেশের লৌকিক দেব-দেবীর আঞ্চলিক সমাবেশ বিচার-বিশ্লেষণ করলে সংস্কৃতির মৌল উপাদানগুলির বণ্টন ও বাসন সহজলভ্য হবে। লোকউৎসবের উৎস, বিকাশ অনুসন্ধানে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক মণ্ডলগুলির গুরুত্ব সমধিক।

যদিও লোকসংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতিরই অঙ্গ। কিন্তু লোকউৎসব সর্বত্র জাতীয় উৎসবে পরিণত হয় নি। কারণ লোকউৎসব মাত্রই অঞ্চল বিশেষে সীমায়িত। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের প্রাবল্য লোকধর্মে নেই। কাজেই সমগ্র দেশকে একই সঙ্গে লোকধর্ম প্রভাবিত করতে পারে নি। তা'ছাড়া শাস্ত্রসম্মত নয় বলেই লোকাচার সংস্কৃতির উচ্চমার্গে আসন পায় নি। বাংলা দেশে প্রচলিত সব উৎসবই লোক উৎসব নয়। 'লোক' শব্দ উৎসবকে বিশেষিত করেছে। প্রথমে উৎসব শব্দের গূঢ়ার্থ বিচার করা যাক্। উদ্+সু+অ (অপ্) – ক = উৎসব। এর অর্থ যাহা সুখ প্রসব করে, আনন্দজনক ব্যাপার, বিবাহাদি।[৩] আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠানের নাম উৎসব। বেদে উৎসবের আদি অর্থ ছিল সোমরস নিষ্কাশন করা। আচার উৎসবের উৎস। সেইজন্য আচারমূলক অনুষ্ঠান উৎসব পদবাচ্য।

প্রত্যেক জাতির জীবনে উৎসবের এক ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় লোকজীবনে এবং গ্রাম্যজীবনে উৎসব এক সজীব ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গ্রাম্য সমষ্টিজীবনে উৎসবের মূল্য অসীম।

উৎসবকে সাধারণভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে :

১ শ্রীবিনয় ঘোষ বলেন, আনুষঙ্গিক উপাদান বর্জন করলে দেখা যায় বনদেবতার পূজা পশ্চিমবঙ্গের বনময় অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, উত্তর-পশ্চিমের জঙ্গল-মহল থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণের সুন্দরবন পর্যন্ত। আদিকাল থেকে এইসব বনদেবতার পূজা উৎসবের সঙ্গে স্থানীয় বনবাসীদের বাস্তব জীবনযাত্রার গভীর ও প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। এই সব উৎসব-পার্বণ বা ধ্যান-ধারণা আর্য বৈদিক আচারভুক্ত নয়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি/পৃঃ ৪০

২ বঙ্গীয় শব্দকোষ/শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত/কলিকাতা/১৩৪১ সাল/পৃঃ ৫৫৫

৩ প্রবাসী (দ্বাদশ ভাগ/দ্বিতীয় খণ্ড : ১৩১৯)/পৃঃ ৪৪৫

(এক) শাস্ত্রীয় উৎসব : অর্থাৎ শাস্ত্র-সংহিতা অনুসারে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত শাসিত উৎসব।

(দুই) লৌকিক উৎসব : যে সমস্ত উৎসবে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের কড়া শাসন নেই। লৌকিক নিয়মে লোক পুরোহিত দ্বারা আচরিত হয়, তাকে বলা যায় লৌকিক উৎসব। সমাজ-সংহতি ও সংস্কৃতির সমন্বয় প্রবাহে উৎসবগুলি ঐক্য সূত্র। মেলা ও উৎসব বাংলার জনপদ জীবনের এক মিলনতীর্থ।

গ্রামে গাঁথা বাংলা তথা ভারতবর্ষকে জানতে হলে লোকজীবনের সামগ্রিক পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। উৎসবের উৎস, স্বরূপ ও বিকাশ আলোচনা করলে গ্রাম্যজীবনের মৌলিক ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভারতের আত্মা রয়েছে গ্রামের উৎসবের মধ্যে। শুধু সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপাদান লুকিয়ে নেই, মানুষে মানুষে সম্পর্কের মহত্তম দিকগুলিও এতে নিহিত আছে। বলেন্দ্রনাথ 'শুভ উৎসব' প্রবন্ধে বলেছেন : 'আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।' মানুষে মানুষে মিলনের এত বড় তীর্থ আর কিছুতেই নেই। সমগ্র গ্রাম (যেখানে উৎসব হয়) আনন্দে ও পরম শুভবোধে একটি পরিবারের রূপ ধারণ করে এবং সমগ্র দেশ ও জাতি বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক অখণ্ড ঐক্যানুভূতিতে নিজের সার্থকতা যেন খুঁজে পায়। ভারতীয় সভ্যতার এটাই সমন্বয়ী প্রতিভা এবং অনন্ত বৈশিষ্ট্য। একেই মনীষীরা বলেছেন : 'Unity in diversity'. বিভিন্নতার মধ্যেও অখণ্ড ঐক্য। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার এই মহান সত্যের পরম উপলব্ধিতে বলতে পেরেছিলেন : 'যেখানে মানুষের গভীর স্নেহ, অকৃত্রিম প্রীতি, সেখানেই তাহার দেব পূজা। যেখানে আমরা মানুষকে ভালবাসি সেখানেই দেবতাকে উপলব্ধি করি।' লোকায়ত জীবনে এবং সমাজেও ভয়, বিস্ময় ও ভক্তির সঙ্গে গভীর প্রীতি ও সংহতি গ্রাম্যদেবতার 'থানে', দেউলে মানত দিয়েছে, মৃৎ প্রদীপ জ্বালিয়েছে এবং মাটির পুতুল উৎসর্গ করেছে পরম শুভ ও মঙ্গল প্রত্যাশায়। 'মঙ্গলকাব্যের মর্মকথাই তো দৈবীশক্তির সঙ্গে মানুষী শক্তির সংঘর্ষ-সমন্বয় বিধান এবং পরিণামে দেবতার মানবায়ণ। মধ্যযুগীয় বাঙালীর ধর্মসাধনার এটাই মূল কথা।

লোকউৎসব বলতে আমরা বুঝি এমন উৎসব যা কেবলমাত্র লোকায়ত ধ্যান-ধারণার মধ্যে সীমায়িত। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের ছাপ এতে নেই। লোকায়ত আচার-অনুষ্ঠানে আদিম মানসিকতার অনেক বিচ্ছিন্ন খণ্ড উপাদান ও রেণু বিরাজ করে। মানব সভ্যতার বিবর্তন ধারায় সেই আদিম বিশ্বাস ও কল্পনাকে সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব হয় নি। ইন্দ্রজাল (Magic) বা যাদুবিদ্যা এখনও আমাদের ধর্মীয়

আচার-আচরণে ছদ্মবেশ ধারণ করে বিরাজ করছে। যেমন দুর্গোৎসবের ভূতপূজা এবং তার রহস্যময় মন্ত্র: 'ওঁ হ্রীং হিং হুং' ইত্যাদি। মুণ্ডা ও সাঁওতালেরা দেবতার তৃপ্তির জন্য মুরগী, পায়রা ইত্যাদি বলি দেন। সিংবোঙ্গাকে মুরগী বলি দিতে হয়। 'সিম্' মানে মুরগী। অর্থাৎ যে দেবতা মুরগীতে তুষ্ট তাকে বলে, 'সিংবোঙ্গা' আর যে দেবতা 'মেরম্' বা ছাগে তুষ্ট তাকে বলে 'মেরমবোঙ্গা'।[১] প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ্ বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'ঠাকুর পূজার' ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন: 'জন্মান্তরবাদ, অদ্বৈতবাদ, প্রতিমা পূজা এবং যোগসাধনা একসূত্রে গাঁথা এবং সমুদয় অনুষ্ঠানই ভূতপ্রেত পূজার ক্রমবিকাশের ফলে উৎপন্ন।' অষ্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর আদি-অস্ত্রাল নরগোষ্ঠীই এই ঐন্দ্রজালিক লোকবিশ্বাসের স্রষ্টা। তাদের ঐতিহ্য আমাদের সাম্প্রতিক সংস্কৃতিধারায় আজও প্রবহমান।

বাংলাদেশের উৎসবগুলির সৃষ্টির মূলে মানুষের কর্মবোধ এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ কাজ করেছে সক্রিয়ভাবে। 'ধর্ম' শব্দের অর্থ ধারণ করা। পাশ্চাত্ত্য 'রিলিজিয়ন' শব্দ যে অর্থ ব্যঞ্জনা করে ভারতীয় ধর্ম বা ধর্ম্ম শব্দ সে অর্থ ব্যঞ্জনা করে না। কারণ উভয়ের উৎস এবং বিকাশের মূলে ভিন্নতর জীবনচেতনাও কাজ করেছে। ভারতীয় জীবনচেতনায় ধর্ম জীবনের সামগ্রিক কর্ম প্রবাহের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত। সাংস্কৃতিক বিকাশের অঙ্গ।

ধর্ম চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পরকাল বা পরলোক সম্বন্ধে একটা ধারণারও সৃষ্টি হলো। আদিম ভূত-প্রেত বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে মানুষের সাকার ধর্মচেতনার সৃষ্টি করেছে। মানুষের বিশ্বাস ও আচার-আচরণ ধর্মীয় চেতনার উৎস বলা চলে। তবে আদিম বিশ্বাসের সঙ্গে প্রকথিত বিশ্বাসের পার্থক্য রয়েছে। হিন্দুধর্মে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত; খৃষ্টান ধর্মেও তাই। প্রাচীন যুগের নিরক্ষর আদিবাসীরা তাদের আত্মীয়-পরিজনের মৃতদেহের সঙ্গে পশু, পক্ষী, গাছ ইত্যাদি উৎসর্গ করতেন। তাদের বিশ্বাস মৃতের সঙ্গে মুরগী, পক্ষী, গাছ বা তাদের প্রিয় বস্তু তাদের স্বর্গের পথে নিয়ে যাবে। কবরে ফুল গাছ বা স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করার মধ্য দিয়ে সেই আদিম বিশ্বাস

---

১ Tribal battles between a people belonging to the Baffalo-clan in the lowlands of South Bengal and a people belonging to the lion-clan in the Himalayan region of North Bengal are indicated by a traditional composite figure of the Goddess Durga or Parbati. The annual observance of Durga and Basanti Pujas in Bengal commemorate the quarrels breaking out in pre-historic times between the two and the final defeat of the buffalo-clan—The Ritual Art of the Bratas of Bengal/P. 9/S. K. Roy

এখনও আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত। হিন্দুদের শ্রাদ্ধান্তিক বৃষকাষ্ঠ উৎসর্গ এবং চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে শ্রাদ্ধান্তিক "অন্ন উৎসর্গ" (ভাত-বাড়ানো) আচারের মধ্য দিয়ে মৃত-আত্মার তুষ্টি বিধানের প্রথা প্রচলিত আছে। কখনও দেখা গেছে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ছাগ ইত্যাদি বলি প্রদান করে, সেই পশুর কিছু মাংস কচি কলাপাতায় ইষ্ট দেব-দেবীর উদ্দেশে উর্দ্ধলোকে স্থাপন করছে। 'চট্টগ্রামের প্রান্তিক অর্থাৎ আরাকান অঞ্চলে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। যতক্ষণ না চিল বা শকুন সেই উৎসর্গীকৃত মাংস গ্রহণ করবে, ততক্ষণ পূজারী আহার্য গ্রহণ করবে না। গ্রহণ করলে দেবতা রুষ্ট হবে এটাই তাদের বিশ্বাস। এই আদিম বিশ্বাসগুলির পেছনে মানুষের অতৃপ্ত কামনা-বাসনার ইঙ্গিত রয়েছে। গোত্রদেবতা ও 'টোটেম' বিশ্বাসের ফল বলে মনে হয়। জীব-জন্তু, গাছপালা 'টোটেম' দেবতারূপে পূজিত হয়। এই 'টোটেম' বিশ্বাস অত্যন্ত কঠোর। 'টোটেম' আহার ও গোত্রান্তর নিষিদ্ধ এবং একই গোত্রের কাউকে বিয়ে করা চলে না। হিন্দু সমাজে এখনও এই রীতি প্রচলিত আছে।

সাঁওতালদের মধ্যে 'কুর্মি' বা কূর্ম পদবী প্রচলিত আছে। কুর্মি মানে কচ্ছপ। 'হাঁসদা' কুলের লোকও আছে। তারা হাঁসকে গোত্র দেবতা মনে করেন। এইভাবে 'মূরুম', হাতি, সিংহ, 'বাঘ', প্রভৃতি উপাধির মধ্যে সেই আদিম টোটেম স্মৃতি প্রবাহিত। গণেশ দেবতার মুখমণ্ডল (হাতি) টোটেম বিশ্বাস বলে মনে হয়। তা ছাড়া হিন্দু দেব-দেবীর বাহন যেমন পেচা (লক্ষীর), হাঁস (সরস্বতীর), ময়ূর (কার্তিকের), ষাঁড় (শিবের), সিংহ, বাঘ (দুর্গার) এবং সর্বোপরি মহিষ (অসুরের), সর্প (মনসার), ঘোড়া (দক্ষিণ রায়) প্রভৃতি টোটেম স্মৃতি জড়িত দেব-দেবী। দুর্গোৎসবে কালে কালে বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতির বহু বিচ্ছিন্ন উপকরণ সমীকৃত হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা হচ্ছেন সিংহ প্রজাতির প্রতিভূ এবং অসুর হচ্ছে মহিষ প্রজাতি। প্রাগৈতিহাসিক কালে এদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে থাকবে। সেই প্রজাতীয় সংঘর্ষের ফলশ্রুতি আজকের মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা।[১] মাতৃকা পূজার প্রচলন দ্রাবিড়ীয় ভাষার সংস্পর্শজাত। প্রাগৈতিহাসিক কালে বিভিন্ন প্রজাতীয় লোকদের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ এবং দেওয়া-নেওয়া চলত। কালক্রমে বিরুদ্ধ শক্তির সমন্বিত

---

১ Art and religion, though perhaps not wholly ritual, spring from the incomplete cycle, from unsatisfied desire, from perception and emotion that have somehow not found immediate outlet in practical action.
Ancient Art and Ritual/1927/P. 41/Jane Allen Harrison

হয় এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে। বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলগুলির ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এই সত্যের স্বপক্ষে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।
উৎসবের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যেরও একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। শিল্প মাত্রেই জীবন-অনুকরণ জাত। 'ইমেজ' শব্দটা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 'ইমেজ' হলো প্রতিমা, প্রতিরূপ। ভারতীয় মূর্তি শিল্পের বিকাশ ধারায় এই অনুকরণ প্রবণতা কাজ করেছে সক্রিয়ভাবে। আদিম ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস এবং আচার-আচরণেও অনুকরণবাদ কাজ করেছে। 'রিচুয়াল' শব্দটা মানুষের আচার-আচরণের অর্থ ব্যঞ্জনা ক'রে। গ্রীকদেশে নাটক সৃষ্টির মূলে এই 'রিচুয়াল' শব্দের অবদান সর্বাধিক। নৃত্য-গীতময় অভিনয় দ্বারা দেবতার অনুষ্ঠান করা হত। অভিনয় ব্যাপারটা অনুকরণস্বভাবজাত। জেন্ এলেন্ হ্যারিসন্ প্রাচীন গ্রীসীয় উৎসব এবং অভিনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: 'Atmost everywhere, all over the world, it is found that primitive ritual consists, not in prayer and praise and sacrifice, but in mimetic dancing'.

গ্রীক্ দার্শনিকেরা শিল্পকে 'মাইমেসিস্' বলেছেন। 'মাইমেসিস্'-এর অর্থ হচ্ছে কোন 'মাইম্' অর্থাৎ অভিনেতা (বাংলায় বলা চলে 'সঙ') সেজে গুজে কোন চরিত্রের অনুকরণ করেন বা অভিনয় করেন। একে তারা বলেছেন: 'ড্রোমেনন' বা 'ড্রামা'। কিন্তু অনুকরণ মাত্রই শিল্প হয় না। আদিম ইন্দ্রজালবিদ্যা যদিও অনুকরণজাত। কিন্তু মানুষের অতৃপ্ত বাসনা-কামনা থেকেই শিল্প ও 'রিচুয়ালের' জন্ম। বাংলার ব্রত এবং আদিবাসীদের দেয়াল চিত্র এই সত্যের পরিচয়বহ।[১] বাংলার উৎসবগুলিতে শুধু আচার-আচরণ সর্বস্ব নয়, নৃত্য—গীত ও শিল্প এদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। শিকারী মানুষের আনন্দ-উল্লাস বিঘোষিত হোত সন্ধ্যার অগ্নি-চক্র-নৃত্যের। তেমনি আজকে গাজন, টুসু-ভাদু প্রভৃতিতে দেখছি মানুষের আনন্দ-চেতনার নৃত্য-গীতময় প্রকাশ। নৃত্য হলো 'সবিলাস অঙ্গ বিক্ষেপ'। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও অভিনয় কলার অঙ্গ হিসেবে 'নৃত্ত' বা 'নৃত্যের কথা স্বীকৃত হয়েছে। আনন্দ মানুষের জীবনে আনে চলার ছন্দ। উৎসব মাত্রেই আনন্দানুষ্ঠান। সুতরাং নৃত্য-গীত উৎসবের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ধর্মের

১ By religion, then, I understand a propitiation or conciliation of powers superior to man which are believed to direct and control the course of nature and human life. Thus defined religion consists of two elements a theoritical and a practical, namely, a belief in power higher than man and an attempt to propitiate or please them. The Golden Bough (Abridged Edition) 1963/P. 65-68/Sir James George Frazer

সঙ্গে উৎসব ও নৃত্যকলার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। ভয়, বিস্ময় ও শ্রদ্ধা থেকে যে ধর্ম-চেতনার জন্ম হয়েছে তা কালক্রমে বহুধারায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো। যেমন্ জর্জ ফ্রেজার পৃথিবীর যাবৎ ধর্মাচার বিশ্লেষণ করে ধর্মকে 'ম্যাজিক' বা ইন্দ্রজাল বিদ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন।[১] ইন্দ্রজালবিদ্যার মাধ্যমে অনধিগতকে বশীভূত করা হয়। এই যাদু বা বা ইন্দ্রজালের মাধ্যমে দেবদেবীর তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টাও কম ছিল না। গ্রীকদেবী 'মিউস্' এবং দেবতা 'ডায়োনেস্‌স'-এর সামনে যে নৃত্য-গীতময় অভিনয় করা হোত তার সূতিপথেই ড্রামার জন্ম। বাংলা দেশে দেবদাসী নৃত্য এবং গাজনের শবনৃত্য ও কালিকা পাতার নাচ প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক শক্তির অমোঘ প্রভাবের সত্যতা প্রমাণ করছে। লোকনাট্যের এইগুলি উৎস।

লৌকিক ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে অবিমিশ্র উপকরণ এসে ভীড় করেছে। কোথাও আদিম বিশ্বাসের জয়-জয়কার, আবার কোথাও প্রকর্ষিত চেতনার উন্মেষ। এর কারণ, কোন উপকরণই এককালে সমাজের সর্বস্তরে বিকাশ লাভ করতে পারে নি। বরং এক ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে। গাজন-চড়ক-গম্ভীরা প্রভৃতি উৎসবের আচার বিশ্লেষণ করলে আমাদের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সত্য নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

কোন জাতির মানস ইতিহাস নিহিত থাকে তার সামাজিক আচার-আচরণের মর্মমূলে। লোকমানস বা লোকসংস্কৃতি হচ্ছে দূরাগত ঐতিহ্যের চলমান্ প্রবাহ। এই সংস্কৃতির মণিকোটায় সঞ্চিত থাকে দেশ, জাতির নিবিড়তম পরিচয়। জি, এল, গোম্ লোকসংস্কৃতির উৎস প্রসঙ্গে বলেন: 'I believe that every single item of folklore, every folktale, every tradition, every custom and superstition has its origin in some definite fast in the history of man's past.'

বহুযুগের সমাজ বিবর্তনের ধারায় বহু বিচিত্র উপকরণ এসে মিশেছে মানুষের সংস্কৃতিতে। বাংলা দেশের আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং পরিমণ্ডল এই সত্যই প্রতিপন্ন করে। যেমন বাংলার গ্রাম্য ঘর-বাড়ি, গৃহ-প্রসাধন, শিল্প, উৎসব অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে চলেছে আজও। তবে রাষ্ট্রিক ইতিহাস যেমন কালসীমার কলশ্রুতি, লোকমানস তেমন নয়। বরং কালসীমা উত্তরণই এর ধর্ম। লোকমানস অতীতেরও নয়, বরং চলমান কালপ্রবাহের সৃষ্টি বলা চলে। লোকসংস্কৃতি প্রাচীন হয়েও চিরনবীন; প্রাচীনের প্রতিধ্বনি

---

১ Folklore as a Historical Science/London/G. L. Gomme

২ বাংলার লোকশ্রুতি/আশুতোষ ভট্টাচার্য

রয়েও বর্তমানের মুখর, সজীব চিত্র। লোকসংস্কৃতিকে অনেকে বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বনস্পতির শিকড় যেমন মাটির গভীরে লুকিয়ে থাকে অথচ শাখা-প্রশাখা বর্তমানের আকাশে পল্লব বিস্তার করে, তেমনি লোকমানসও দেশের অতীতের মাটিতে জন্মেও চলমানতার মধ্যে নিজের সজীবতা রক্ষা করছে। যার আত্মীকরণের শক্তি যত প্রবল ততই সে নবীন। বাংলার লোকমানসও তাই।

লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব

মানব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অর্থ বিস্তৃতি ঘটেছে। ইউরোপীয় সভ্যতায় 'রিলিজিয়ন' এক বিশেষ অর্থবহ। আধ্যাত্মিক চৈতন্যের এক প্রকর্ষিত স্তরে খ্রীষ্ট ধর্ম, বৌদ্ধ-হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্ম জন্ম লাভ করেছে। অবশ্য এদের সৃষ্টির মূলে লোকায়ত ধর্ম চেতনার প্রভাব অপ্রত্যক্ষভাবে রয়েছে। শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ রচনার পর এই ধর্ম সম্প্রদায়গুলি চিরত্ব লাভ করে। শাস্ত্রীয় ধর্ম ছাড়াও লোকায়ত স্তরে এক প্রাক শাস্ত্রীয় ধর্মবিশ্বাস প্রবহমান আছে। এই স্তরকে লৌকিক ধর্ম চেতনার স্তর বলা চলে। চিরায়ত পর্যায়ে ব্যক্তি চৈতন্যই ধর্ম চেতনার মূলে কাজ করে, কিন্তু লোকায়ত পর্যায়ে সমষ্টির মঙ্গল চেতনায় সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। ভারতীয় গ্রাম্যসমাজ জীবনে গ্রাম্য দেব-দেবীর পূজাপার্বণ সমাজ সংহতির এক শক্তিশালী মৌল উপাদান।

লোকায়ত ধর্ম এবং বিশ্বাস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে অতিপ্রাকৃত, প্রাকৃতিক শক্তি (বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ, বৃক্ষ ইত্যাদি), ভূমির উর্বরতা, সূর্য, আকাশ, সর্প, শস্য, ঋতু (পরিবর্তন ও অয়ন বা সংক্রান্তি) এবং 'টোটেম্', জীবজন্তু, বৃক্ষলতা প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। এই সৃষ্ট চেতনার মূলে বহুযুগের বহু মানুষের বহু আদিম এবং লোকবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা এসে মিশেছে। বাংলার লোকায়ত স্তরের সংস্কৃতি এবং সাহিত্য তার যুগাগত প্রমাণ বহন করে চলেছে। বৈদিক যুগের স্তব, স্তুতিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অতি প্রাকৃতের প্রতি একটা প্রগাঢ় বিশ্বাস সেখানে কাজ করেছে। অতি প্রাকৃতের বন্দনা ও স্তবের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস নিহিত আছে। সবিতা, সূর্য, পৃথিবী উপাসনার মধ্যে এই ধর্মবিশ্বাসের সত্য লুকিয়ে আছে। জীবের মধ্যে যেমন আত্মার সন্ধান পেয়ে জন্মান্তরবাদ জন্ম নিলো, তেমনি জড়ের মধ্যে একদিন পৃথিবীর মানুষ আত্মার সন্ধান পেল। জড় বস্তুতেপ্রাণ আবিষ্কারের বা বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রাণবাদের জন্ম হলো।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এটাই সংস্কৃতির প্রথম উন্মেষ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্ম প্রথম প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস এবং জড় জগতের প্রতি প্রাণ ও আত্মা আরোপের মধ্যেই জন্ম লাভ করেছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও মনে করেন, আত্মার ধারণা হতেই "রিলিজিয়নের" জন্ম হয়েছে। সর্বপ্রাণবাদের প্রসারে বর্তমান জগতে সম্ভবত সর্বজীবের প্রতি প্রেমবাদ এবং বিশ্বমানবতার জন্ম হয়েছে। প্রসঙ্গত একটি প্রশ্ন মনে হতে পারে সর্বপ্রাণবাদের পূর্বে ধর্মীয় বিশ্বাসের কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ বা ধর্মতত্ত্ববিদেরা এর কোন যথাযথ উত্তর দিতে পারেন নি। কারণ বিবর্তনবাদের প্রবাহে কতগুলো ফাঁক রয়ে গেছে। সভ্যতার ইতিহাসে এই অন্ধকারময় যোগসূত্রগুলি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হ'চ্ছে না। কালক্রমে কৃষি সভ্যতার সুবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ এক ধর্ম-কর্ম বিশ্বাস মানুষের জীবনাচরণকে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে এই কৃষিমৌল সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। অতএব এর সাধারণ সুনির্দিষ্ট কালসীমাও টেনে দেওয়া চলে না। তত্ত্ববিদেরা মনে করেন সর্বপ্রাণবাদের পূর্বে প্রাঙ্-মনবাদ নামে এক পরমাশক্তির কল্পনা করেছিল সেকালের মানুষ। প্রাঙ্-মনবাদ মূলতঃ সুপ্রাচীন মানবগোষ্ঠীর প্রকৃতি ও মনের রহস্যবোধ থেকে সৃষ্ট এক শক্তি। প্রাঙ্-মনবাদের বিবর্তনে আত্মার কল্পনা জাগে মানব মনে। কিন্তু ফ্রেজার প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যা হলো ধর্মের পূর্বসূরী। রিস্‌লে, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন প্রাঙ্-প্রাণবাদে ধর্মের বীজ নিহিত। প্রসঙ্গত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, 'সর্বপ্রাণবাদ্ কিংবা জড়াত্মবাদ হইতেই যে সর্বপ্রথম 'রিলিজিয়নের' জন্ম হইয়াছে তাহা স্বীকার করা যায় না।' প্রাঙ্-মনবাদেই ধর্মের প্রথম ঐতিহাসিক বীজ নিহিত। এক কুহেলিকাময় পরিবেশে মানব মনের ভয়, ভক্তি, ভালোবাসা, বিশ্বাস ও বিরোধ থেকেই যে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বাংলাদেশের চারপাশে সুপ্রাচীনকাল থেকেই বহু আদিম প্রজাতি এবং কোম বাঙালী বাস করত। বাংলার ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্যের জন্য জনজীবনেও সাংস্কৃতিক জীবনে এসেছে এত বৈচিত্র্য। ফলে ধর্ম, আচার, জীবনাচরণ ও সাংস্কৃতিক উপকরণের মধ্যে বহু বিচিত্র ধারার মিলন-মিশ্রণ ঘটে গেছে। তাছাড়া বহিরাগত (সর্বভারতীয়) ধ্যান-ধারণাও প্রচুর মিশেছে বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে। যেমন বৈষ্ণব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম, নাথ ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম, তান্ত্রিক ধর্ম প্রভৃতি। উন্নত সমাজ মানসে এদের প্রকর্ষিত চর্চা ও রূপ প্রতিফলিত। লৌকিক মার্গে সাধারণ

বিশ্বাস আচার পাল পার্বণ সমান ধারায় বয়ে চলেছে। কোথাও কেন্দ্রাতিগ আবার কোথাও কেন্দ্রাভিগ পদ্ধতিতে চিরায়ত ও লোকায়ত সংস্কৃতির উপকরণাদির মিলন-মিশ্রণ ঘটছে। বাংলার চর্যাগান, শাক্তগীতি, ঝুমুর (পদাবলী), রবীন্দ্রনাথের বাউল গান প্রভৃতি মিলন-মিশ্রণ ও লেনদেনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। সেজন্য হিন্দু সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান বিশ্লেষণ করে নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসু এই সিদ্ধান্তে এলেন : 'Hinduism grew up as a confederation of tribal cultures under the overlordship of Brahmanism'[১]. অবশ্য একথা ঠিক যে এই লেনদেন এক তরফা হয় নি। পারস্পরিক গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে ঘটেছে। বাংলাদেশের ইতিহাস একথা বলে যে বৈদিক আর্য অভিযানের পূর্বে বাংলা দেশ আর্যেতর জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ছিল। সুতরাং সংস্কৃতির মৌল উপকরণ বিশ্লেষণ করলে বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিও ধরা পড়বে। আবার এই আঞ্চলিক বৈশিষ্টগুলির সামগ্রিক সাধারণীকরণ করলে বাংলার সংস্কৃতির সার্বজনীন চিত্র উদঘাটন করা সম্ভব হবে। নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন : Through the history of a particular cultural trait we can learn many things about the cultural history of a religion.

লোকায়ত পর্যায়ে জনজীবনের ধ্যান-ধারণা এবং ধর্ম বিশ্বাস থেকেই দেবদেবীর সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাম্য দেবদেবীগুলিকে আশ্রয় করেই কোন এক শুভলগ্নে বাংলা দেশে পাল-পার্বণ ও উৎসবকলার সৃষ্টি হয়েছিল। এই উৎসব কলার মধ্যেই বাঙ্গালীর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃত ইতিহাস নিহিত। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বাঙ্গালীর ইতিহাসের মৌলিক উপকরণ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেন—'প্রাচীন বাঙালীর মানস সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান পরিচয় তাঁহাদের ধর্মকর্মে। বিচিত্র ধর্ম সংস্কার, বিশ্বাস, পূজা, আচার অনুষ্ঠান, বার মাসে তের পার্বণ, অসংখ্য দেবদেবী ও অন্যান্য প্রতীক লইয়াই প্রাচীন বাঙালীর জীবন, এই সংখ্যাতীত দেবদেবী এবং তৎসম্পর্কিত ধ্যান ধারণা বাঙলীর মানস সংস্কৃতিকে যুগে যুগে পরিপুষ্ট করেছে। বাংলার ধর্মলোকে মূর্তি শিল্প ও মূর্তি পূজার পূর্বে প্রতীক উপাসনার প্রচলন ছিল। প্রতীক চেতনার মধ্য দিয়ে যেমন মানুষের প্রথম ভাষার জন্ম হয়েছিল অনুরূপভাবে প্রতীক মানুষের রূপ কল্পনা ও দেবদেবীর মূর্তি কল্পনায় সহায়তা করেছে। একদিকে মানুষ প্রাচীনকালে যেমন বৃক্ষ, আকাশ, সবিতা, ধ্বজা, শিলাখণ্ড, সর্প ইত্যাদির পূজার্চনা করেছে, অপর পক্ষে তেমনি এদের প্রতিরূপ কল্পনা করেছে 'সিম্প্যাথেটিক' এবং 'ইমিটেটিভ' ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যার

১ Dr Nirmal Kumar Bose—Cultural Anthropology/1961/P. 31

সহায়তায়। চৌচৈত্ররূপী পশু বা বৃক্ষ মূর্তিকে আশ্রয় করে পূজা পেতে থাকল। বাংলার দৈব উপাসনার এক বিচিত্র প্রকাশ ঘটল বাংলার চিরায়ত ও লোকায়ত দেবদেবীর উপাসনার মধ্য দিয়ে। মৃন্ময় মূর্তি, প্রতিমাশিল্পের মধ্য দিয়ে বাঙালী আপন সত্তাকে খুঁজে পেল। উপাস্য জগৎ ও মানস জগৎ এক হয়ে গেল।

বাংলার পালপার্বণ, ব্রত, উৎসব, ধান, দুর্বা, উলুধ্বনি, আকাশ প্রদীপ, ব্রতের প্রথা, আচার, কথকতা, পালাগান, নৃত্যগীত প্রভৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলার আপন সংস্কৃতি, বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি। লোকউৎসবগুলি কোন অঞ্চলেই একই সঙ্গে একই দিনে গড়ে ওঠে নি। বরং এক অলক্ষ্য মন্থর গতিতে এদের সমাবেশ ঘটেছে। লোকায়ত সমাজ সমষ্টিগতভাবে যে সমস্ত উৎসব পালন করে সেগুলিকেই লোকউৎসব বলা চলে। যেমন নবান্ন, চড়ক, গাজন, গম্ভীরা, দোল ইত্যাদি। আধুনিক উৎসবের সঙ্গে লোকউৎসবের পার্থক্য সুপ্রচুর। আধুনিক উৎসবে ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ ছাপ থাকে। জন্ম তারিখ, মৃত্যুবার্ষিকী বা জয়ন্তীসূচক আনন্দজনক অনুষ্ঠানগুলি বৃহত্তর সমষ্টির কাছে তেমন মূল্যবহ নয়। বরং সীমিত পরিবেশে সংখ্যালঘুরা এই অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। কাজেই লোকউৎসব বৃহত্তর সমাজজীবনের প্রাণস্বরূপ।

উৎসব যে কোন জাতির প্রাণস্বরূপ। লোকসংস্কৃতির মত লোকউৎসব মাত্রই ঐতিহ্য এবং স্মৃতিবাহিত। কাল থেকে কালান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে এদের প্রবাহ। যে জাতির অতীত নেই, সে জাতির ভবিষ্যতও নেই। বাংলার লোক-উৎসব বাংলার সুপ্রাচীন সংস্কৃতির ঐতিহ্যবহ এক কালজয়ী শক্তি। এই শক্তিই ভারতআত্মা। বাংলার অমরত্বের সজীব প্রমাণ। লোকউৎসবগুলি গ্রাম বাংলার সমাজ-সংহতিবিধায়িনী শক্তি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি ভারত সংস্কৃতির মূলকথা। বাংলা তথা ভারতের লোকউৎসবকলা সে কথাই প্রমাণ করে। সমগ্র সমাজের কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ। এই কল্যাণী ইচ্ছাই সমস্ত সমষ্টিমূলক উৎসবের প্রাণ। শুভ বোধ ও জীবন বাসনার চরিতার্থতার মধ্য দিয়ে উৎসব প্রাঙ্গনে, বারোয়ারিতলায়, বৃক্ষতলে দীপ জ্বলে। 'আকাশ প্রদীপ' দেওয়ার মধ্যে যাদুবিদ্যার (ম্যাজিক) গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে। কিন্তু এই প্রদীপ শিখার আলো স্বর্গপথে যে পূর্বপুরুষেরা যাত্রা করেছেন, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করে এবং দেবলোকের সঙ্গে নরলোকের প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করে। বাংলার পলিমাটিতে তাই 'দেবতারে প্রিয়' এবং 'প্রিয়কে দেবতা' করাই ধর্মচেতনার অনন্ত লক্ষণ। এখানে কখনও কখনও দেবতারা স্বর্গ হতে বিদায় নিয়েছেন, আবার কখনও কখনও মানুষ দেবতা হয়েছে। মানবায়ন ও দেবায়নের লীলা চলেছিল মঙ্গল ও শাক্ত, বৈষ্ণব কাব্য

যুগে। লৌকিক পূজা-পার্বণের মৌলিক উপাদান বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা বাংলার সংস্কৃতি ও জীবন চর্যার শাশ্বত সত্যগুলি উদ্ঘাটন করার প্রয়াস পাব।

বাঙালীর ধর্মচেতনার আদিম স্তরে কতকগুলি বিশিষ্ট ধারা লক্ষণীয়। এই বিশিষ্ট ধারাগুলির মধ্য দিয়ে বাংলার লৌকিক ধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। এই ধারাগুলিকে এইভাবে সাজানো যায়।

(ক) প্রকৃতি পূজা
(খ) গ্রাম্য দেব-দেবী পূজা
(গ) বৃক্ষ-লতা পূজা
(ঘ) পশু-পক্ষী পূজা
(ঙ) শস্য ও প্রজনন শক্তিপূজা
(চ) যাদুবিদ্যা নির্ভর লোকাচার
(ছ) সমাজ মিতালিমূলক অনুষ্ঠান

প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস থেকে এই সমস্ত ধারণার জন্ম হয়েছে। ঋতুর পরিবর্তন এবং সংক্রান্তিগুলি থেকে উৎসবলগ্নের সূত্রপাত হয়েছে। ঋগ্বেদের যুগ থেকে এই ঋতুগত উৎসব কল্পনার একটা স্মৃতি বঙ্গদেশেও প্রবাহিত হয়েছে। দোলযাত্রা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি বলেছেন: 'ঋগ্বেদের ঋষিগণ রবির উত্তরায়ন আরম্ভে নূতন বৎসর আরম্ভ করিত। আমাদের দোলযাত্রা তাহারই স্মৃতি। যাত্রা শব্দের মূলগত অর্থ গমন। মঙ্গল যাত্রা, রাসযাত্রা, গঙ্গাযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি বেদোত্তর কালের সৃষ্টি।' পরবর্তীকালে যাত্রা শব্দ দেবতার উৎসববাচক হয়েছে। দেবতা গমন করেন, যেমন সূর্য কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যায় ঠিক তেমনি। পৃথিবীর গতি থেকেই জাগতিক বস্তুর গতি। দেব-দেবী যদি গমন করেন, পৃথিবী তাঁদের অনুগমন করে। এই গমন ও অনুগমনকে যাত্রা বলা হয়। দোলযাত্রায় শ্রীবিষ্ণু দোলেন। দ্রুত বা শ্লথ এই দোলন থেকে যাত্রার সৃষ্টি। সেজন্য বাংলা দেশে সূর্যের উত্তরায়নে ও দক্ষিণায়নে বিশেষ বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলা, গঙ্গাসাগর স্নান। চৈত্র-পূর্ণিমায় উত্তরায়ন সংক্রান্তিতে দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। দোলযাত্রাকে অনেকে বসন্তোৎসব বলেন, আবার অনেকে নববর্ষোৎসবও বলেন। তবে একথা সত্য যে সূর্যের বার্ষিক গতিকে কেন্দ্র করেই যাত্রামূলক উৎসবগুলির সৃষ্টি হয়েছে। সেকালে ইন্দ্রধ্বজ প্রভৃতি ধ্বজারোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হোত। ধ্বজা রোপণ করে মধ্যাহ্নে ধ্বজা ছায়া দেখে সূর্যের দক্ষিণায়ন নিরূপিত হত। বাঁকুড়া

মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলায় আজও ইন্দ্রধ্বজ পূজা প্রচলিত আছে। রাঢ় অঞ্চলে ধ্বজা পূজার নাম ইঁদ বা ছাতা পরব। ভাদ্র মাসে শুক্লা তিথিতে ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলিত হত। বাংলা দেশে যে প্রতীক পূজার প্রচলন হয়েছে, ধ্বজা পূজা তাদের অন্যতম। নিশান বা ধ্বজা বিজয়সূচনা করে এবং ধ্বজা মূলত বিজয়ানন্দের অভিজ্ঞান। মহাভারতে সারথিদের রথে বিভিন্ন ধ্বজা রোপিত হত। শ্রীকৃষ্ণের উৎসবেও অনুরূপ ধ্বজা উত্তোলনের প্রথা আছে। প্রাচীনকালে বিভিন্ন আদিবাসী বা নরগোষ্ঠীর মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চলত। বিজয়ী দল সংগ্রামান্তে ধ্বজা উত্তোলন করে বিজয়বার্তা ঘোষণা করত। ধ্বজাপূজার মধ্যে পৌরাণিক বা প্রাগৈতিহাসিক মানসিকতার স্মৃতি জড়িয়ে আছে মনে হয়।

মানুষ তার নিজের চেয়ে বড় কোনো সত্য বা সত্তাকে সহজে স্বীকার করতে চায়না। তখনই কেবল স্বীকার করে—একেবারে নির্বোধ শিশুর মতো—যখন কোনো পার্থিব বা অপার্থিব, বাস্তব বা কল্পিত সংকটের সম্মুখীন হয়ে সে তার নিজের শক্তির সীমা রেখায় ও বুদ্ধির দিগন্তে কোনো সমাধান খুঁজে পায় না। আত্মশক্তি তখন অলৌকিক শক্তিকে অবলম্বন করতে চায় এবং মানবসমাজে ধর্মের উৎপত্তি হয় তখন।' দেবতার প্রতি অসীম ভালোবাসা। কিংবা দেবতার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা মানুষের অন্তরে এক অপরাশক্তির উন্মেষ ঘটায়, যার সাহায্যে মানুষ বহিশক্তির সঙ্গে অভিযোজন করে, বাঁচার সংগ্রাম করে। দেবতা আমাকে ভালোবাসেন, দেবতা আমাকে দুঃখ কষ্টে সান্ত্বনা দেন, এই প্রবোধ প্রীতি-সহানুভূতি-বঞ্চিত মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, কারণ এগুলি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারেনা।'

ধর্মীয় বা ধর্মরিক্ত উৎসব-মেলাগুলি প্রাত্যহিক ভারতীয় জনজীবনে এবং অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এ বিষয়ে বিনয় ঘোষ বলেছেন: 'ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান আর্থিক উৎপাদনশক্তি উজ্জীবিত করে এবং আয়-বন্টনের প্রচলিত ব্যবস্থাকে কতকটা স্বাভাবিক প্রতিপন্ন করে।'[১] তিনি আরো বলেন: 'কিন্তু উৎসব-অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হল, সামাজিক গোষ্ঠী জীবনের সংহতি বজায় রাখা'। প্রাক্ ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় উৎসবগুলিই ছিল সমাজ সংহতির মৌলশক্তি। লোকসংস্কৃতি ভারতীয় সমাজের গভীরে এই সংহতিকেই জোড়দার করেছে। আর 'আজকের ধর্মোৎসব হয়েছে বিপুল জনসমাজের এই বেদনা-ব্যর্থতা বিস্মরণের উৎসব, নিঃসঙ্গতাবোধ থেকে প্রত্যেকটি মানুষকে সমষ্টিগত সমাজবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উৎসব।'[২] তাই গৃহদেবতা

---

১ বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব/বিনয় ঘোষ

২ প্রাগুক্ত পৃ ১৬০

আজ গণদেবতায় পরিণত; গৃহ-উৎসব আজ সার্বজনীন বা বারোয়ারি পূজায় পর্যবসিত। এই পরিবর্তনের মূলে জমিদারতন্ত্রের বিলোপ ও গোষ্ঠীচেতনার দুরন্ত বিকাশ কাজ করেছে বেশি।

আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য বাংলার লোকউৎসবগুলিকে সামগ্রিক ভাবে কয়েকটি অভিপ্রায়মূলক ভাগে বিভক্ত করা চলে। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে লৌকিক দেবদেবী এবং লৌকিক কর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা থেকেই লোকউৎসবগুলি সৃষ্ট। লোকউৎসবের আলোচনা করতে গেলে লৌকিক দেব-দেবীর কথা উপেক্ষা করা অসম্ভব। প্রসঙ্গত মেলার আলোচনাও করতে হয়। মেলার অর্থ হচ্ছে মিলন। লোকসংস্কৃতি যেহেতু বৃহত্তর সমাজ মানসের সৃষ্টি, সেহেতু বৃহত্তর সমাজই লোকউৎসবে সাড়া দেয় স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উল্লাসে।

উৎসবকে অনেকে শাস্ত্রীয়, অশাস্ত্রীয়, বৈদিক, পৌরাণিক, লৌকিক প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু লোকউৎসবের বেলায় তেমন সাধারণ বিভক্তকরণ বিজ্ঞানসম্মত হবে না। কারণ লৌকিক দেব-দেবীর উৎসমূলে রয়েছে আদিম ও লোকায়ত বিশ্বাসের বহু বিচিত্র উপকরণ যেমন, পৃথিবী, শস্য, বৃক্ষ, সর্প (জীবজন্তু), সমাজ। লোকউৎসবের বেলায়ও একথা বলা চলে যে সেই মৌল উপকরণগুলি উৎসবগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। সেজন্য আমরা অভিপ্রায়মূলক বিকাশ ধারাকে চিহ্নিত করার জন্য পৃথিবী, শস্য, সূর্য, বৃক্ষ-লতা, ঋতু, সর্প ও জীবজন্তু, সমাজ-মিতালি এই ক'টি বৃহত্তর বিভাগে লোকউৎসবগুলিকে বিভক্ত করতে পারি। বাংলা দেশে প্রচলিত লোকউৎসবগুলিকে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই বিশেষ অনুভাবনাভিত্তিক আলোচনা করব।

পৃথিবী :

কৃষিকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ। কৃষি মূলত মৃত্তিকাশ্রয়ী। নদীমাতৃক দেশগুলি প্রাচীন সভ্যতার পীঠভূমি। ভারত, মিশর, চীন দেশের সভ্যতা নদীর জলধারা পুষ্ট। মানুষের সমস্ত কর্মধারা পৃথিবী[১] দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রবীন্দ্রনাথ 'বসুন্ধরা' কবিতায় সুন্দর ললিত ভাষায় পৃথিবীর সঙ্গে মানব সম্পর্কের অন্তরতম বাণীটি তুলে ধরেছেন :

১ পৃথিবী—স্ত্রী [√প্রথ্+ইব (ষিবন্) ক+স্ত্রী-ঈ (ঙীষ), সম্প্রসারণ, ধরা, ক্ষিতি, ধরণী; মৃত্তিকা, পর্বত; বিণ—বিপুল সম্পদ, অতিসম্পন্ন, মহাধন। [বঙ্গীয় শব্দকোষ/দ্বিতীয় খণ্ড/ ১৩৭৮/সাহিত্য অকাদেমি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

মা ও মাটির ঘনিষ্ট সম্পর্কের জন্যই উভয়ে মানুষকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। এবং মানুষের ধর্মনৈতিক চিন্তার বিকাশে এদের প্রভাব অনস্বীকার্য। বাংলার লোকায়ত ধর্ম ও উৎসবে পৃথিবী নানাভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। যেমন পৃথিবীব্রত, ক্ষেত্রব্রত ইত্যাদি প্রাচীন পৃথিবী-অনুষঙ্গে উদ্ভূত। বিশেষত বাংলাদেশের কুমারী মেয়েরা এই ব্রতগুলি করেন চৈত্র মাসের চড়ক সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের শেষ সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। কুমারী মেয়েরা পিটুলী দিয়ে মাটিতে পৃথিবী, পদ্মের ঝাড়, পদ্মপাতা এঁকে বসুমতীকে পৃথিবী-পদ্মের ওপর বসাবেন। মেয়েরা হাঁটু গেড়ে বসে ছোট ছোট বাটি থেকে মধু, দুধ আর ঘি একত্রে আলপনার ওপর ঢেলে দেন আব লোকমন্ত্র বলেন :

এস ধরিত্রী, বস পত্র পাতে।
শঙ্খচক্র ধরি হাতে॥
খাওয়াব ক্ষীর মাখাব ননী।
আমি যেন হই রাজার রাণী॥

পর পর তিনবার এই মন্ত্র বলবেন, আর মধু, ঘি, দুধ একত্রে ঢালবেন আলপনার ওপর। কুমারী মনের কামনা-বাসনার সঙ্গে পৃথিবীর যেন এক আত্মিক যোগ রয়েছে। বাসনার চরিতার্থতার জন্য আদিম সমাজে যাদুর আশ্রয় নেওয়া হত। সমাজ বিবর্তনে এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগমনেও আমরা আদিম সংস্কৃতির সংস্কার ভুলতে পারিনি। রক্তের সঙ্গে যে কোন বাঙালীর এই সাংস্কৃতিক চেতনা আজও প্রবহমান। বাংলার ব্রতপার্বণগুলি বাংলার মেয়েদের মনোজগতের কামনা-বাসনার চিত্রে রঞ্জিত। নারী-মন ব্রতের মধ্য দিয়ে যেন সম্পূর্ণ উৎসারিত। শুধু নারীমন কেন সমগ্র গোষ্ঠীজীবন যেন আনন্দে-বেদনায় ব্রতের ছড়ায়-গানে-মন্ত্রে-কথায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। বাংলার ব্রতকথাগুলির মধ্যে আছে বাংলা দেশের

প্রতিচ্ছবি। বাংলার অন্তঃপুরের গোপন বার্তা বহন করে চলেছে বাংলার ব্রতপার্বণগুলি। পৃথিবী আমাদের কাছে কোন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা নয়। একান্তই প্রত্যক্ষ, বাস্তব সম্পর্কে পৃথিবী আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত। শুধু লৌকিক ব্রত-পার্বণে নয়, সুপ্রাচীন বৈদিক আচারেও পৃথিবী বন্দনার নজীর পাওয়া যায়। পৃথিবীকে মায়ের সধর্মী কল্পনা ঋক্‌বেদেই করা হয়েছিল।[১] পৃথিবী আজও নানা নামে পূজিতা হন, যেমন বসুন্ধরা, ভূদেবী, ধরিত্রী, অম্বিকা, বসুমতী ইত্যাদি। যজুর্বেদের বিবাহের একটি মন্ত্রে নবপরিনীতা স্ত্রীকে সম্বোধন করে স্বামী বলছেন: 'আমি লক্ষ্মীহীন, তুমি লক্ষ্মী। তোমাকে ছাড়া আমি শূন্য। তুমিই আমার লক্ষ্মী। আমি সামবেদ, তুমি ঋক্‌বেদ। আমি আকাশ, তুমি পৃথিবী। আমরা দুজনে মিলে হয়েছি পূর্ণ।' এক চমৎকার কবি কল্পনায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মন্ত্রটি। রবীন্দ্রনাথ 'বসুন্ধরা' কবিতায় বসুন্ধরাকে মাতৃরূপা বলেছেন। কবি আরও বলেছেন: 'আমার পৃথিবী তুমি বহু বরষের/তোমার মৃত্তিকাসনে আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন যুগযুগান্তর ধরি।'[২] 'মা' 'মৃন্ময়ী' শব্দ দুটির মধ্যে ঋক্‌বেদের মাতৃকল্পনার এবং ভারতীয় ঐতিহ্যাগত লৌকিক মাতৃ কল্পনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পৃথিবী সম্বন্ধীয় আরো অনেক উৎসব বাংলার মেয়েরা পালন করেন। বিশেষতঃ বিধবা নারীরা আষাঢ় মাসে 'অম্বুবাচী' নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করেন। আষাঢ় মাসের ৭ই তারিখে বসুন্ধরা ঋতুমতী হয়। এটা লোকবিশ্বাস। এই লৌকিক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বাংলার গ্রামের-শহরের মেয়েরা অম্বুবাচী ব্রত পালন করেন। সর্বপ্রাণবাদের প্রয়োগে পরিদৃশ্যমান জাগতিক বস্তুতে প্রাণারোপ এক সাধারণ লৌকিক রীতি। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির পর ৭ই আষাঢ় থেকে তিন দিন চাষীরা মাঠে লাঙ্গল নিয়ে ভূমিকর্ষণ বা চাষ করবে না। এমন কি বসুন্ধরাকে সামান্যতম আঘাতও দেবে না। ঋতুমতী নারীকে যেমন সযত্ন বিশ্রাম দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি বিশ্রামের প্রয়োজন বসুন্ধরারও। প্রজননশক্তির বৃদ্ধির জন্যই বসুন্ধরার প্রতি এত প্রযত্ন। শস্যশালিনী বসুন্ধরার ঋতুপ্রবাহে ভবিষ্যৎ শস্যফলন বৃদ্ধি পাবে এটাই সুপ্রাচীন বিশ্বাস। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও বাংলা দেশের মত বসুন্ধরার পূজা করা হয়। কামরূপ অঞ্চলের (আসাম) কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে অম্বুবাচী উৎসব উপলক্ষে তিনদিন বন্ধ থাকে। ধরিত্রী তখন ঋতুমতী। তাই তিনদিন ধরে দুধ

---

১ 'পৃথিবা মাতরম্ মতিন্' ইত্যাদি।

২ ওগো মা মৃন্ময়ী/তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,/দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া বসন্তের আনন্দের মতো/ [সোনার তরী/বসুন্ধরা]

দিয়ে কামাখ্যা দেবীকে স্নান করানো হয়। পৃথিবীকে ঋতুশীলা কুমারীর সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। বাংলা দেশেও অম্বুবাচী উপলক্ষে দুধ, লেবুর রস এবং কলা ইত্যাদি দিয়ে বসুন্ধরাকে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলেও অম্বুবাচীর ঘটা লক্ষণীয়। রাঢ় অঞ্চলেও এর সুপ্রচলন দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা এখানে স্মর্তব্য যে বসুন্ধরা পূজাকে কেবলমাত্র বসুন্ধরা পূজা হিসেবে বিচার করলে চলবে না। কারণ এর সঙ্গে আরও বহু বিচিত্র সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপকরণ এসে মিশে গেছে। সেই উপকরণগুলিও একটু বিচারের অপেক্ষা রাখে। পৃথিবীর আবর্তনও সেদিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর প্রতিদিন একবার আবর্তন করে। এর ফলেই দিবারাত্রি সংঘটিত হয়। একটু তির্যকভাবে সংস্থিত বলে প্রতি তিনমাস অন্তর দিনরাত একবার সম ও একবার অসম হয়ে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুর পরিবর্তন হয়ে থাকে। যখন মেরুদণ্ডের উত্তর প্রান্ত বা সুমেরু সূর্যের সম্মুখীন হয়, তখন পৃথিবীর সেই অংশে গ্রীষ্মকাল এবং বিপরীত অংশে শীতকাল হয়। এর মধ্যবর্তী অবস্থার নাম বসন্ত, হেমন্ত, বর্ষা ও শরৎ ঋতু। পৃথিবীর এই পরিবর্তনের জন্য জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতাদির উৎপত্তি ও বিলয় হয়। শস্য-ফলন, শস্য-প্রজনন এবং শস্য-আহরণ এই তিনটি পর্বই এক সূত্রে বাঁধা। শস্য-ফলন বা উদ্ভিদের অঙ্কুরায়ণ পৃথিবী ব্যতিত অসম্ভব। উপরন্তু পৃথিবীর উৎপাদন ক্ষমতার ওপর কৃষি নির্ভরশীল। সুতরাং পৃথিবীর আদিম সমাজগুলিতে যে ঐন্দ্রজালিক প্রজনন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রভাব শস্য সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদিকে প্রভাবিত করেছে। আমাদের প্রতিবেশী ওরাওঁদের "খাক্রাবুড়িয়া" একটি মাটির ঢেলা, মাতৃরূপিনী বসুন্ধরার প্রজনন শক্তির প্রতীকরূপে আজও পূজিতা হন। ছোটনাগপুরের ওরাওঁরা 'স্বর্ণবুড়িয়া' বা খাক্রাবুড়িয়াকে বৃক্ষদেবী রূপে কল্পনা করেন। শাল (Shorea robusta) বা বাবলার (Acacia Indica) অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন 'স্বর্ণ' বা 'খাক্রাবুড়িয়া'। এই দেবীর উদ্দেশ্যে পশু বা প্রাণী বলি দেওয়া জাতীয় ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের অন্যতম ধর্মীয় বিশ্বাস। বিহার ও বাংলা দেশের নিম্নতর বর্ণের লোকেরা 'ধরিত্রী মায়ের' উদ্দেশ্যে শূকর বলি দিয়ে থাকেন। প্রাচীনকালে মেক্সিকো, ফিলিপাইনের আদিম অধিবাসীরা বসুন্ধরার উদ্দেশ্যে নরবলি দিত। বর্তমান পশুবলি নরবলির বিকল্প। এখনও ভারতবর্ষের পূর্বোত্তর সীমান্ত অঞ্চলের নাগা, মিজো প্রভৃতিজাতীয় ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় নরবলির প্রচলন ছিল। এমনকি চাষার গোষ্ঠীর লোকদের বিশ্বাস প্রথমজাত শিশুকে গঙ্গাসলিলে বিসর্জন না দিলে

পরবর্তী সন্তানেরা বাঁচে না। দৈব ও অতিপ্রাকৃত শক্তির কোপ নিবারণের জন্ত গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দেওয়া এক নির্মম ধর্মীয় আচারে একদা পর্যবসিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'দেবতার গ্রাস' শীর্ষক কবিতায় দৈবশক্তি বিশ্বাসিনী মোক্ষদার একমাত্র সন্তান গঙ্গাসাগরে বিসর্জনের মত এক মমতাহীন ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পশুবলি বা নরবলি বৈদিকযুগের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অজ্ঞাত ছিল। 'বলি বৈদিক আচার নহে, বৈদিক আচার যজ্ঞ। কৃষিভিত্তিক সমাজ হইতেই বলির উদ্ভব হইয়াছে, প্রাণীবধ করিয়া তাহার সন্থ রক্ত দ্বারা কৃষিভূমি সিক্ত করিতে পারিলে কৃষিভূমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়, এই বিশ্বাস হইতেই কৃষিজীবী আদিম সমাজ নরবলি প্রবর্তন করে।'[১] ঠগীদের নরবলির কথা বাংলার ইতিহাসে রূপাক্ষরে লেখা আছে। কালিকাপুরাণেও নরবলির বিধান আছে। দুর্গোৎসবেও নরবলি দেওয়া হত। নরবলি শুধুমাত্র দুর্গা বা কালীপূজায় নয়, কাপালিকেরাও অভীষ্ট লাভের জন্ম নরবলি দিত। বাংলাদেশে দুর্গাপূজায় সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই পুণ্যাহে ছাগল, মহিষ ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। একালে ছাগল ইত্যাদি পশুর পরিবর্ত হিসেবে ইক্ষু ও কুষ্মাণ্ড বলি দেবার রীতি প্রচলিত আছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে নবমী নিশীথে পিটুলির এক নরমূর্তি তৈরী করে চালকুমড়া বা কচুর ওপর শুইয়ে রাখা হয়। রাতের শেষ প্রহরে ঐ অনুকৃত নরমূর্তি বলি দেওয়া হয়। এই বিশেষ বলিদানকে বলা হয় 'ভূতবলি'। কোথাও কোথাও একে বলে 'শত্রুবলি'। প্রাচীন নরবলি প্রথার এক আলোছায়াময় স্মৃতি এর সঙ্গে বিজড়িত। মানুষের সভ্যতার বিবর্তন প্রবাহে প্রাচীনের সঙ্গে নবীন ভাবানুসঙ্গের অনাবিল মিশ্রণ ঘটে যায়। বাংলার সংস্কৃতি বিশেষতঃ লোকায়ত সংস্কৃতিতে এই মিলন-মিশ্রণ যুগে যুগে ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে।

দেবী মাহাত্ম্যেও দুর্গা ধরিত্রীরূপে কল্পিত। শাকজাত শাকম্ভরী দুর্গা বিশ্বকে দুর্গম নামক মহাসুরের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন। তারপর তিনি মহিষ, শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক অনাবৃষ্টির প্রতীক অসুরত্রয়কে বধ করেন। এটা পৌরাণিক ভাষ্য। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' দুর্গাকে বসুন্ধরার প্রতীক বলা হয়েছে। আবার ঐ গ্রন্থে দুর্গাকে শাকম্ভরীও বলা হয়েছে।[২] দুর্গা পূজার প্রকরণ এবং উপকরণ বিশ্লেষণ করলে এই

১ বাংলার লোকশ্রুতি : আশুতোষ ভট্টাচার্য

২ পূজা পার্বণ গ্রন্থে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেছেন :
…কোন কোন ঐতিহাসিক বিজয়াদশমীর শবরোৎসব দেখিয়া মনে করিয়াছেন, কিরাত ও শবর জাতির একটি উৎসব মার্জিত হইয়া দুর্গা পূজায় পরিণত হইয়াছে। কেহ নবপত্রিকা দেখিয়া বুঝিয়াছেন, শরৎকালে আশুধান্ত সংগ্রহ হয়, দুর্গাপূজা নবান্নের উৎসব। কাহারও মতে বসন্তাগমে আমরা যেমন বসন্তোৎসব করি, শরৎ ঋতু দেখিয়া তেমন শরদুৎসব করি। এইরূপ যিনি দুর্গোৎসবের যে অঙ্গ দেখিয়াছেন, তিনি অন্ধের হস্তি দর্শন করিয়াছেন।

বক্তব্যের মূল্যায়ণ সম্ভব। দুর্গোৎসবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বহুবিচিত্র উপকরণ এসে মিশে গেছে। বাংলার অনেক উৎসব প্রসঙ্গে এই মন্তব্য সত্য। কৃষিসমাজে এবং কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবনে শস্যপূজার বহুল প্রচলন আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এর অজস্র নজীর দেখা যায়। আমাদের দেশে দুর্গাপূজায় দুর্গা প্রতিমার ডান পাশে যে নবপত্রিকা বা গণেশের কলাবৌ স্থাপন করা হয়, তার মধ্যে দুর্গা প্রতিমার এবং পূজার আদিম উৎস নিহিত আছে। নবপত্রিকা[১] ন'টি বৃক্ষপত্র আশ্রয় করে রচিত। যেমন: কলাগাছ (Musa Paradisiaca), কচু (Colocasia-Antiqaru), হরিদ্রা (Corcuma longa), জয়ন্তী (Hardamhenastichum), বিল্ব (Aegle Marmelos), দাড়িম্ব (Pumica granatum), অশোক (Jonesia Asoka), মান (Manaka), ধান্য (Aryza Sativa)। এই নব পত্রিকার মহামিলনে কল্পিত হলো এক নারী প্রতিমা। ইনি 'দুর্গাশঙ্করী', ধরিত্রীদেবী। এখানে বৃক্ষ ও বসুন্ধরা একাত্ম।

বাংলাদেশের মৈমনসিংহ, কুমিল্লা ও ত্রিপুরা জেলায় 'বনদুর্গা' নামে শেওড়া গাছের এক অধিষ্ঠাত্রীদেবীর পূজার প্রচলন আছে। কোন শুভ কাজের পূর্বে এই বনদুর্গার পূজার বিধান আছে। সন্তান-সন্ততির দীর্ঘায়ু ও শুভ কামনার্থেও এই দেবীর পূজা করা হয়। ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ সুন্দরবনাঞ্চলে 'বনবিবি' নামে বনের এক অধিষ্ঠাত্রীদেবীর পূজার প্রচলন আছে। বনসমাজে ইনি দক্ষিণরায় গাজী সাহেবের মত বনদেবতা বলে প্রসিদ্ধ। দুর্গা যেমন ঘটে-পটে মূর্তিতে পূজিতা হন, তেমনি বনবিবি ও বনদুর্গাও পূজিতা হন। বনদুর্গা বা বনবিবির কোন শাস্ত্রীয় মর্যাদা নেই। উভয়েই লৌকিক সমাজের দেবী। বাউলে, মৌলে, মালঙ্গি এবং নিম্নবর্ণের লোকেরা এঁদের পূজা করেন। একথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যেতে পারে বনদুর্গা বা বনবিবির মধ্যে দুর্গার সুপ্রাচীন উৎসের ইতিহাস নিহিত আছে। এই বনদুর্গা থেকেই কালক্রমে নারীরূপা দুর্গার প্রতিমা কল্পিত হয়েছে; শাস্ত্রীয় 'দশপ্রহরণধারিণীর' উদ্ভব হয়েছে। বন, বনজ এবং বৃক্ষ-পত্র ইত্যাদি কৃষিভিত্তিক বনজীবনের পরিচয়বহ। দুর্গার পূজানুষ্ঠানে নবপত্রিকার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তাতে মনে হয় দুর্গা বৃক্ষ ও শস্যাশ্রয়ী ধরিত্রী মাতা। কালে কালে বহিরাগত উপকরণে দুর্গোৎসবের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্গা মহাশক্তি ও প্রাকৃতিক পরাশক্তির প্রতীক হয়েছেন। ভারতীয় সভ্যতার মাতৃ-

---

১ 'তিথিতত্ত্ব' গ্রন্থে স্মার্ত রঘুনন্দন নবপত্রিকা অর্থে এই নব পল্লব-পত্রগুলির উল্লেখ করেছেন:

কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকচু কচুঃ।
বিল্বোহশোকো জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকা॥

রূপাদেবী মূর্তির প্রাধান্য আমাদের অভিভূত করে। কারণ সমাজ সংস্কৃতির মর্মমূলে প্রকৃতি, নারী ও পৃথিবী অভিন্না। পারস্পরিক এক অখণ্ড যোগসূত্রে আজও রক্ষা করছে। ঋগ্বেদের 'অরণ্যানী' দেবী থেকে শুরু করে ওরাওঁ, মুণ্ডাদের 'পবিত্র বন' (Sacred grove) এবং পরবর্তী বনদেবী কল্পনা যেন এক অখণ্ড সাংস্কৃতিক যোগ-সূত্রের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। বিশেষত যখন আমরা দেখি ভারতের গ্রামে-গ্রামান্তরে বহুনামে এক মাতৃদেবী পূজিতা হচ্ছেন। এই গ্রামদেবতার নাম কোথাও মা, মাতা, অম্বা, অম্মা, আবার কোথাও কালী, করালী, দুর্গা, মাতঙ্গী, বরদা প্রভৃতি। ছোটনাগপুরের আদিঅস্ত্রাল নরগোষ্ঠীর ওরাওঁ, সাঁওতালেরা মারাংবুরুর (বনদেবতা) পূজা করেন চৈত্র সংক্রান্তিতে এবং নৃত্যগীতের সঙ্গে বলি দেন পশু-পক্ষী ঐ দেবতার চরণে। উদ্দেশ্য অশুভ নাশ, আরোগ্য, শস্যফলন ইত্যাদি। এইভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ভারতের সর্বত্র মাতৃদেবীর প্রাধান্য। সুপ্রাচীন সভ্যতায় নারী আলোর দিশারী। মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার প্রস্তর শিল্পে নগ্ননারীদেবী, অজন্তা গুহায় মাতৃকা তার সাক্ষী বহন করছে। পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতায় বৃক্ষের সঙ্গে অনেক দেবতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। গ্রীসের দায়োনিসাস, রোমের জুপিটার, কেরেস্ত্রিয়াস এবং মেক্সিকোর টোটা বৃক্ষ প্রতীক-প্রতিমায় পূজিত হন।

দুর্গোৎসবে ষষ্ঠীর দিনে দুর্গার যে বোধন অনুষ্ঠান হয়, সেই অনুষ্ঠানে কতগুলি প্রাচীন সংস্কার এখনও কাজ করছে। প্রাচীন কালে দুর্গোৎসব বসন্তকালেই হোত। রামায়ণের যুগ থেকেই শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয়। রামচন্দ্র অকালে রাবণ বধের জন্য করেছিলেন বলেই একে 'অকাল বোধন'ও বলে। বোধন এর অর্থ জাগরণ। লৌকিক বিশ্বাস শরৎকালের দক্ষিণায়ণে দেবতারা নিদ্রিত থাকেন। সুতরাং দেবলোককে জাগানোর জন্য জাগরণ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। বোধনে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস হয়। অধিবাস বাঙ্গালী জীবনের নানা পটে করতে হয়। বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদিতে অধিবাস বিধান আছে। দুর্গাপূজার অধিবাসে নবপত্রিকা, ঘট এবং বিভিন্ন জলাশয়ের জল প্রয়োজন। উপরন্তু পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, পঞ্চগুড়ো ইত্যাদি উপকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয়। ঘট সংস্থাপনের প্রাক্‌কালে যে ঐন্দ্রজালিক আলপনা বা মঙ্গল চিহ্ন আঁকা হয় এবং সূত্র দিয়ে চতুষ্কোণ মণ্ডল তৈরী করা হয়, তা আদিম ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া, যার সাহায্যে পৃথিবীকে বন্ধন করে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভের প্রচেষ্টা করেন পুরোহিত, যিনি মূলত যাদুকর।

আলোচ্য নবপত্রিকাকে আবার নবদেবতার প্রতীকরূপেও পূজা করা হয়। যেমন কলাগাছের দেবতার নাম ব্রাহ্মী, দাড়িম্বের দেবতার নাম রক্তদন্তিকা,

হরিদ্রার দুর্গা, জয়ন্তীর শিব, মানকচুর চামুণ্ডা এবং ধানের লক্ষ্মী ইত্যাদি। এই সব দেবতা একই সঙ্গে একই উৎসবে মিলিত হন নি। বরং বিভিন্ন ঋতু-উৎসব এবং শস্য-উৎসবের বিবর্তনে নবপত্রিকার সঙ্গে নবদেবতার সমাবেশ ঘটেছে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য সাম্প্রতিক কালে দুর্গার যে মৃন্ময়ী মূর্তি আমরা পূজা করি, তাঁর দেহবর্ণ হলুদ। শুধু হরিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী বলেই দেহের বর্ণ হলুদ হয় নি। এর সঙ্গে বাংলার পক্ব শস্য-প্রকৃতির রঙ সম্পৃক্ত হয়েছে। ঋতুলীলার রঙ্গ-বর্ণে দেবী যেন কণকবর্ণা হয়েছেন। ফলভারে নত ধানের গাছ হলুদ হয়ে উঠে শরৎকালের শেষান্তে। কাজেই প্রকৃতি-শস্য-পত্র যেন সাঙ্গীভূত হয়েছে দুর্গাপ্রতিমায়। পরমাপ্রকৃতি দুর্গা বহুকালের ভারতীয় সাধনার অনন্ত সৃষ্টি। কিন্তু লোকায়ত স্তরে দুর্গা শাকম্ভরী ধরিত্রী। লৌকিক ধারনায় ব্রাহ্মণ্যশ্রী অনুপস্থিত। ধরিত্রীকে শস্যশালিনী করার জন্য পৃথিবীর আদিম মানব সমাজে বহুতর আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। এমন কি কামাখ্যা দেবীর ও বেলুড় মন্দিরে কুমারী পূজার রীতিও প্রচলিত আছে। মানুষকে দেবায়ণ আর দেবতাকে মানবায়ণ করার রীতি প্রাচীন যুগ থেকে ভারতবর্ষের শিল্প মানসিকতায় প্রচলিত। মঙ্গলকাব্য-বৈষ্ণব সাহিত্য—যুগে বাংলাদেশে তার প্রচুর নিদর্শন আমরা দেখেছি। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, ২৪ পরগণা জেলার অনাবৃষ্টি এবং খরার হাত থেকে বাঁচার জন্য গ্রাম্য রাজবংশী মেয়েরা হুদুমদেও (বর্ষণের দেবতার) কাছে অমাবস্যা রাত্রে নগ্ন নৃত্যের মাধ্যমে ওমুসলমানসম্প্রদায় 'আল্লাহ'-র মুসলমানেরা সমবেতভাবে বৃষ্টির প্রার্থনা জানায়। রাজবংশী গ্রামের কুমারী এবং সধবা মেয়েরা এই বর্ষা-বরণ নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে। পুরুষেরা গৃহে থাকবে। এমন কি এই নৃত্য তারা দেখতেও পারবে না। অমাবস্যা রাতের গহন অন্ধকারে শুষ্ক ধান ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে মেয়েরা চলেন, 'হুদুম', 'হুদুম' শব্দে নীরব প্রান্তর মুখর হয়ে ওঠে। নৃত্যের ভঙ্গিতে যৌন মিলনের দ্যোতনা আছে। রাজবংশীদের বিশ্বাস এই নৃত্যের ফলে মেঘের দেবতা হুদুম পৃথিবীতে বর্ষণ করবেন। এখানেই অনুষ্ঠানের শেষ নয়। এই হুদুমদেও ইন্দ্রের নামান্তর মাত্র। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বর্ষণের দেবতা, মেঘের বর্ষণকারক তেমনি হুদুমদেও। দেব-মানবীয় ইন্দ্রিয়জ সঙ্গম লোকশ্রুতিতে অম্লান। রাজবংশীদের এই ঐন্দ্রজালিক নৃত্য মূলত উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক বলে তাদের বিশ্বাস। অনাবৃত দেহে নৃত্য করার রীতি মেক্সিকো, পেরু এবং আফ্রিকায়ও প্রচলিত আছে। উইলিয়াম ক্রুক উত্তর ভারতের ফোকলোর ও ধর্ম বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই ধরনের এক নৃত্য প্রসঙ্গে বলেছেন: 'Nudity is essential in many magical rites and appears prominently in rain-magic.'

'অনুকৃতিমূলক যাদুর' মধ্য দিয়ে অভীপ্সিত বস্তু সহজ লভ্য'—এই বিশ্বাসে আদিম সমাজে এবং লোকসমাজে নৃত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার সংস্কৃতির প্রায় অধিকাংশই কৃষিমূলক। সেকালের উৎসব, পার্বণ দেবতা ও মানুষের নিত্যসংগমে সৃষ্টি হয়েছে। সেকালের পূজা-পার্বণ বিশেষ করে কৃষিকে নিয়ে, প্রকৃতিকে নিয়ে, ঋতুরঙ্গশালার বিচিত্রতাকে নিয়ে। কারণ প্রকৃতি, ঋতু এবং সমগ্র বহির্জগৎ ছিল সেকালের মানুষের কাছে অনায়ত্ত ও রহস্যমণ্ডিত। সেজন্য লোকায়ত উৎসবগুলি ছিল প্রজনন শক্তি ও ঋতুকেন্দ্রিক এবং নৃত্য-গান পূজা-পার্বণের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল।[১]

বৃষ্টি কামনার জন্য রাজবংশী মেয়েরা হুদুমদেও নৃত্যের পরদিন সকালে কুমারী-যোনি পূজা করেন এবং গৃহপ্রাঙ্গণে একটা কলাগাছ পুঁতে দিয়ে তার চারপাশে চক্রাকারে নৃত্য করতে করতে বৃষ্টির অনুকরণে জল ছিটোতে থাকেন।[২] একে ইংরেজীতে imitative magic (অনুকৃতিমূলক যাদু) বলে। এই ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেন বৃষ্টি সম্ভাবনা দ্রুততর হবে এবং ভূমির প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি পাবে। পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার পুণ্যিপুকুর ব্রতেও অনুরূপভাবে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃষ্টি আনয়ন করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। চৈত্র সংক্রান্তিতে এই ব্রত শুরু হয়। বৈশাখ মাসের প্রত্যেক সকালে করতে হয় এই ব্রত। উঠোনে একটা পুকুর তৈরি করে কড়ি দিয়ে চারধারে ঘাট সাজাতে হয়। পুকুরের মধ্যিখানে একটি তুলসী গাছ অথবা বেল ডাল অথবা আমের ডাল পুতে দেওয়া হয়। এবং পূর্বমুখী হয়ে বসে গাছের ওপর জল ঢালতে ঢালতে ছড়ার মন্ত্র বলে এইভাবে :

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুর বেলা ?
আমি সতী লীলাবতী,
সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী ॥ ইত্যাদি

কুমারী মনের বাসনালোক একেবারে অনাবৃত হয়ে প্রকাশিত হয় বাংলার

---

১ At harvest time festivities were held in honour of the Gods with feasts, dance, and Music. The Folk Element in Hindu Culture/Dr. B. K. Sarkar.

২ ধরিত্রীকে শস্যভারে পূর্ণ করিবার বাধা অনাবৃষ্টি, মহিষাসুর অনাবৃষ্টির প্রতীক। দুর্গাপূজার একটি প্রধান আচার দেবীর আনুষ্ঠানিক স্নান, ইহাকে মহাস্নান বলে, মহাস্নানের জল পূজার পরম প্রসাদ। এই মহাস্নান ধরিত্রীরই স্নান। সূর্য কিংবা ধরত্রীর প্রতীক স্নান করাইলে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি দূর হইবে, ইহা সমাজের এক অতি আদিম বিশ্বাস। ইংরেজীতে ইহাকে Sympathetic Magic বলে। বাংলার লোকশ্রুতি/আশুতোষ ভট্টাচার্য

কুমারী ব্রতে। সমাজের গভীর মনতত্ত্ব এই ব্রতগুলির সৃষ্টির মূলে নিহিত আছে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, আর ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই।'

সুন্দরবনের ওরাঁওরা সহরুল নামে এক উৎসব উদ্‌যাপিত করেন চৈত্র মাসে। ছোটনাগপুরের ওরাঁওরাও সহরুল পরব করেন। পলাশ বা শাল গাছের নবাঙ্কুর ও ফুল এই উৎসবের উপকরণ। পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) বনদুর্গার পূজার মতই এটা একটা বনোৎসব, প্রকৃতপক্ষে এখানে কোন মূর্তিকে পূজা করা হয় না। বৃক্ষই এখানে প্রতিমা-প্রতীক। সহরুল মূলত বৃক্ষ-তৃণাদির প্রজননগত উৎসব। এর মধ্যে পৃথিবী বা বসুন্ধরার সঙ্গে সূর্যের মিলনের ইঙ্গিত রয়েছে। যা পার্থিব ফলনকে ত্বরান্বিত করে। বনভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য এই উৎসব করা হয়। ওরাঁওরা বসুন্ধরার সঙ্গে সূর্যের বিয়ে দেন সহরুল পরব উপলক্ষে। এমন কি এই উৎসবে পানভোজনান্তে উদ্দাম নৃত্য-গীত চলে সারারাত ধরে এবং অবাধ যৌন-মিলনও এই উৎসবের দিনে ওরাঁও সমাজ-স্বীকৃত। এদের ধারণা এই মিলনের ফলে বসুন্ধরা ফলবতী হবে। শ্রম কর্ম শক্তির লাঘব হবে। অহল্যাভূমিতে আকাঙ্ক্ষিত ফসল ফলাতে পারবেন। রাজবংশীমেয়েদের ঐন্দ্রজালিক নয় নৃত্যের সঙ্গে ওরাঁওদের নৃত্যগীত এবং যৌনমিলনের পরোক্ষ মিল আছে। এক আদিম ধর্ম বিশ্বাস পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সমানভাবে বিকশিত হয়েছে, কাজ করেছে। ফলে সমধর্মী বহু উৎসব, পার্বণ, নৃত্য, শিল্প দেশ-দেশান্তরে গড়ে উঠেছে। লোকসংস্কৃতির স্তরে এই সাধর্ম্যের এক সার্বজনীন সত্য আছে। এই লোকায়ত ধ্যান-ধারণা হলো সমমনস্তত্ত্বজাত বৃহত্তর বিশ্বসংস্কৃতির ফসল। লৌকিক জগতের উপকরণ নিয়েই চিরায়ত সংস্কৃতির ইমারত [illegible] হয়েছে। এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক নাম : 'Polygenesis' বা সমমনাসৃষ্টিতত্ত্ব। পৃথিবী সংক্রান্ত পূজা-পার্বণ আলোচনা করতে হলে ক্ষেত্রের দেবতাদের আলোচনাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে এবং উত্তরবঙ্গে ক্ষেত্রপাল নামে এক ক্ষেত্রদেবতাকে পূজা করা হয়। বিশেষত অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের শনি ও মঙ্গলবারে এই দেবতার পূজা করা হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের মালদহ ও কোচবিহার জেলায় ক্ষেত্রপালের পূজার বহুল প্রচলন আছে। ক্ষেত্রপাল হচ্ছেন ক্ষেত্রের পাল বা রক্ষক (Protector of earth); কোথাও কোথাও বাস্তুভিটার রক্ষক বা বিঘ্ন-নাশকারী দেবতা হিসেবেও ক্ষেত্রপালের পূজা করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপালের কোন মূর্তি নেই। পাথর বা মাটির ঢেলা, বট বা কোন বড় বৃক্ষতলায় এই পূজা করা হয়। অনেকে ক্ষেত্রপালকে দিক্‌পাল দেবতা মনে করেন। সুন্দরবনের

বারাঠাকুরও দক্ষিণ রায় এমন একটি ক্ষেত্রপাল দেবতা।[১] কিন্তু মূলত ক্ষেত্রপাল ক্ষেত্রদেবতা এবং শস্য উৎপাদন বা প্রজনন শক্তির দেবতা রূপে বাংলার লোকসমাজে পরিচিত। ক্ষেত্রপালের পূজা অগ্রহায়ণ মাসে কেন হয় তার পেছনে ঋতুগত একটা তাৎপর্য আছে। প্রাচীনকালে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই নতুন বছর শুরু হত। অগ্রহায়ণ-এর অর্থ হচ্ছে অগ্র—পূর্বভাগ, অয়ণ—বছর। বছরের অগ্রভাগ অগ্রহায়ণ। নবান্ন সুপ্রাচীন বাংলা দেশে এই মাসেই হত। বাংলার প্রধান ফসল আমন ধান এই মাসেই গৃহাঙ্গণে তোলা হত। নূতন শস্যকে, শস্যদেবীকে স্বাগত জানাবার উৎসবই নবান্ন। অবশ্য সাম্প্রতিককালে নবান্ন পৌষমাসে অনুষ্ঠিত হয়। একে অনেকে পৌষালা বা পৌষপার্বণও বলেন। এই উৎসব মূলত কৃষিমূলক।

ক্ষেত্রপালের প্রতীক হিসেবে বংশদণ্ড পূজার প্রচলনও আছে। বংশদণ্ড প্রজনন শক্তির প্রতীক। যেমন ধ্বজা বা ইন্দ্রধ্বজ। ক্ষেত্রপালের পূজায় পশুপক্ষী বলি দেওয়ার রীতিও প্রচলিত আছে। চট্টগ্রামের মাহিরা গ্রামে মোষ বলির প্রথা আছে। বলি প্রদত্ত পশুর রক্তে সন্নিহিত দেবতার থান রক্তস্নাত করা হত। ভূমিকে ব্যাপকার্থে বসুন্ধরাকে এইভাবে রক্তস্নান করার পেছনে আদিম যাদু বিশ্বাস সক্রিয় রয়েছে। সাঁওতাল ও ওরাওঁরা তাদের কুলদেবতা সিংবোঙ্গার উৎসবে পশুপক্ষীর বলি দেন এবং বলি প্রদত্ত পশুপক্ষীর রক্তে সিংবোঙ্গার 'গেরাম থান' রক্তস্নাত করেন। এদের বিশ্বাস এই রক্তস্নানের ফলে বসুন্ধরা উর্বরা হবে এবং প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আদিম শিকারী জীবনের ফলচয়ন পর্বে নরবলি দেওয়ার রীতির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। ক্রমে ক্রমে নরবলি পশুবলিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এটাই মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের বিবর্তনের রূপ। ক্ষেত্রপাল প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য সন্নিবেশ করা চলে। গৃহ বা বাস্তুর দেবতা হিসেবে বাস্তুপাল বা বাস্তুদেব নামে একটি দেবতার কথা উল্লেখ করেছেন চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।[২] এই বাস্তুপাল দেবতার সহকারী বা আবরণ দেবতা হিসেবে তিনি শঙ্খপাল, বঙ্কপাল, নাগপাল এবং অন্যান্য গ্রাম্যদেবতা সহ ক্ষেত্রপালের উল্লেখ করেছেন। শঙ্খপালের বাহন বাঘ। ইনি দক্ষিণ দিকের অধিপতি বীর এবং পশুভীতিহর। চক্ষুবর্ণ পিঙ্গল এবং হস্তে শূল।[৩] বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে ক্ষেত্রপালের ব্রতও করা হয়। ব্রতিনী এঁকে ক্ষেত্রদেবী বলেন। 'ব্রতমাহাত্ম্যে' বলা হয়েছে: 'এই ব্রত করলে

---

১ 'বাঘ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে (সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত/১৯৮০) ডঃ দুলাল চৌধুরী রচিত 'দক্ষিণরায়' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—বর্ষ ৩৭/সংখ্যা : ১/পৃঃ ১০

৩ শঙ্খপালং মহাদেবং বিভুজং ব্যাঘ্রবাহনম্।
শূলহস্তং পিঙ্গলাক্ষং পরমং পুরুষম্ ভজে ॥ প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪

বাঘের ক্ষুধা শান্তি হয়।' ব্রতিনীরা মনে করেন এই ক্ষেত্রঠাকুরাণী কুল গাছে অধিষ্ঠান করেন এবং কুলগাছের শাখা এর প্রতীক। পায়েস, ছাতু ও সিরণি এই দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হয়। চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ সবাই এই দেবতাকে মান্য করেন। অবশ্য এই সার্বজনীনতা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের। প্রাচীনকালে এটা বিশেষ গোষ্ঠীর দেব পূজারূপে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃতি সমন্বয়ের মধ্যযুগীয় পর্বে এই দেবতা সর্বজনস্বীকৃত হয়েছেন মনে হয়। ভারতের সর্বত্রই গ্রাম-দেবতার আধিপত্য। সমাজে যখন গোষ্ঠীজীবনের প্রাধান্য, তখন গ্রামদেবতাই ছিল মুখ্য দেবতা।

দক্ষিণবঙ্গের আঠার ভাটির দেবতা দক্ষিণরায়ের সঙ্গে ক্ষেত্রপালের ভাবগত সংমিশ্রন ঘটেছে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। অনেক বৌদ্ধ দেবকুলের সঙ্গে ক্ষেত্রপালকে যুক্ত করেছেন।[১] ধর্মঠাকুর প্রসঙ্গেও এই ধরনের বিতর্ক পণ্ডিত মহলে সুদীর্ঘকালের। কবি হরিদেব তাঁর রায়মঙ্গলকাব্যে দক্ষিণরায়কে 'ক্ষেত্রপাল' বলেছেন। দিগ্‌ক্ষেত্রপাল হিসেবে দক্ষিণরায় দক্ষিণ দেশের বা দখিনদুয়ারের রক্ষক। এই ভাবানুষঙ্গে উভয়ের সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন কবিরা। অবশ্য গ্রাম-দেবতাদের অধিকাংশই হলেন গ্রামদেবী বা গেরাম দেবী (ক্ষেত্রান্তরে 'গেরাম দেবতি')।

প্রকল্পিত কবি কল্পনায় সমীকরণের বা সমন্বয়ের সুযোগ থাকলেও, লোকসমাজে সুদূর প্রসারী কল্পনা বিলাসের স্থান নেই। কিন্তু একথাও সত্য বাংলা দেশে যুগে যুগে সাংস্কৃতিক উপকরণের মিলন-মিশ্রণ ও গ্রহণ-বর্জন চলেছে। ফলে ধর্মাচারের মৌলিক উৎসগুলি রহস্যাবৃত হয়ে উঠেছে। ক্ষেত্রপাল, শঙ্কপাল, দক্ষিণরায় প্রসঙ্গেও একথা বলা চলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলা দেশের অরণ্যসঙ্কুল দক্ষিণাঞ্চলে একদা শিকারই সেখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল। এখনও ওরাওঁরা শিকারজীবী। বদ্বীপাঞ্চলের বাউলী, মৌলী, মালঙ্গীরা অবশ্য বনসম্পদ ও মৎস্যশিকারকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবুও এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যগত জীবনস্মৃতি এখনও তাদের ধর্মীয় আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনও এখানে কম নয়। দক্ষিণরায়ের মূর্তি প্রকল্পে বহু বিচ্ছিন্ন উপকরণ এসে মিশেছে বিভিন্ন পর্বে। বনদেবতা (Slylvan God) দক্ষিণরায় কালে কালে বাঘকে বাহন করলেন। অথবা বাঘ ছিল সেকালের বাঙালীদের মধ্যে এক গোষ্ঠীর কুলকেতু (totem), ফলে কুলদেবতা বাঘ বৃহত্তর সমাজে অরণ্যাঞ্চলের হিংস্র জন্তু বাঘের সঙ্গে জড়িত হয়ে মনুষ্য (Anthropomorphic),

১ পৌরাণিক উপাখ্যান/যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি/

প্রতিমা লক্ষ্যাক্রান্ত হলো।[১] সাপ যেমন মনসা দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি একই ভাবানুষঙ্গ জীব থেকে মানুষে রূপান্তরণে সহায়ক হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখতে হবে আদিমযুগে বাঘ ছিল কুলদেবতা বা গোষ্ঠী দেবতা। পরবর্তী কালের কিংবদন্তীরনায়ক দক্ষিণরায় হচ্ছেন দক্ষিণের রাজা। রায় মানে রাজা। দক্ষিণ রায় আর বাঘদেবতা এক নন। বরং দুটো চেতনা প্রবাহই দুটো ভিন্ন সংস্কৃতি চেতনাশ্রয়ী। ক্ষেত্রপাল ক্ষেত্রের রক্ষক। উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে রূপগত এবং ধর্মচেতনাগত। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাত্রেই সবদেবতার আগে পূজিত হন। গ্রামের জনবিশ্বাস ও গ্রামদেবতা একাত্ম। তাই গ্রামের মানুষই দেবতার পূজার সঙ্গে প্রধান্য পান।

প্রসঙ্গত বাংলা দেশের টোটেম স্মৃতির কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। রাঢ়দেশে এবং সীমান্তবাংলার মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ায় এমন জনগোষ্ঠি এখনও বাস করছেন, যাদের কৌলিক পদবী টোটেম স্মৃতিবহ। যেমন বাঘ, হাতি, ঘোড়া, হাঁসদা, মুরমু, কূর্মী ইত্যাদি কৌলিক পদবী তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বহন করে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং হুগলী জেলার অনেক গ্রামের গাছতলায় ভৈরব, কুদ্রা, বড়াম্, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রামদেব-দেবীর প্রতীকরূপে হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি আজও পূজিত হয়। এগুলি দেবতার ছলন। কোথাও কোথাও একখণ্ড প্রস্তরে সিঁদুর লিপ্ত করেও পূজা করা হয়। আদিম ধর্মবিশ্বাসে সর্বপ্রাণবাদের প্রভাবে কালে কালে টোটম স্তর থেকে এই দেবকুল উত্তীর্ণ হয়েছে। বাংলার লোকশিল্প লোকধর্মও কর্মকে অনুসরণ করে বিকাশ লাভ করেছে। কেননা লৌকিক দেব-দেবীর পুতুল-প্রতিমার মধ্যে শিল্প বিকাশের উপাদান নিহিত। মানুষ আদিম যুগে যেমন জৈব প্রেরণার বশে শিল্প গড়েছে, লোকায়ত পর্বে তেমনি এক দৈব কিংবা জাগতিক প্রেরণার বশে শিল্প সৃষ্টি করেছে দেয়ালের গায়ে, গৃহাঙ্গণে অথবা কুলদেবতার বা গেরাম দেবতার থানে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর অঞ্চলের লোকোৎসবের মধ্যে অন্যতম হল, কুদ্রা, বড়ামপূজা, ভৈরবপূজা, চণ্ডীপূজা, ধর্মপূজা ও মনসাপূজা। ...'এই কুদু বা কুদ্রা-বড়াম ও ভৈরব বনে-জঙ্গলে, গাছতলায়, মাঠে ঘাটে

১ In lower Bengal (Deltaic Bengal) Dakshin Roy is recognised as the presiding deity over tigers. As he is the presiding deity in the Southern part of Bengal he is known as Dakshineswar. According to some Scholars Dakshin Roy was a famous hunter who hunted numerous tigers and crocodiles and gradually he was turned into a legendary deity./Ritual Art of the Bratas of Bengal/S. K. Roy.

২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি/পৃ. ৬৭৭/বিনয় ঘোষ

থাকেন। ভৈরব হলেন ক্ষেত্রপালের ভৈরব। বুড়ো ও বড়ামও প্রায় তাই। এঁরা সকলেই বনদেবতা। মূলতঃ টোটেম চিহ্নিত গ্রাম্য দেবতারা বনাঞ্চল পরিত্যাগ করে গৃহ-দেউলে আশ্রয় নিতে পারেন নি। তার অন্যতম কারণ উচ্চবর্ণের কাছে বা ব্রাহ্মণ্য বিধানে এরা আজও অপাঙ্‌ক্তেয়, অশুচি। প্রসঙ্গত লক্ষীপুজার লোকায়ত লক্ষী আজও গৃহের বাইরে পূজা পেয়ে থাকেন এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণপুরোহিতের বাঁ হাতে। ইনি হলেন অলক্ষী। পৌষমাসেই সাধারণত বড়াম ও ভৈরব পূজার সময়। এই সময় স্থানীয় কুম্ভকারেরা বিশেষত বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং হুগলী জেলায় অসংখ্য হাতি-ঘোড়া তৈরী করেন। এই হাতি, ঘোড়াগুলি ছলন বা মানত হিসেবে বড়াম-ভৈরবের থানে উৎসর্গ করা হয়। সাঁওতাল, লোধা, বাউড়ী, মহালী, ডোম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীই এই গ্রাম্য দেবতার উপাসক। "আগডোম্ বাগডোম্ ঘোড়াডোম্ সাজে" শীর্ষক ছড়ার মধ্যে মধ্যযুগের বাংলাদেশের ডোম চতুরঙ্গ সেনার পরিচয় পাওয়া যায়। এর সঙ্গে বাঙালীর টোটেম স্মৃতি বিজড়িত হয়ে রয়েছে। লাউসেনের লোক-সেনাবাহিনীর শক্তির পরিচয়ও এতে রয়েছে।

বড়াম্ দেবীর মূর্তি কোথাও কোথাও এখন তৈরী হচ্ছে। যেমন টুসু, ভাদু ইত্যাদির মৃন্ময়ী মূর্তি সাম্প্রতিককালে তৈরী হচ্ছে। মনে হয় হিন্দুদের প্রতিমা শিল্প ও মূর্তির প্রভাবে এই পরিবর্তন আদিবাসী লোকায়ত সমাজেও দেখা দিয়েছে। বড়াম্ দেবীর মূর্তিতে একটা লতাপাতা আঁকা মুকুট দেখা যায় বাঁকুড়া অঞ্চলে। মৃন্মূর্তির চারপাশে ছড়ানো থাকে হাতি-ঘোড়ার পুতুল-ছলন। এমন কি বাঘের ওপর দেবতা কিংবা দেবতার পায়ের তলায় বাঘও দেখা যায়। অনেকে দক্ষিণরায়ের বারামূর্তির সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুঁজে পান। তার কারণ বারামূর্তির চিত্রিত ঘটের ওপরে লতাপাতা আঁকা থাকে। বড়ামেরও তাই। মনে হয় বনাঞ্চলে এদের উৎস বলে বৃক্ষপত্রলতা এদের প্রতীক দ্যোতনা করে। অথবা আদিমকালে এরা বৃক্ষরূপী দেব-দেবী ছিলেন। কালক্রমে মানবরূপী মূর্তির সঙ্গে এদের সমন্বয় ঘটেছে এবং আদিমস্মৃতি ও সংস্কারের বশবর্তী হয়ে বৃক্ষ-লতা-পাতা এদের মূর্তি প্রকল্পে ঠাই পেয়েছে। লোকধর্মচেতনার বিবর্তনে এটাই স্বাভাবিক।

গ্রামদেবতার বহুরূপ বাংলার গ্রামে গ্রামে পরিলক্ষিত হয়। যেমন ভূতপ্রেত, গুরুদেবতা (ডোমগুরু), লোধাসিনি, ডাকিনী দেবতা, পাহাড়, বন-গুহা, আত্মা, বৃক্ষ, নদ-নদী নালা, পশু ও পশু দেবতা, (যেমন বাঘুৎ, মহিষাসুর, নরসিংহ), সর্প দেবতা, (মনসা), চন্দ্র, সূর্য, পবন, ক্ষেত্রপাল, ভূদেবী ও গ্রামের প্রান্তিক দেবতা বাশুলী, রংকিণী, সিনি প্রভৃতি। পুরুষ গ্রাম দেবতার প্রতীক শিলাখণ্ড, স্ত্রী গ্রাম

দেবতার প্রতীক ঘট। অথবা শিলাখণ্ড লিঙ্গ দেবতারূপে পরে শিবের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে, অথবা না হইলে তাহা ধর্মরাজের পাদপীঠ সিংহাসন অথবা তাঁহার পাদুকার ও সিংহাসনের আধার কূর্মরূপে কল্পিত হইয়াছে।' [ডঃ সুকুমার সেন/বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস/১ম খণ্ড/পূর্বার্ধ] প্রসঙ্গত একটি সাদৃশ্য বাচক বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। দক্ষিণ রায় বা বনবিবির থানে পশুবলি বিহিত এবং পশুবলির রক্ত থানের সামনে ভূমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বড়াম দেবীর পূজাতে পশুপক্ষী বলি দেওয়া হয়। নৈবেদ্য হিসেবে দেশী মদ ও মাংস দেবীর সামনে উৎসর্গ করেন ভক্তরা। নাচ-গানও চলে রাতের আঁধারে। এর ফলে দেবী প্রসন্না হবেন এবং রক্তস্নানের ফলে এদের ধারণা বসুন্ধরা উর্বরা হবে। একে Fertility cult বা প্রজনন ধর্মের নিদর্শন বলা চলে।

বাংলা দেশে আরও অনেক ব্রত-পার্বণ আছে যেগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলা দেশের লোকায়ত ধর্মচেতনার সঙ্গে জড়িত। বসুন্ধরা প্রসঙ্গে কয়েকটি ব্রত পার্বনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন তুঁষতুষলী বা তোষলাব্রত, পৃথিবীব্রত ও পুণ্যিপুকুর ব্রত। বসুন্ধরার প্রজনন শক্তি এবং শস্যফলন বৃদ্ধির জন্য এই ব্রতগুলি উদযাপিত হয়। যদিও মেয়েরা কামনা-বাসনা চরিতার্থতার জন্য এই ব্রত পালন করেন। তুঁষতুষলী ব্রতটি বসুন্ধরার প্রজনন সম্পর্কিত একটি ব্রত। সুতরাং বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। এই ব্রতটি বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে সমানভাবে প্রচলিত আছে। অগ্রহায়ণসংক্রান্তিতে শুরু হয় এবং সারা পৌষমাসের সকালে মেয়েরা ব্রতটি পালন করেন। নিম্নলিখিত উপকরণগুলি এই ব্রতে প্রয়োজন হয়। আলোচালের তুঁষ, গাই গরুর গোবর, সরষের ফুল, মূলোর ফুল আর দূর্বা। গোবরের সঙ্গে তুঁষ মিশিয়ে ছ'বুড়ি ছ'গণ্ডা নাড়ু তৈরী করে, কালো দাগশূন্য নতুন সরাতে বেগুনপাতা বিছিয়ে তার ওপর নাড়ুগুলি রাখতে হয়। প্রত্যেক নাড়ুতে একটি করে সিঁদুরের ফোঁটা এবং পাঁচ গাছি করে দূর্বা গুঁজে দিতে হয়। তার ওপর নতুন আলোচালের তুঁষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, সরষে, শিম, মূলো ইত্যাদির ফুল ছড়াতে ছড়াতে ছড়া বলেন ব্রতিনী : নবান্নের তুঁষ,/অষ্টবর্ণের গোবর,/বিয়া কর স্বর্গের উপর। এই ধরনের আরও অসংখ্য ছড়া আবৃত্তি করেন। অন্য একটি ছড়ায় বলছেন : গাইয়ের গোবর,/সরষের ফুল,/আসনপিঁড়ি,/এলোচুল ইত্যাদি। 'এলোচুলে নৃত্য' করতে দেখেছি হুদুমদেও এবং মদনকাম নৃত্যে কোচবিহার জেলায়। অবনীন্দ্রনাথ 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে বলেছেন : সেঁজুতিতে (কোজাগর লক্ষ্মীপুজোর মত এক অনুষ্ঠানে) মেয়েরা এলোকেশী হয়। শস্য যেন এলোকেশের মতো গোছা গোছা হয়। সেঁজুতির পৌরাণিক বর্ণনায় এই নৃত্যটি এইভাবে বিবৃত হয়েছে :

'The women of the village took their hair unbound, so that by sympathetic magic the maise might take the hint and grow correspondingly long'.

কোথায় বাংলাদেশ আর কোথায় মেক্সিকো। কিন্তু এক আশ্চর্যজনক আদিম সমতানুষঙ্গে উভয় দেশের লৌকিক ধ্যান-ধারণার জন্ম হয়েছে।[১] লোকশিল্পের আলপনা চিত্রের অনেক অভিপ্রায় মিশর, ক্রীট, গ্রীস দেশের শিল্পমণ্ডনকলার সাদৃশ্যসূচক। গবেষকদের সামনে এই প্রসঙ্গে এক বিরাট প্রশ্ন রয়েছে—কোথায় প্রথম আলপনার জন্ম হয়েছিল? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া চলে না। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন: একই চিন্তা, একই শিল্প, একই মণ্ডন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে, এটা মানুষের ইতিহাসের একটা সাধারণ ঘটনা।[২] সমাজতত্ত্ববিদ এবং লোকসংস্কৃতিবিদেরাও মনে করেন আদিম সমাজমনস্তত্ত্বের ধারা একই খাতে প্রবাহিত। একজন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ বলেছেন: 'Folk is the basis of all cultures'. লোক যখন সংস্কৃতির মর্মকোষ, তখন সর্বত্রই এর বিকাশ ধারা এক সাধারণ সমতা রক্ষা করে। যেমন আদিম সাম্যবাদ পৃথিবীর সবদেশেই আদিম সমভোগবাদী সমাজে বিকশিত হয়েছিল।

তোষলা বা তুষ তুষলী ব্রতের সঙ্গে মানভূম, মেদিনীপুরের টুসু, তুসু পরবের সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ টুসু পরবে পুরুলিয়ার বাঁধোয়ান, ঝিতান, চাকলতোড় প্রভৃতি গ্রামের মেয়েরা মাটির মালসায় গোবর ঢেলা রাখেন এবং গোবরের ওপর তুষ ছড়িয়ে দেন। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে এই আচার শুরু হয় এবং সারা পৌষমাস চলে। একে বলে 'টুসু পাতা'। তারপর প্রতি সন্ধ্যায় টুসু গান বাঁধেন বা রচনা করেন। চলে টুসু জাগরণ। এইভাবে চলে সাঁঝের বেলায় মৃদু প্রদীপালোকে টুসুর 'জাগরণ গান'। টুসু কোথাও দেবী, কোথাও কন্যা আবার কোথাও সই। সীমান্তবাংলার গৃহজীবনময় টুসু যেন এক দুর্ভেদ্য নারীশক্তি। পৌষসংক্রান্তির সকালে মেয়েরা বাঁধে বা পুকুরে বা কাঁসাই নদীতে টুসু বিসর্জনের জন্য মিছিল করে গান গাইতে গাইতে চোড়ল (চতুর্দোলা) নিয়ে এগিয়ে চলেন নদীর ঘাটে। টুসুকে সীমান্ত বাংলার নবান্ন বা পিঠেপুলির উৎসব বলা হয়। কারণ এই সময়ে ঘরে ঘরে সোনার ধান তোলা হয় এবং পিঠে পুলি তৈরী করার একটা রীতি রয়েছে। টুসু পরব শস্য প্রজননের উৎসব হিসেবে আদিম ধর্মীয় বিশ্বাসের ছাপ

১ Myths of Mexico and Peru—P. 85
২ বাংলার ব্রত/পৃঃ ৭৭

বহন করে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এই ধরনের নবান্ন উৎসব প্রচলিত আছে। কৃষিভিত্তিক সমাজে শস্যবিষয়ক উৎসবের প্রাচুর্য স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়। পৃথিবী এবং ধরিত্রী সমার্থক। কাজেই ধরিত্রীর মানুষ, প্রজনন ও বৃক্ষলতা শস্যাদি নিয়েই উৎসবের সামগ্রিকতা। উৎসব, পার্বণ ও দেবদেবীর উৎপত্তি বিকাশ আলোচনায় দেখা গেছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই মানুষের জীবনচক্র এবং প্রকৃতির ঋতুরঙ্গ। সুতরাং পৃথিবী সম্পর্কিত আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে লৌকিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।

বাংলা দেশের লোকসংস্কৃতির এই বহু বিচিত্র উপকরণগুলি আর্যেতর জনগোষ্ঠীর দান। কোন্ প্রাচীনকালে এই আত্মীকরণের পালা চলেছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে সেই ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় দুঃসাধ্য। কারণ এদের কোন কালচিহ্ন নেই। এক চলমান কালের প্রবাহে জন-জনান্তরে স্মৃতিতে-শ্রুতিতে, বচনে-বাচনে ও আচরণে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে লোকসংস্কৃতি। কোন নির্দিষ্ট সাল তারিখ নিজের বুকে এঁকে রাখে নি। কারণ মানসজগতের কোন সাল তারিখ প্রয়োজন হয় না, এ ধারা শাশ্বত, চিরন্তন; অসীমকালের অঙ্গনে এর লীলা। বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা যে ধান, ধানের গুচ্ছ, দূর্বা, হলুদ, শস্য, সুপারি, পান, নারিকেল, সিঁদুর, কলাগাছ, ঘট, পট, প্রতীক, আলপনা, গোবর, কড়ি, তুঁষ ইত্যাদি ব্যবহার করি, এগুলি মূলত সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, রাজবংশী, শবর, হাজং, গারো, চাকমা এবং তথাকথিত বর্ণেতর হাড়ি, ডোম, বাগদী, বাউড়ী, নমঃশূদ্র, কৈবর্ত, জোলা প্রভৃতির সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। এগুলি তাদেরই অবদান বলা চলে। একদিন আমরা সকলেই এদের সঙ্গে একাত্ম ছিলাম। আজ কালের নির্মম শ্রেণীবিন্যাসে একে অন্য থেকে দূরে। অর্থের মমতাহীন কৌলিন্য এনেছে ব্যবধান। আবার মানুষ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সম-সমাজ শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবে। সেদিন উৎসব হবে বিশ্বগত।

ঋতু

সূর্যের নিত্য ও বার্ষিক আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের জীবনচক্রও ঘোরে, পৃথিবীও আপন অক্ষে দাঁড়িয়ে প্রতি দিনে, বছরে একবার আবর্তিত হয়। দেবতার জন্মের পূর্বে মানুষের জীবনরঙ্গে প্রকৃতি ও ঋতুই[1] ছিল একমাত্র উপাস্য। ঋগ্বেদে

১ ঋতু—ঋৎ (ঋ+তুক্—কর্তৃ), গমন করে যে। মাঘাদি দুই মাসে এক এক ঋতু এবং তিন ঋতুতে এক অয়ন, উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অয়নে এক বৎসর হয়। —অমরকোষ

অনুসারে বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ এই তিনটি ঋতুর উল্লেখ আছে (১০.৯০.৬)। শতপথ ব্রাহ্মণে সংবৎসরে তিন, পাঁচ ও ছয় ঋতুর উল্লেখ আছে। ঋতু শব্দটি কাল বিভাগ ছাড়াও স্ত্রী-রজোদর্শন, স্ত্রীকুসুম, ঋতুকাল, গর্ভধারণযোগ্যকাল বুঝিয়ে থাকে। [বঙ্গীয় শব্দ কোষ / প্রথম খণ্ড] ঋতু পরম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উপকরণ। কালচক্র এগিয়ে চলেছে যুগ-যুগান্তরে গতিপথে। ঋতু-পরিবর্তন জীবনের চলার গতির পরিবর্তন মাত্র। নারীর রজঃ, ঋতুমান। সূর্যবৃত্ত মানবজীবন তাই সূর্যকে পূজা করেছে, অনুকরণ করেছে আপন জীবনে। ঋতুর চলার ছন্দে মানুষ পালন করেছে উৎসব পার্বণ ব্রত। এই চলার ছন্দই জীবনযাত্রা। যাত্রার অর্থ গমন। আমরা চলেছিলাম, আজও চলেছি, এরপরেও চলব। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জগৎ, আমাদের প্রকৃতি, আমাদের সূর্য, দৃশ্যমান সবকিছু চলবে। এই চলার আনন্দ-সরণি উৎসব। প্রাচীন ভারত সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ কামনা করেছে। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, আকাশ, বনস্পতি, জলরাশি, প্রাণী সকলের মঙ্গল কামনায় মঙ্গলাচরণ করেছে প্রাচীন বৈদিক ভারতবর্ষ। অথর্ববেদের ঋষি প্রার্থনা করেছেন: 'দশ দিক আমার মিত্র হোক, সকলকে যেন মিত্রের দৃষ্টিতে দেখতে পারি। সকলে সুখী হোক' —এই উদার প্রার্থনার মধ্যে সর্বকালের উৎসবের মর্মবাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আজকের লোকায়ত ও শাস্ত্রীয় সকল উৎসবের মূলকথা সকলের কল্যাণ বোধ। সমষ্টি চেতনার আলোকতীর্থে উৎসবের আনন্দদীপ জ্বালানোর জন্যই উৎসব।

আমাদের দেশে উৎসব মূলত ঋতুকেন্দ্রিক। যেমন আমাদের দেশের দুর্গোৎসবকে শারদীয়া বা শারদোৎসব বলে এবং শ্রীপঞ্চমী, দোল ও বাসন্তী উৎসবকে বলি বসন্তোৎসব। আর দীপান্বিতাকে বলে হেমন্তোৎসব ও নবান্ন ইত্যাদিকে বলে পৌষোৎসব। আজকাল আমাদের দেশে বৈশাখ মাসে নববর্ষ শুরু হয়। বৈদিক যুগে কিন্তু তেমন হত না। ঋগ্বেদের ঋষিগণ সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভে নববর্ষের শুরু করতেন। যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি বলেছেন: 'দোলযাত্রা তাহারই স্মৃতি। উত্তরায়ণে হিমঋতু আর দক্ষিণায়ণে বর্ষা ঋতু শুরু হত। সেকালে এই দুই ঋতুই জানা ছিল।'

ঋতুমূল উৎসবের মধ্যে দোল-দুর্গোৎসবই ভারতে অতি জনপ্রিয়। 'দোল-দুর্গোৎসব বাঙালির প্রিয় উৎসব হইলেও দোলে কৃষ্ণকে দোলায় স্থাপনের পরিবর্তে নানা রকম রং ব্যবহারের যে বাহুল্য তাহা স্পষ্টতই বাংলার বাহিরের হোলির অনুকরণে।'[১] মন্তব্যটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। দোল বাংলার বসন্তোৎসব। কিন্তু এই উৎসবের মৌলিক উপকরণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক এর প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক

১ বাংলার পালপার্বণ/চিন্তাহরণ চক্রবর্তী:

বৈশিষ্ট্য কি কি আছে। বাংলা, ওড়িশা ও মাদ্রাজে (তামিলনাড়ু) দোল নাম প্রচলিত আছে। উত্তর পশ্চিম ও মধ্যভারতে এর নাম 'হোলি'। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেছেন: 'বঙ্গদেশে হোলি নাম অজ্ঞাত ছিল। কয়েক বৎসর হইতে উত্তর ভারতের লোকদিগের মুখে প্রচারিত হইয়াছে।' [পূজাপার্বণ। পৃঃ ৫০৫] লোকমুখে এবং স্মৃতিতে প্রচারই লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির মৌলিক ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য গ্রন্থে বলেছেন: 'লোকসাহিত্যের ধারা দেশের অণুপরমাণুতে সঞ্চারমান থাকে। ক্রমে ক্রমে এই সঞ্চারমান, বিচ্ছিন্ন উপকরণগুলি একটি পূর্ণ অবয়ব ধারণ করে। ধর্মোৎসবে দেখেছি কত বিচ্ছিন্ন উপকরণ কালক্রমে মিশে গেছে। এক নিটোলরূপ ধারণ করেছে।' লোকমানসের সহজবোধ এই বিচ্ছিন্ন উপকরণের বিচার করে না। একান্ত আপন করে নেয় সহজ গ্রহণ শক্তি দিয়ে। এই প্রসঙ্গে জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন: "Custom, rite, and belief—these elements of folklore constitute a very recognizable phase in the religious and social life of the people of the country where they are found" [১] সুতরাং লোকবিশ্বাসের এবং ধর্মীয় আচরণের বহুবিধ উপকরণ কোন এক উৎসবাচারে মিলিত হতে পারে। দুর্গোৎসবে এবং ধর্মোৎসবে তাই হয়েছে। অন্যান্য লোকোৎসবেও অনুরূপ অন্বয় সম্ভব।

ভারতবর্ষে দোল উৎসবের প্রাচীনতা বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কারণ জৈমিনির 'মীমাংসা সূত্রের' শবরভাষ্যে এবং মনীষী আলবেরুনির 'কিতাব শত্ তহকিক্ আলহিন্দে' হোলির উল্লেখ আছে। সেকালে হোলি ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত হত। অনেকে মনে করেন 'হোলি' শব্দ সংস্কৃত হোলিকা শব্দজাত। হোলিকা অর্থে শস্য বোঝাত। মিশর দেশের শস্য দেবতা ফেলিকার (Phallica) সঙ্গে হোলিকার ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে। গ্রীসের বসন্ত উৎসবের নাম ফাগেনা, রোমের বসন্ত উৎসবের নাম আনাপেরুনা (Anna Pareuna)। গ্রীসের ফাগেনা নামের সঙ্গে 'ফাগ ও 'ফাগুয়ার' নামগত সাদৃশ্য আছে। সম্ভবত বাংলা 'ফাল্গুন' শব্দ থেকে ফাগ, 'ফাগুয়া' এসেছে। হোলিকে মদনোৎসবও বলে। কেননা হোলির সঙ্গে রতি ও মদনের উপাখ্যান এসে মিশেছে। দোলপূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাকালে তৃণ কাষ্ঠাদি পুঞ্জীভূত করে পূজাদি সমাপন করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে যে উল্লাসজনক উৎসব পালন করা হয় তাকে বলে 'বহ্ন্যুৎসব'। আবির ও রং খেলাকে সাধারণত হোলি বলা হয় বাংলাদেশে। দোল বা হোলির সঙ্গে

১ **Encyclopaedia of Religion and Ethics/Vol. VI/p. 59/Edited: James Hastings.**

বহ্ন্যুৎসব অনুষ্ঠান যুক্ত হয়েছে। রং, আবির, চন্দন, গুলালের খেলা দোল। দোলে দোলায় চড়েন শ্রীকৃষ্ণ এবং শালগ্রাম শিলারূপী বিষ্ণু। বাংলাদেশে ঝুলন যাত্রায় রাধাকৃষ্ণের দোলন হয়। দোলন, ঝুলন বা চড়ক যেন সূর্যের আবর্তন গতির সঙ্গে এক অলক্ষ্যসূত্রে গ্রথিত রয়েছে।[১] অয়নান্তে চক্র ঘূর্ণন (Swinging) যেন জীবনের কাল উত্তরণের আভাস এনে দেয়। নদীর একই স্রোতধারায় যেমন দুবার স্নান করা যায় না ঠিক তেমনি জীবনচক্রের একই পথে আমরা দুবার পরিক্রমা করিনা। সেইজন্য জীবনপথ 'নিতুই নব', নিত্যনূতন।

দোলপূর্ণিমার পূর্বদিনে বহ্নিউৎসব হয়। আঞ্চলিক ভাষায় একে 'চাঁচর'[২] বলে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ভেড়ার (মতান্তরে মেড়ার) ঘর পোড়ানো হয় দোলোৎসবে। ইউরোপের বহুদেশে এই ধরনের বহ্নিউৎসবের প্রচলন আছে। অনেকে মনে করেন সংস্কৃত 'চর্চরী' শব্দ থেকে চাঁচর শব্দ এসেছে। এর অর্থ—হর্ষধ্বনি। 'চাঁ' শব্দের অর্থ পাখীর চিৎকার, চেঁচামেচি, অসন্তোষজ্ঞাপক শব্দ। অনেকে হর্ষক্রীড়া অথবা বসন্ত সময়ের ক্রীড়াকেও চাঁচর বলেন। হর্ষধ্বনির কারণ শত্রু নিধন। দুর্গোৎসবে শত্রুবলি বা ভূতবলী অনুষ্ঠান হয়। এখানেও শত্রুনিধন অনুষ্ঠান। যা কিছু কুৎসিত, যা মন্দ, অকল্যাণকর, যা আমাদের অস্তিত্বকে নিধন করে তাই 'চাঁচর'। এইরকম কোন সুপ্রাচীন স্মৃতি চাঁচরে অনুপ্রবেশ করেছে। চাঁচর অনুষ্ঠানে শুকনো খড়, পাতা, বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে বালকেরা মাঠের মাঝখানে বা পুকুর ধারে ছোট চালাঘর তৈরী করে। সেই ঘরের মধ্যে পিঠুলির তৈরী ভেড়া[৩] বা মেন্টাসুর অথবা নরমূর্তি স্থাপন করা হয়। তারপর সন্ধ্যালগ্নে ঐ ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বিপুল হর্ষ ও আনন্দধ্বনির মধ্যে ভেড়ার ঘর অর্থাৎ ভীরুতা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যেন গোষ্ঠীর বা সমাজের সমস্ত অমঙ্গল, বা সমাজশত্রু পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বাংলাদেশের উৎসবে কোথাও কোথাও কালান্তর ঘটেছে। বসন্ত-বর্ষায় দুবার দোল বা শ্রীকৃষ্ণের ও নারায়ণের দোলন হয়। বসন্তে দোল, দোলন, বর্ষায় ঝুলন। প্রথমে চৈত্র মাসে দোল হত, পরে

---

১ 'One of the festivals of Modern India is "Dola-Yatra" (Swing-Festival) or rather the swinging itself, which represents the Sun course, and was very likely borrowed from the aboringines.'
Encyclopaedia of Religion & Ethics/Edited : James Hastings.

২ চাঁচর বি [সং চর্চরী > চচ্চরী > বা চাঁচরী ;], কুঞ্চিত, কোঁকড়া। দোলে বা হোলী পর্বে করণীয় অগ্ন্যুৎসবাদি হর্ষক্রীড়া (খেলাতামাশা) 'চাঁচরী খেলাওঁ দোঅ'/শ্রী. কৃ. কী.। বঙ্গীয় শব্দকোষ/প্রথম খণ্ড

৩ মেষ [সং মেড্রক]; কাপুরুষ ; ভেড়া ; বাইজীর সঙ্গে বাজায় এমন বাদক। সংসদ বাঙালা অভিধান/৩য় সংস্করণ/১৯৭৫

ফাল্গুনে হোলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।[১] দোলে আবির ও রং খেলা একটি বিশেষঅঙ্গ। রক্তিম রং দেহে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে আদিম কালের বলিদান প্রথার আভাস রয়েছে। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু এই উৎসবকে বলেছেন: 'an agricultural sacrifice to ensure good crops'.[২] কৃষির দেশ বাংলা। সুতরাং রক্তউৎসর্গ করার এক আদিম ধারণা এর সঙ্গে যে মিশেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বসন্তকালে বাংলা দেশে উর্ব্বরতা-বাদের দেব-দেবীর পূজার প্রচলন আছে। বসন্তকালে পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ জেলায় কুমারী মেয়েরা বসন্ত রায় বা কান্তরাজ নামে এক দেবতার পূজা করে[৩]। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দুপুর বেলায় বাঁশের ঝুড়িতে করে মেয়েরা দ্রোণ লতার ফুল, ধুতুরা, মাঁদার, পলাশ ও অন্যান্য মরশুমী ফুল নিয়ে কদম্ব বা নিমগাছের তলায় জড়ো হয়। অল্প কর্দম মাটি গাছতলায় ঢেলা পাকিয়ে রাখে, তারপর আতপ চাল, দুর্বা তার উপর ছড়িয়ে দেয়। তাদের কামনা বসন্তরায়ের মত সুন্দর বরলাভ। নদীয়া ও পাবনা জেলায় ইতুকুমার বা উত্তমকুমার ব্রতে মেয়েরা অনুরূপভাবে সুন্দর বর কামনা করে। এই ব্রত উপকরণ বিশ্লেষণ করলে মনে হয় এটা কোন বৃক্ষদেবতার ব্রত। বৃক্ষ উর্বরতাবাদের প্রতীক। অতএব প্রজনন শক্তি কামনা অজ্ঞাতসারে এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য প্রজনন শক্তির-দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য বলিপ্রথা আদিম সমাজস্বীকৃত। শুধু আদিম সমাজ কেন, বৈদিক সমাজেও যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া হত। সভ্যতার ও সমাজের বিবর্তনে এবং অগ্রগমনে বলি প্রথার পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র। ঋগ্বেদে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং কালিকাপুরাণে নরবলির উল্লেখ আছে। পৃথিবীর বহু প্রাচীন সভ্যতায় নরবলির নিদর্শন পাওয়া যায়। চাঁচর অনুষ্ঠানে যে নরমূর্তি পোড়ানো হয়, তা বলিপ্রথার পরিবর্ত বলে মনে হয়। নরখাদক রাক্ষসদের নিধন করার জন্যই যেন চাঁচর অনুষ্ঠান করা হয়। এই বহ্ন্যুৎসবে নৃতত্ত্ববিদেরা সূর্য-যাদুর সন্ধান পেয়েছেন। ফ্রেজার প্রমুখ সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন: সূর্যের আলোক চক্র অনুকরণ করার জন্য পৃথিবীতে বহ্নিউৎসবের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে হোলকা বা হোলি যেন ডাইনী বা রাক্ষসী বিতার বিরুদ্ধে বহ্ন্যুৎসব। যে কুশপুত্তলিকা চাঁচরে দাহ করা হয়, তা যেন রাক্ষসীর প্রতিমা। এই ডাইনী বা রাক্ষসী যেন ভূমির উর্বরতার শত্রু। এই প্রতিরোধী শক্তির নিধন করতে পারলে ভূমির উর্বরাশক্তি

১ Nirmal Kumar Bose/Indo-Asian Culture: July/1953/p. 375
২ Man in India Vol. VII: 1927/p 144
৩ Sarat Chandra Mitra: Man in India: 1929 Vol. IX/p. 230

বৃদ্ধি পাবে। সেই জন্য মনে হয় পরোক্ষভাবে টাচর উর্বরতাবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এ যেন বন্যাকৃষির, অহল্যাকৃষির জাগরণ। ভারতবর্ষে হোলি ও দোলোৎসবের সঙ্গে বহুযুগের বহু উপকরণ মিশে গেছে। আদিম কৃষি উর্বরতা, নরবলি, পূর্ব-বাস্তু, চক্র-দোল, মদনোৎসব, শবরোৎসব, কৃষ্ণের দোলযাত্রা, বর্ষা-বসন্ত প্রভৃতি ঋতু বিভিন্ন যুগে একপাত্রে সমীকৃত হয়েছে, সমন্বিত হয়েছে। এই রকম পুঞ্জীভবন লোকসংস্কৃতির বহু ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি। দোল বা হোলি একদিনের বা একযুগের সৃষ্টি নয়। বরং এক চলমান কালপ্রবাহে এর উৎপত্তি, বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন: প্রাকবৈদিক আদিম কৃষিসমাজের বলি ও নৃত্যগীতোৎসব এইভাবেই বর্তমান হোলীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারতের নানা জায়গায় এখনও হোলী বা হোলক উৎসবকে বলা হয় শস্যোৎসব।' [বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব]

বাংলাদেশের উৎসবমাত্রই ঋতুভিত্তিক। সেইজন্য সাধারণভাবে সব উৎসবকে ঋতুউৎসব বলা চলে। কিন্তু উৎসবের বিশেষ তাৎপর্য অনুসারে, উৎস ও বিকাশের দিক থেকে বিশেষ বিশেষ উৎসব স্বাতন্ত্র্যের দাবি করে। বাংলা লোকউৎসব কলাকে পৃথিবী, কৃষি, (শস্য), ঋতু জীবজন্তু[১] ইত্যাদি বিভাগে বিভক্ত করা চলে সামগ্রিকভাবে। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গভীরতর তাৎপর্য বাংলার লোকউৎসবে নিহিত আছে। উৎসবের মূলকথা আঞ্চলিক মানুষের ধ্যানধারণা এবং ক্রিয়াকর্ম, চিন্তা-ভাবনার স্ফুরণ, প্রকাশপ্ত পদ্মের শতদলে বিকাশ। জীবনমৃত্তিকায় স্বর্ণকমল ফোটানো। যে জাতির জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু আচারসর্বস্ব, তার উৎসবকলা বিশেষ আদিমধর্মে তাৎপর্যপূর্ণ। এইগুলি জাতির মানসিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার বিশেষ সহায়ক।

বসন্তকালীন যে উৎসবগুলি আমাদের মনে বিশেষ দোলা দেয়, দোল, শ্রীপঞ্চমী এবং সীমান্তবাংলার সরহুল তাদের মধ্যে অন্যতম। পুরুলিয়া, মানভূম, সিংভূম, ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণার ভূমিজ, সাঁওতালরা আর ছোটনাগপুর ও সুন্দরবনের ওরাওঁরা এই সরহুল পরব চৈত্রমাসে উদযাপিত করেন। শালবনের শালুই থানে, শাল-পলাশের বনতলে রাঙা কুসুম ঝরে পড়ে। রুক্ষ কঠিন পাহাড়িয়া

[১] In modern times the Sacrifice of human beings has been replaced by that of animals—chiefly buffalces and goat but some families whose ancestors offered human victims at the Durga and Kali pujas, now sacrifice, in lieu of living man, an effigy, about a foot long, made of dried milk (Khira). Encyclopaedia of Religion and Ethics/(Vol : VI) P. 851
Edited : James Hastings.

রাতিতে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায় মাদল আর ধামসার তালে তালে।" ওরাওঁরা সরহুলকে নবজীবনের, নতুন বর্ষের উৎসব মনে করেন। গ্রামের পাহান চৈত্রসংক্রান্তির ক'দিন আগে থেকেই আতপ চাল সংগ্রহ করতে গৃহে গৃহে ঘোরেন। এই চাল দিয়ে 'সরহুল মদ' তৈরী হয়। সরহুল উৎসবে হাড়িয়া, শাল ফুল, সিঁদুর, তুলসীপাতা এবং রক্তিম সিঁদুর-মাখা পৈতা এবং একটি সাদা মুরগীর বাচ্চা একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। সরহুল পূজার দিন শোভাযাত্রা সহকারে গ্রামান্তের বনতলে, শালুই থানে বা গেরামথানে সমবেত হয়ে পূজা করেন শালগাছকে। তারপর মুরগী বলি দেন এবং মুরগীর রক্ত বৃক্ষতলে ছড়িয়ে দেন। তারপর সরহুল মদ পান করা হয় এবং নাচ গান চলে মাদলের তালে তালে। শ্রীপঞ্চমীতে বাংলাদেশে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পূজা হয়। এই বিদ্যাদেবীর মৃন্ময়ী মূর্তিই বাংলাদেশে হিন্দুর অতিপ্রিয় দেবী। বৃহদ্ধর্মপুরাণে সরস্বতীর প্রতিমা লক্ষণ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে: 'ইনি শুক্লবর্ণা, ত্রিনেত্রা, শিরে চন্দ্রকলা, হস্তে সুধা বিদ্যা ও অক্ষমালা।' কালিকাপুরাণেও সরস্বতীর উল্লেখ আছে। সেখানে তিনি বীণা-পুস্তকধারিণী, মালা কমণ্ডলুহস্তা। অগ্নিপুরাণেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। সেখানে সরস্বতীকে বলা হয়েছে 'বাগীশ্বরী', চতুর্ভুজা, ত্রিলোচনা। মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমীতে দেবী সরস্বতীর পূজা হত। সেকালে মূর্তি এবং প্রতীক দুভাবেই সরস্বতী পূজা হত। প্রতীক ছিল বই, মাটির দোয়াত এবং শরের কলম। যেহেতু দেবী শুভ্রা, সেহেতু পূজার অন্যান্য উপকরণও ছিল শুভ্র। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেছেন: "সরস্বতী পূজার দিন পশ্চিমে প্রথমে হোলিগান হইয়া থাকে, বোধহয় তাই থেকে বাংলাদেশে দেবীর নিকট আবীর দিবার নিয়ম হইয়া থাকিবে।"[১] সাম্প্রতিক কালের সরস্বতী পূজায় রক্তপলাশ একটি অপরিহার্য উপকরণ। বসন্ত নবায়নের, যৌবনের ঋতু, এই নবায়ন প্রকৃতির এবং মানুষের। সুতরাং রক্তরাগ নবজীবনের উদ্বোধন সূচনা করে। যেমন আদিম ও লোকায়তস্তরে মানুষ বলি প্রদত্ত প্রাণীর রক্তিম শোণিতে পূজার, উৎসবের প্রাঙ্গণতল রাঙিয়ে দিত, ঠিক তেমনি হোলি আর দোলের আবির গুলাল রঙের খেলা; শ্রীপঞ্চমীর পলাশফুলের রংয়ের মেলা সেই প্রাচীন স্মৃতির নবরূপমাত্র। তাছাড়া সরস্বতীর প্রাচীন কোন প্রতিমালক্ষণ ছিলনা। প্রতিমা শিল্পের উৎপত্তি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, মানুষের প্রকর্ষিত শিল্পও রূপচেতনার ফলশ্রুতি। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ম্যাকস মূলার মনে করেন: "The religion of the Veda knows no idols. The worship of idols in

১ শ্রীভারতী দেবতত্ত্ব গ্রন্থমালা/১ম সংখ্যা: সরস্বতী/পৃঃ ৪০

India is a secondary formation, a later degeneration of the more primitive worship of the ideal gods".[১]

বিদ্যার দেবী বা বাগ্‌দেবী সরস্বতী শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর বহুদেশে বহুনামে পূজিতা হন। প্রাচীন গ্রীসে সিউস, জাপানে বেনতেন, তিব্বতে বজ্রসরস্বতী, বজ্রযানী বৌদ্ধরা বলেন 'বজ্রসারদা'। জৈন এবং বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও অঞ্চলে সরস্বতীর ষোড়শ নাম পাওয়া যায়। যেমন রোহিনী, প্রজ্ঞপ্তী, বজ্রশৃঙ্খলা, কুলিশাঙ্কুশা, চক্রেশ্বরী, পুরুষদত্তা, কালী, মহাকালী, গৌরী, গান্ধারী, সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা, মানবী, বৈরোট্যা, অচ্ছুপ্তা, মানসী ও মহামানসী। যে নামেই সরস্বতী পূজিতা হোন না কেন বাংলা বা পূর্বভারতে সরস্বতী বিদ্যাদেবী। শ্রীপঞ্চমী নামের উপসর্গ 'শ্রী'-লক্ষ্মীর দ্যোতনা করে। লক্ষ্মী ও সরস্বতী তখনকার দিনে অভিন্না ছিলেন। অধিকন্তু ঋতুর সঙ্গে জনজীবনের কর্ম-চিন্তা সংযুক্ত ছিল।

ঋতু বা সূর্যের অয়ন জানা না থাকলে কৃষিকাজ শুরু করা সম্ভব হত না। সেকালে মানুষ ঋতুকে কেন্দ্র করেই বর্ষগণনা করত। একই ঋতুকে কেউই আধুনিক কালের মত বর্ষশুরু বলে মেনে নিতনা। কারণ আঞ্চলিক মানুষের, বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দিন মাস ঋতুর গণনা বিভিন্ন ছিল। 'আর্য' এবং অগ্নিকরা এক সার্বিক নিয়মে বর্ষ-ঋতুর সীমা রেখা টেনে দিল। তবুও সময় সময়ে বিভ্রম ঘটত। 'কেহ শীত ঋতু, কেহ বর্ষা ঋতু কেহ শরৎ, কেহ বসন্ত হইতে বৎসর গনিতেন। এইহেতু বিষুব দিনদ্বয়, অয়নাদি দিনদ্বয় এবং ঋতুর আরম্ভদিবস স্মরণীয় হইয়াছিল।'[২] বৈদিক যজ্ঞ এবং পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা মূলত ঋতু ভিত্তিক। সেই স্মৃতি ও ভাবনা ভারতের সমগ্র অঞ্চলে সঞ্চারিত হয়েছে পরবর্তী যুগে। পদ্মাসনা সরস্বতীর শুভ্রপদ্ম জলের প্রতীক দ্যোতনা করে। জল বিশ্বের প্রাণধারার পরিচায়ক। সুতরাং প্রাণ ও আত্মার ধারণার সঙ্গে এই ধ্যান-ধারণাগুলির বিকাশের সংযোগ রয়েছে। বাঙালা দেশে সরস্বতী পূজার প্রাক্‌কালে প্রকৃতির নবরূপ ধারণ এবং পূজায় আবির ও পলাশ উৎসর্গ নৃত্য কলরোল সুপ্রাচীন উর্বরতাবাদের প্রতি ইঙ্গিত করে। বসন্তে অনুষ্ঠিত বলেই শ্রীপঞ্চমীকে 'বসন্তোৎসব' বলা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বসন্তকে নানাভাবে দেখেছেন। কল্পনা কাব্যে 'বসন্ত' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

---

১ Chips from a German Workshop/Vol. I/p. 35/Max Mueller.

২ পূজা পার্বণ/যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

অযুত বৎসর আগে, হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে
মত্ত কুতূহলী
প্রথম যেদিন খুলি নন্দনের দক্ষিণদুয়ার
মর্তে এলে চলি—
অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটির প্রাঙ্গণে
পীতাম্বর পরি,
উতলা উত্তরী হতে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে
মন্দার মঞ্জরি—
দলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি
লয়ে বীণা বেণু,
মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি
ছুঁড়ি পুষ্পরেণু ॥

সূর্য

আকাশে সূর্য, নীচে পৃথিবী—দুয়ে মিলে এক বিস্ময়কর দৃশ্যময় জগৎ। উভয়ের অজানা রহস্য আদিম মানুষের মনে ভয়, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, পূজার এক দোলা দিয়েছিল সুপ্রাচীন কালে। পৃথিবীর সব জাতির সভ্যতায় সূর্য-পৃথিবী প্রথম দেবতার আসন পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বায়ু, চন্দ্র, তারা উপাসিত হয়েছে মিশরে, মেক্সিকোতে এবং ভারতবর্ষে। পৃথিবী—সূর্য-গ্রহ-তারাকে যেমন আদিম মানুষ স্বর্গের দেবতা, উপাস্য করেছে, তেমনি এই পৃথিবী-সূর্যও আদিম মানব-জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে, নিয়ন্ত্রণ করেছে, প্রাণদান করেছে। সূর্যের গতিপ্রবাহে পৃথিবীর রূপ বদলায়, আনে ঋতুরঙ্গ। শস্যশালিনী বসুন্ধরা ফলে ফুলে ভরে উঠলো, কিন্তু এই সৌন্দর্য ও সম্পদ দীর্ঘস্থায়ী হলোনা। ঋতু পরিবর্তনের ইন্দ্রজাল মানুষকে মুগ্ধ করল। দিবারাত্রির লুকোচুরি তাদের চোখে বিস্ময়ের অঞ্জন মেখে দিল। সময়, দিন, মাস, বছর গণনা করতে যখন শিখল, তখন সমগ্র বছরকে দুটো অয়নে ভাগ করে নিল। একটা উত্তর আয়ন, অন্যটি দক্ষিণ অয়ন। দুটি ঋতু দেখা দিল ভারতবর্ষের সৌর বৎসরে। আদিম থেকে লোকায়ত পর্বে মানস-সংস্কৃতির উত্তরণ ঘটল। বাংলাদেশে এই অয়নদ্বয় উৎসব বিকাশের মূল বলা চলে। মানুষের জীবনচক্রে প্রকৃতি ও ঋতুরঙ্গ ছন্দ এনে দিয়েছে। নতুবা সবকিছু একঘেঁয়ে মনে হত।

ভারতীয় জীবনপ্রকৃতির দার্শনিক ও সংস্কৃতি চিন্তার বৈশিষ্ট্যই হল বৈচিত্র্যময়তা। একদিকে যেমন ভারতীয়েরা নিরাকার একেশ্বরকে উপাসনা করেছেন, ব্রহ্ম-স্বাদ আস্বাদন করেছেন, অপর পক্ষে সমগ্র জগৎকে তন্ন তন্ন করে একে একে প্রতিটি দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুকে পূজা করেছেন, মূর্তি গড়েছেন, উপলব্ধি করেছেন। এই বৈচিত্র্যই বহুদেবতার সৃষ্টির মূলকথা। বৈদিক যুগের শেষভাগে একেশ্বরবাদ জন্ম নিয়েছে। তার আগে আকাশের দেবতা, জলের দেবতা, উষা, অগ্নিদেবতা, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সত্তা ও শক্তির দেবতা কল্পিত হয়েছিল। শুধু বৈদিক আর্যরা এইভাবে বহু দেবতার কল্পনা করল না, বরং অন্ত্যজ বা ব্রাত্যরাও দেবতার বহুরূপ খুঁজে পেল সমগ্র জাগতিক সত্তায়। সূর্যও পৃথিবীকে, বিভিন্ন প্রান্তের নরনারী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, বহুনামে উপাসনা করেছেন। বেদে যে দেবতাদের আমরা সন্ধান পেয়েছি, অন্ত্যজদের মধ্যেও তাঁরা পরবর্তীকালে সজীব হয়ে রয়েছেন দেখেছি। যেমন 'বেদের সূর্য' ইজিপ্টে রা বা রে, হর্নস, মেক্সিকোতে রায়মী, বাংলায় রায় বা রাউ। ভারতবর্ষে সূর্যের সমার্থক কয়েকটি শব্দ আছে।[১] সেগুলি হলো মিত্র, আদিত্য। অনেকে মনে করেন, বাংলার ইতুব্রতের 'ইতু' শব্দটা 'মিত্র' শব্দজাত। আবার অনেকে মনে করেন 'ইতু' শব্দটি 'আদিত্য' শব্দজাত। সূর্যসম্পর্কিত ব্রতের মধ্যে ইতু, মাঘমণ্ডল, রাণদুর্গা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[২]

সূর্য সম্পর্কিত উৎসবে 'রথযাত্রা' একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উৎসব বলে বিবেচিত। কারণ রথযাত্রা সূর্যের সপ্তঅশ্ববাহিত রথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বাংলা ও উৎকলে। সাধারণত রথযাত্রা বলতে আমরা জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাই বুঝে থাকি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে সৌর, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী তাদের উপাস্য দেবতার উৎসবে বছরে অন্তত একবার রথযাত্রা অনুষ্ঠান করতেন। কার্তিক মাসে বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা করতেন। উড়িষ্যায় চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে বিশেষ সমারোহে শিবের রথযাত্রা হয়ে থাকে।

---

১ The ancient Mexicans conceived the sun, as the source of all vital forces ; hence they named him Ipalnomohuani, "He by whom men live'./The Golden Bough/James George Frazer.

২ The Sun have many names such as Rai, Raul, Ral, Laul, Surya and Arunthakur etc., The Egyptians worshipped the sun under the names of Horns, Re, Rai, etc ; the Izanian and Greek Mithra and Apollo respectively. The early Vedic Aryans under names—Surya, Savitri, Mitra, etc. The Journal of the Deptt. of Letters./C. U. 1958/Dr. S. R. Das.

কোথাও কোথাও শিবের রথযাত্রা 'চন্দন যাত্রা' নামেও পরিচিত। গোপালপুরের নিকটবর্তী 'চন্দনেশ্বর শিবউৎসব' উপলক্ষে চন্দন যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

হিমালয়ের কুলু উপত্যকায় দুর্গাদেবীর রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় কার্তিক মাসে। এখন আশ্বিনে দেবতার মেলা হয়। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এখনও মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে সূর্যদেবের রথযাত্রা হয়। মেয়েদের 'মাঘমণ্ডল ব্রত' এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণে কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রে বিষ্ণুর রথযাত্রা হয়। বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বৌদ্ধগণ বিভিন্ন বিহারে রথযাত্রা করেন। এমন কি চাকমা বৌদ্ধরা মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় রথের ব্যবহার করেন। জৈনরাও মার্গশীর্ষে (অগ্রহায়ণে) পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের রথযাত্রা করে থাকেন।

পুরীর (উড়িষ্যার) ও মাহেশের (শ্রীরামপুর / পশ্চিমবঙ্গ) রথযাত্রা বর্তমানে খুব জনপ্রিয়। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী এই রথযাত্রাগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন। সম্প্রতি 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচেতনা সঙ্ঘ' কলকাতায় মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রার আধুনিক এক রূপ প্রবর্তনা করেছেন। আষাঢ়ে কৃষ্ণ নামকীর্তনসহ বহু নরনারী এই রথোৎসবে যোগদান করেন।

স্নান যাত্রা, ঝুলন যাত্রা, রাস যাত্রা, চন্দন যাত্রা, প্রাচীন যাত্ পরবের বিবর্তনে বা প্রসারণে বিকশিত হয়েছে। যাত্ শব্দের অর্থ চলা। সূর্য পুব থেকে পশ্চিমে সকাল থেকে সন্ধ্যায় চলেন, মানুষ চলে, কাল চলে, মহাকাল চলে। পথের দেবতা প্রসন্ন মুখে আমাদের ডাকেন, ঘর ছাড়া করেন। যেমন 'পথের পাঁচালীর' অপু চলেছিল নিশ্চিন্দিপুরের সীমানা পেরিয়ে, তেমনি কালে কালে মানুষ চলছে, গ্রহ-নক্ষত্র-তারা চলছে, জীবজন্তু, প্রকৃতি চলছে। এ' চলার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। এ' চলার আনন্দ-বেদনা নিয়ে জীবন যাত্রা।

পুরীর তিনটি রথ নন্দিঘোষ (জগন্নাথ), তালধ্বজ (বলরাম), পদ্মধ্বজ (সুভদ্রা)। প্রত্যেকটি রথে যথাক্রমে ১৬, ১৪, ও ১২টি চাকা থাকবেই। সূর্যের রথের চাকা অসংখ্য। তবে সাতটি ঘোড়া টানে এই রথ। সাতরঙের রামধনু, সপ্তশক্তির পুঞ্জীভূত রূপ নিয়ে সূর্য অনন্ত শূন্যে যেন চলছেন, আর ছুটে চলছেন। এর সঙ্গে মানুষের জীবন চক্রের সাদৃশ্য আছে। অয়নবৃত্ত বছরে মানুষও জীবনের গাঁট বা পর্ব অতিক্রম করে। এই পর্বই পার্বণ। বার মাসে তের পার্বণ নারীর ঋতুচক্রে বিধৃত। একদিন আমরা নারীর জীবনচক্রে পুরুষের জীবনাশ্ব জুড়ে দিয়েছিলাম। সেই জীবনরথ দ্বৈত সত্তায় চলছে, চলবে কালে-কালান্তরে। সূর্য তাই জীবনসম্ভবা ঋতুরঙ্গের নটরাজ।

সূর্য একদিকে জীবনাচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, আবার অন্তদিকে শস্ত প্রজননকেও প্রভাবিত করেছে। প্রাচীনকালে পুরোহিতদের মধ্যে এমন এক ধারণা ছিল যে প্রভাতে নদীতে বা পুকুর ঘাটে সূর্য প্রণাম বা তর্পণ না করলে সূর্য উঠবে না। মেক্সিকোতে সূর্যকে জীবনের উৎস মনে করা হত। মানুষের জীবন রক্ষকও বলা হত। পৃথিবী সূর্যসনাথা। সূর্যের প্রখর তাপে বসুন্ধরা ফলবতী হয়। এদেশে সূর্যের উদ্দেশে বলি প্রথারও উৎপত্তি হয়। প্রতিবেশীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মেক্সিকোর আদিম জাতিরা নরবলির জন্ত লোক সংগ্রহ করত। ভারতের পূর্ব-প্রান্তের নাগা এবং মিজোদের মধ্যে অনুরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয়েরা গ্রীকদেশের লোকদের মত মনে করত সূর্য সাতঘোড়ার রথে চড়ে আকাশ পরিক্রমা করছে। ' এই বিশ্বাসে রেড্ ইণ্ডিয়ানরা সূর্যের উদ্দেশে রথ ও অশ্ব উৎসর্গ করত। স্পার্টান, পারসিয়ান ও আমাজেক্সিরা সূর্যের নিকট অশ্ব বলি দিত। যাদুবিদ্যার মাধ্যমে সূর্যের গতিরোধ করার কাহিনীও প্রচলিত আছে পেরুভিয়ানদের মধ্যে। বিন্ধ্যপর্বতের সূর্যের গতিরোধ করার কাহিনী ভারতবর্ষে সুপ্রচলিত। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা সূর্যের প্রতিনিধি হিসাবেও কারাও মন্দিরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতেন। তাদের ধারণা এতে সূর্যের দৈনন্দিন বা আহ্নিক গতি অপ্রতিহত থাকবে। ধরমদেবতা, ধর্মরাজ ও শিবের মন্দিরেও ভক্ত্যারা এভাবে আজও রাঢ় বাংলায় প্রদক্ষিণ করেন। দক্ষিণায়নের পর মিশরীয়েরা সূর্যের ভ্রমন যষ্টি নামে একটি উৎসব করত। বিষুব সংক্রান্তির পর দিন ছোট হত, সূর্যের আলো স্বল্পস্থায়ী হত। মিশরীয়েরা মনে করত সূর্য বৃদ্ধ হয়েছে, দুর্বল হয়েছে। অতএব পথ চলার জন্ত যষ্টির দরকার। বাংলাদেশে যখন দুর্গাপূজা হয়, তখন গুজরাত, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'নবরাত্রব্রত' উদ্‌যাপিত হয়। এদের বিশ্বাস নবরাতে নববর্ষের প্রথম সূর্যের উদয় হবে। এই নবরাত্র উৎসবে নারীরা 'গর্বা' নামে এক অনুষ্ঠান পালন করেন। চক্রাকারে নৃত্য-গীত সহযোগে একটি মাটির হাঁড়িতে প্রজ্বলিত প্রদীপসহ মহিলারা গর্বা করে থাকেন। এই উৎসব যেন সূর্যের দিন পরিক্রমা। প্রাণসঞ্জীবনী আলোর উৎসব গর্বা। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন : 'ধর্ম' শব্দটা অষ্ট্রিক ভাষাজাত। সংস্কৃত ধর্ম শব্দ বাংলায় বিশেষ করে ধর্ম শব্দের মৌলিক অর্থ ব্যাপ্তিতে গৃহীত হয়নি। ধর্ম শব্দের অর্থ হলো : যাহা ধারণ করে। বৌদ্ধদের ত্রিশরণ মন্ত্রে 'ধর্ম' শব্দটি লক্ষণীয়। অনেকে এই ভাষানুষঙ্গে লোকায়ত ধর্মকে বৌদ্ধদের ত্রিশরণ মন্ত্র 'ধম্মং শরণং গচ্ছামি'-এর সাদৃশ্যবাচক মনে করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন 'ধর্ম' ও বৌদ্ধ 'ধম্ম' এক এবং অভিন্ন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁদের মধ্যে

অন্যতম। কেউ কেউ ধর্মঠাকুরকে বাংলার জনপ্রিয় লৌকিক দেবতা শিবের সাদৃশ্যবাচক বলেছেন। এইভাবে ধর্মঠাকুর বা ধর্মপূজায় লৌকিক, বৈদিক, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, শৈব ধর্মচেতনার বহু বিক্ষিপ্ত উপকরণ মিশ্রিত হয়েছে।

সূর্য কিন্তু মহাকাশ এবং প্রকৃতিকে আশ্রয় করে আপন স্বরূপ প্রকাশ করেছে। আদিমস্তরে সূর্য, শিব, মিশরের 'আমেনরা', 'ওসিরিস' প্রভৃতি দেবতার প্রতীক ছিল লিঙ্গ বা যোনি।[১] প্রাগৈতিহাসিক কালেও মানবসমাজে লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল। মিশরের পিরামিড, শ্মশানের শিলাস্তম্ভকে (মেন্‌হির) অনেকে বলেছেন 'সমাধিশিলা সংস্কৃতি'। একখণ্ড লম্বা পাথরকে সোজাসুজিভাবে সমাধির ওপর স্থাপন করাকে বলে 'মেন্‌হির'। মাটি স্তূপাকার করে সমাধি রচনা বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে প্রচুর দেখা যায়। এমনকি নাগা, খাসিয়া, হো, মুণ্ডা, গদবা, শবর প্রভৃতি জাতীয় ভাষাগত সংখ্যালঘুগোষ্ঠীও মেন্‌হরি, 'ডলোমেন' জাতীয় শিলাস্তম্ভ বা সমাধিচিহ্ন স্থাপন করেন। খ্রীষ্টানদের মধ্যেও 'ক্রুশ' স্থাপন প্রথা প্রচলিত আছে। সমাধির ওপর বৃক্ষরোপন করাও হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি ধর্মীয় রীতি।

মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার প্রত্নশিল্পে ও স্থাপত্যে উপাসনার নিদর্শন মেলে। এখানেও শিবের লিঙ্গ প্রতীক উপাসিত হত। বাংলাদেশে শিবলিঙ্গ পূজার রীতি সুপ্রাচীন। শিব-ব্রতিনী মেয়েরা সাধারণত শিবের দ্বাদশ লিঙ্গমূর্তি উপাসনা করেন। শিবের এক নাম 'হাজরা'। কারণ তিনি হাজার[২] ভূতের অধিদেবতা। শিবের অনাদি লিঙ্গমূর্তির পূজার বিবরণ লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতিতে লিখিত আছে। নবপত্রিকা পূজায় দেখেছি বিল্ব (Aegle marmelos) বৃক্ষে শিবের অধিষ্ঠান। বৃক্ষের সঙ্গে শিবের একাত্মকরণ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ঘটনা। উইলিয়াম ফ্রেজার বলেন : 'সংস্কৃতির প্রকর্ষিত উন্নত পর্যায়ে এই সমীকরণ সম্ভব।' প্রাগৈতিহাসিক লিঙ্গমূর্তি কালক্রমে মানুষীরূপ লাভ করে পৌরাণিকত্ব অর্জন করেছে ভারতে। হিন্দুধর্মের বাইরে যে দেবতারা বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছেন, মন্দির-দেউলের বাইরে সমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে পূজা পেয়ে আসছেন তাঁদের বলা হয় 'গ্রাম্যদেবতা'। গ্রাম্যদেবতারা গাছ, পাথর, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীকে ভিত্তি করে বিকাশ লাভ করে থাকে। আদিম ধর্ম-বিশ্বাসের ক্রমবিবর্তনের ফলশ্রুতি আজকের

১. Phallic Worship/p 22—23/George Ryley Scott.

২. হাজার গ্রামের মণ্ডল; অধিনায়ক; প্রধান; চড়ক পর্বের সময়ে হাজার পূজা হয়। শ্মশানের নিকট বা নির্জন স্থান ইঁহার প্রিয় স্থান। জিউলি বা জিওল গাছ ইঁহার প্রিয় অধিষ্ঠান বৃক্ষ। গভীর রাত্রি ইঁহার পূজার সময়। —বঙ্গীয় শব্দকোষ/২য় খণ্ড

অসংখ্য মূর্তি ও দেবতা। গ্রাম্যদেবতা 'ভৈরো' যেমন ভৈরবে পরিণত হলেন, ঠিক তেমনি শিব একদিন মহাদেব রূপান্তরিত হলেন।[১] ব্রহ্মা হয়ত হয়েছেন 'বড়াম'। একমাত্র ভারতবর্ষেই, ভারতীয় উন্নত মানসিকতার আলোকে একেশ্বর শিব বহু শিবে পরিণত হয়েছেন। এর অন্যতম কারণ প্রকর্ষিত সংস্কৃতির সঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতির অবাধ এবং অনাবিল মিলন-মিশ্রণ। বৈদিক আর্যরা মূলত মূর্তিপূজক ছিলেন না। অনুব্রত বা আর্যেতর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফলে ভারতীয় হিন্দু সমাজে মূর্তিপূজা প্রবেশ করে। মূর্তি সেকালে প্রধানত মৃন্ময় ছিল। কালক্রমে অঞ্চল বিশেষে দারু বা প্রস্তরে নির্মিত হতে লাগলো। শিবের প্রতীক যে লিঙ্গপূজা সারা ভারতবর্ষে একদিন প্রচলিত ছিল কালক্রমে বেদের রুদ্র দেবতা কোন প্রজনন-মানসিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে শিশ্নদেবতা রূপে বিকাশ লাভ করে। বাংলা-দেশের রাঢ় অঞ্চলে শিবপূজা অতি প্রাচীন। প্রাক্ পৌরাণিক যুগে শিব আদি পিতা জগৎস্রষ্টারূপে পরিচিত ছিলেন। লিঙ্গ আদিম উপাসনার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসেবে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ফলে শিব ও লিঙ্গ সমভাবানুষঙ্গে এক হয়ে গেল। ঋগ্বেদে 'শিশ্ন' ও 'শিশ্নদেব' শব্দের উল্লেখ আছে। শিশ্ন শব্দটি লিঙ্গবাচক। এঁদের সঙ্গে আদিম মেন্‌হির বা শিলাস্তম্ভ পূজার মিল রয়েছে। মনে হয় এই ত্রিধারা সমন্বিত হয়ে লিঙ্গ দেবতার পূর্ণাবয়ব প্রতীকতা শিবলিঙ্গে সমাহৃত হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় সূর্য। সূর্য কিভাবে ধর্ম ও শিবের সঙ্গে একাত্ম হলো বিচার করে দেখা যাক। এই বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন: 'ধর্ম দেবতার উৎপত্তি বহুমুখ।' এই বহুমুখী ধর্মদেবতার রূপ তিনি দেখেছেন, সূর্যদেবতায়, যমরাজে, বরুণে, কূর্মদেবতায়, শূন্যমূর্তি নিরঞ্জনে, অশ্বারোহী যোদ্ধা দেবতায়, গোরূপদেবতায়, শ্বেতপক্ষীতে। এই অষ্টম দেবতারূপী ধর্ম তাহলে এক বিচিত্র ভাব-কল্পনার সংমিশ্রণের ফলশ্রুতি। এই সংমিশ্রণ বহু যুগের লোক-সংস্কৃতি-রসে পুষ্ট। কোন এক যুগের সৃষ্ট নয়।' পূর্বেই বলেছি ভারতীয় ধর্ম মানসিকতার চরিত্র হচ্ছে এককে বহুতে বিভাজন করা। ধর্মঠাকুরের বেলায়ও তাই। ধর্মরাজের আনুষ্ঠানিক আচার-পদ্ধতি অনুসন্ধান করে গবেষকেরা ধর্মের সঙ্গে সূর্যের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা বলেন, 'সূর্যদেবই ধর্মরাজের নামান্তর।' কারণ সূর্যদেবের উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সেকালে ধর্মপূজায় শ্বেতপশু বলি ও শ্বেতপুষ্প অর্ঘ্য দেওয়া হত। তা ছাড়া ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে ধর্মরাজের যে অপরিমেয় শক্তি বাংলার লোকায়ত সমাজ কল্পনা করে,

---

১. Man in India/Vol: III: 1923/p. 56

তা সূর্যের অনুরূপ প্রজনন শক্তির সমান্তরাল। এক প্রাচীন সৃষ্টি-ধর্মবিশ্বাস সূর্য ও ধর্মরাজকে কৃষি ও প্রজননের দেবতারূপে সমাজ কল্পনা করেছে। সুতরাং উভয়ের অন্তর্নিহিত শক্তি এক এবং অভিন্ন। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে' ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'ধর্মরাজ' শব্দটির উৎস নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন : "পশ্চিম বাংলায় বিশেষতঃ রাঢ়অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের যে স্থানীয় নাম ব্যবহৃত হয়, তাতে সর্বদাই 'ধর্ম' কথাটি যুক্ত হইয়া থাকে।···প্রধানত, ডোমদিগের পূজিত দেবতা বলিয়া রাঢ় অঞ্চলে নবাগত বৌদ্ধ ও হিন্দু বসতি স্থাপনাকারিগণ বোধহয় এই দেবতাকে ডোমরায় বলিয়াই উল্লেখ করিত। ডোমরায় হিন্দু প্রভাবের যুগে ধ্বনিতত্ত্বের সাধারণ নিয়মানুসারেই ধর্ম কথাটিতে এইভাবে প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে, যেমন, ডোমরায়>ডোমরা>ডোরমা>ধর্ম।" রাঢ়দেশে ডোমরা সুসংহত সমাজবদ্ধ হয়ে যে বসবাস করত একথা ঐতিহাসিক সত্য। ধর্মমঙ্গলে কালুডোম এবং ছড়ার 'আগডোম্ বাগডোম্ ঘোড়াডোম্' ইত্যাদি বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বাংলার রাঢ় প্রত্যন্ত লালমাটির বুকে ডোমজাতির পরাক্রম এবং প্রতিপত্তির কথা স্বীকার করে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল। এমনকি দশম—দ্বাদশ শতকের চর্যাপদে কাহ্নুপাদের একটি চর্যায় ডোম-ডোমনীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন 'নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহেরি কুড়িয়া' ইত্যাদি। এই তথ্যগুলি এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সীমায় ডোমরা সংহতভাবে অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাস করছেন। তাদের ঐতিহাসিক অস্তিত্বে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কিন্তু ডোমরায় থেকে যদি ধর্ম শব্দ সৃষ্টি হয়, তবে সূর্যের অন্যনাম 'রাই' বা 'রায়্' শব্দটিও রাজ বা রায় শব্দ সম্পৃক্ত। কারণ ভারতীয় সূর্য ইজিপ্টে 'রা' অথবা 'রাআ', মেক্সিকোতে 'রায়মী', বাংলায় 'রাই বা রাঈ'।[১] এই রাই শব্দটি বাংলাদেশের লৌকিক দেবদেবীর নামান্তে যুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থবান্ হয়ে উঠেছে। কেননা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্তে প্রচলিত ধর্মঠাকুরের নামগুলি একবার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'রায়ান্ত' শব্দই বেশি দেখা যায়। যেমন, দক্ষিণবঙ্গে কালুরায় ঝাড়গ্রামে শ্যামরায়, বন্দিপুরে বাঁকুড়ারায়, ইন্দাসগ্রামে, রুন্টকরায়, খুদিরায়, মোহনরায়, বড়ুজাগ্রামে জগৎরায়, দেপুরে দলুরায়, ধর্মরায়, বাঁকুড়াজেলায় অচলরায়, মেমারিতে ক্ষুদিরায়, বোড়ালে বুড়ারায়, কৌতুকরায়, যাত্রাসিদ্ধিরায়। এই হলো রায়ান্ত ধর্মরাজ-নাম। অনেকে মনে করেন, রায় শব্দটি রাজ শব্দজাত।

১ বাংলার ব্রত/পৃঃ ১৫/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেমন রাজা>রায়া>রাআ>রায়। সম্ভবত বাংলাদেশের সামন্ত রাজগণের রায় উপাধি পরবর্তীকালে ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। বাংলাদেশে আকবরের আমলে বারজন সামন্তরাজ ছিলেন। তাঁদের বলা হত 'বারভূঞা'। যশোরের প্রতাপাদিত্য রায়ের প্রতাপ দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রায়, রায়চৌধুরী ইত্যাদি রাজ মাহাত্ম্যসূচক সামন্ত পদবী বাংলাদেশের জমিদারেরা প্রায়ই নামের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। সমগ্র বাংলাদেশে তার প্রচুর নিদর্শন মেলে। মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে রায়ান্ত ধর্মঠাকুরের বেশ কয়েকটা নাম আছে। আদিবাসীদের সমাজে ধর্মবাচক কয়েকটি শব্দ প্রচলিত আছে। যেমন ধরম, দেরাম, ধর্মেনা ও ধর্মেশ প্রভৃতি। ছোটনাগপুর এবং সুন্দরবনের ওরাওঁদের মধ্যে ধর্মেশ, ধরম ও স্বরযদেওতা প্রধান উপাস্য দেবতা বলে গণ্য হয়। রাঢ় অঞ্চলের ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ওরাওঁ ধরম দেওতার পূজার আচারবিধির সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন: "Among the oraons of Chota-Nagpur, Dharmesh is regarded as the white coloured supreme deity, and is also generally offered sacrifices of white coloured animals."[১]

রাঢ় অঞ্চলের ধর্মঠাকুরের পূজায়ও শ্বেত পশুপক্ষী বলি দেওয়ার রীতি আছে এবং ডোমেরা মনে করেন ধর্ম শুভ্র। হিন্দুদের সূর্য ও শিব শুভ্র। অধিকন্তু বৌদ্ধদের জাঙ্গুলী, মহাসরস্বতী, বসন্ত, সূর্যহন্তা প্রভৃতি দেবদেবী শুভ্রবর্ণের।[২] নামগত দিক থেকে অর্থাৎ রায়ান্ত নামের দিক থেকে দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণরায়ের সঙ্গে ধর্মের একটা সাদৃশ্য রয়ে গেছে। রায় শব্দ যদি রাজ শব্দ আগত হয়, তবে দক্ষিণরায় দক্ষিণের রাজা এই ধারণা আমাদের কাছে অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দক্ষিণরায় এবং ধর্মরাজ ধর্মরায় উভয়ের পূজাতেই বলি দেওয়ার প্রথা ছিল। এই বলির আদিম সংস্কার হলো ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করানো এবং গ্রামদেবতারা তুষ্ট হলেই শস্য ফলন ও প্রজনন অধিকতর হবে, এটাই সাধারণ বিশ্বাস। ধর্মরাজ ভূমির প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং নারীর বন্ধ্যাত্ব দূর করেন এটাই পূজারীদের বিশ্বাস। দক্ষিণরায় প্রসঙ্গেও অনুরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে উনি ভূমির প্রজনন শক্তি বাড়ান এবং মৎস্যজীবী ও কাঠুরিয়াদের বাঘ, কুমীরের হাত থেকে বাঁচান। সংস্কারগত ভাবানুষঙ্গে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও রয়েছে। উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে সোনারায় নামে অন্য একজন দেবতা আছেন, যাকে

---

১ The Oraons of Sunderban/p. 245/Amalkumar Das & ManisKumar Raha.

২ বৌদ্ধদের দেবদেবী: বিনয়তোষ ভট্টাচার্য

'বাঘের দেবতা' বলা হয়েছে সোনারায়ের গীতে। এককালে বাংলাদেশে ধর্মদেবতা সর্বব্যাপক ছিল। এই সার্বজনীনতার জন্য কালক্রমে এই দেবতা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং সংস্কৃতির সংশ্লেষণ ধর্মানুসারে লোকায়ত সমাজে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি লৌকিক দেবতা যেমন কালুরায় ও বড়খাঁ গাজী, নারায়ণী, বনবিবি, দক্ষিণরায়ের কাহিনী ও কিম্বদন্তির সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন। মুন্সী বয়নুউদ্দীন সাহেবের 'বনবিবির জহুরানামা' এবং কবি কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গলকাব্যে' এই লৌকিক দেবতাগুলির মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এই দেবতারা সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের পর হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ী সংস্কৃতির প্লাবনে লোকসমাজে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে থাকবেন। কিন্তু ধর্মঠাকুরের শিলামূর্তি পূজা অতি প্রাচীন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সমাধিশিলা সংস্কৃতির সঙ্গে শিলাপূজার সাদৃশ্য উপেক্ষণীয় নয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস ছিল তরল ভোগবিলাসেমোহান্ধ এক অধ্যায়। তখন আখড়াই, খেউর, যাত্রা, সঙ্, খেমটা, লেটো ইত্যাদির সঙ্গে চড়ক, গাজন ও অন্যান্য পূজাপাবণ যুক্ত ছিল। এমন কি সেকালের কোলকাতার চিৎপুর, চড়কডাঙ্গা এবং ধর্মতলায় রীতিমত গাজনোৎসব উপলক্ষে চড়কমেলা বসত। সমকালীন সমাজচিত্র লেখকরা তাঁদের রচনায় সেকালের ভোগবিলাসের এবং সঙ্, যাত্রার চিত্র নিপুণভাবে এঁকে রেখেছেন।[১] লোকজনপ্রিয়তার জন্য ধর্মপূজা, চড়ক, গাজন ইত্যাদি অনুষ্ঠান কোলকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, উত্তরবঙ্গের মালদহ, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃতিলাভ করেছিল। আজও তাদের শেষ নিদর্শনগুলি অনুসন্ধিৎসুদের কৌতূহলী দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

ধর্মঠাকুরের স্বরূপ নিয়ে বাংলাদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে এক জটিল বিতর্কেরও সূচনা হয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেছেন: 'ধর্মের কূর্মরূপ আর কিছুই নয় বৌদ্ধস্তূপের পরিবর্তিত রূপ।'[২] কিন্তু আমরা জানি, স্তূপ পূজা অতি প্রাচীন। মিশরে পিরামিড, ইউরোপে মেনহির, শিলাস্তম্ভাচার, ভারতে সমাধি শিলা বা স্তূপাচার ইত্যাদি অতি প্রাচীন সংস্কার। বৌদ্ধদের আচরণীয় স্তূপাকারের পূর্বেই এই শিলাস্তম্ভাচার ভারতে প্রচলিত ছিল দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর জনসাধারণের মধ্যে। কাজেই পরবর্তীকালের বৌদ্ধ ধর্মাচারের সঙ্গে এর মিশ্রণ সম্ভব।

১ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'সেকাল ও একাল'
২ বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কূর্ম বা কচ্ছপ ভারতবর্ষের আদিবাসীদের টোটেম বা কৌলচিহ্নরূপে একদা সমাদৃত ছিল। তারতে অনেকে কচ্ছপ এখনও ভক্ষণ করেন না। সুতরাং সামাজিক এবং ধর্মীয় বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে কচ্ছপে। এমন অনেক সংস্কার আদিম ও লোকায়ত পর্যায়ে রয়েছে যাকে অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। মাদ্রাজে তামিলদের মধ্যে গোখুরা সাপ মারা নিষিদ্ধ। যদি কেউ মারে, তবে তিন দিনের জন্য সে অপবিত্র হয়। মানুষের মত সাপটিকে পোড়ানো হয়। বাংলাদেশেও এই রীতি প্রচলিত আছে। বিড়াল মারলে প্রায়শ্চিত্ত করার এক রীতি বাঙালীদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। আদিম মানবসমাজের আত্মায় বিশ্বাসের ফলে এই রীতিগুলি পরবর্তীকালে স্মৃতিবাহিত হয়ে আজও সমানে চলে আসছে। প্রাচীন ধারণায় আত্মা দেহান্তরে ঘুরে বেড়ায়। আত্মাকে পাখিরূপে কল্পনার পেছনে প্রাচীন আত্মার ভ্রমণচারিতাধারণা কাজ করেছে। অনেক আদিমজাতি বিশ্বাস করে মানুষ ঘুমালে তার আত্মা ঘুরে বেড়ায়। সর্ববস্তুতে প্রাণারোপের ফলে আত্মাসম্বন্ধীয় বিশ্বাস বিশ্বব্যাপ্ত হয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানের 'matter in motion' তত্ত্বও এখানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

ধর্মের 'মূর্তি' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে বিনয় ঘোষ বলেছেন : ধর্মের কূর্মমূর্তিই আসল, বাকি সব আসল মূর্তির অভাবে বিকল্প প্রতীক মূর্তি মাত্র। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পক্ষান্তরে মনে করেন : শিলাপূজায় ধর্ম এবং শিব কালক্রমে বিবর্তিত হয়েছে। শৈব এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে শিলার সঙ্গে শিব ও ধর্ম যুক্ত হয়েছে। ডঃ ভট্টাচার্য আবার 'বাংলার লোকশ্রুতি' গ্রন্থে বলেছেন : পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুর আদিম সমাজের সূর্যদেবতা ব্যতীত কেহই নহেন।' এই মন্তব্যের পক্ষে তিনি বলেছেন : 'হিন্দুপ্রভাব বশতঃ আদিবাসীর কৃষিসহায়ক সূর্যদেবতা প্রথমতঃ ধর্মঠাকুর এবং পরে শিবঠাকুর রূপে পরিবর্তিত হইয়াছেন। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের কোন কোনও লৌকিক শিবমন্দিরে আদিম সূর্য উপাসনারই কতকগুলি আচার পালন করা হইয়া থাকে। শালেভর, কাঁটাঝাঁপ, বাণফোঁড়া ও চড়ক তাহাদের অন্যতম।'[১] ধর্ম ঠাকুর ও সূর্যের একীকরণ আমরা দেখতে পেয়েছি ছোটনাগপুর এবং সুন্দরবনের ওরাওঁদের ধর্মেশ এবং সূর্যঠাকুরের মধ্যে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে সূর্য, ধর্ম এবং শিব এই তিন দেবতার উদ্দেশে নরবলি

১ In Western Bengal Stones besmeared by the worshipping devotees with vermillion, lying beneath some venerable banian tree, are a common sight. This is certainly a remnant of the worship of fetish stone of pre-historic society. The Early Bengali Saiva Poetry/p. 21-22

প্রথা একদিন এদেশে প্রচলিত ছিল ; সেই বলি বা রক্তউৎসর্গ প্রথা কালক্রমে পশুবলির মধ্যে আত্মগোপন করে আমাদের সমাজে বেঁচে রয়েছে। নৃতাত্ত্বিক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন : 'এই পশুবলি প্রথা প্রাচীনকালের নরবলি প্রথারই স্মৃতিবহ। কৃষিভিত্তিক সমাজে এই রক্ত উৎসর্জন প্রথা বেঁচে থাকা খুবই স্বাভাবিক। ভূমির উর্বরতা শক্তির সঙ্গে রক্ত উৎসর্জন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।' ধর্মঠাকুরের মূর্তি শিলা থেকে কূর্মাকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ শিলাপূজা আদিম। প্রাগৈতিহাসিক কাল পর্যন্ত এর সীমা প্রসারিত। অন্যপক্ষে, শিলা, কূর্ম কল্পনার মধ্যে পৌরাণিক ভাবানুষঙ্গ জড়িয়ে রয়েছে। কূর্ম যেহেতু বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার, সেহেতু হিন্দুর অবতারবাদের সঙ্গে ধর্মশিলার সমীকরণ হিন্দুমানসিকতায় অস্বাভাবিক নয়। এই বিবর্তনে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক উপকরণ এবং ধর্মীয় আচারগুলি অত্যন্ত অনমনীয়। সহজেই রূপান্তরিত হয়না। অনেকে ধর্মঠাকুরকে বরুণ দেবতা বলেন। বৌদ্ধ 'নিষ্পন্নযোগাবলী'তে যে অষ্টদিক্‌পাল দেবতা আছেন বরুণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমদিকের অধিপতি বরুণ শুভ্রবর্ণ একমুখ এবং দ্বিভূজ। এঁর বাহন মকর বা কুমীর। ইনি একহাতে সর্প নির্মিত পাশ বা নাগপাশ এবং আর অন্যহাতে শঙ্খ ধারণ করেন।[১] এই বর্ণনা থেকে জানা গেল যে বরুণের বাহন মকর, হস্তায়ুধ সাপ এবং শঙ্খ। ধর্ম-সূর্য-শিব এদের সঙ্গে একমাত্র বর্ণ ছাড়া অন্য কোন দিক থেকে বরুণের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত। একমাত্র সর্প সম্পর্কিত এক আদিম বিশ্বাস এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। কিন্তু বাহনের দিক থেকে এই দেবতার থেকে বরুণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব ধর্মঠাকুর যে বরুণ নন, এতে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মঠাকুরকে শূন্যও মনে করেন অনেকে। তবে ধর্মশিলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোলাকার। গোলাকৃতি স্বভাবতই শূন্যাত্মক ব্রহ্মাণ্ডদ্যোতক। শূন্য আবার নিরাকার।[২] অতএব ধর্ম ও ব্রহ্ম নিরাকার শূন্য। তত্ত্ব ও দর্শনের দিক থেকে এই সিদ্ধান্ত যত সত্য, প্রকৃত বিবর্তন অর্থে ততটা সার্থক মূল্যবহ সিদ্ধান্ত নয়।

---

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী : পৃ: ১১৩/বিনয়তোষ ভট্টাচার্য

২ Dharma has sometimes been described as the sun, and there is a twofold reason behind it. In the first place Dharma is luminous by nature and so is the Sun and hence the identity. Secondly, Dharma is Sunya and Sunya is of the shape of a Zero and, therefore, Dharma is of the shape of of a Zero ; and as the Sun is also of the shape of a Zero, Dharma moves in the void, and void is the sky, and the Sun moves in the sky and hence the Sun is Dharma.—Obscure Religious Cults/p.291/Dr ShasiBhusan Dasgupta.

শূন্য প্রতীতি লোকায়ত মানসে সম্ভব নয়। পৃথিবীর তাবৎ লোকায়ত ধর্মই একথা প্রমাণ করে। সংখ্যার দিক থেকে প্রথমে মানুষ এক থেকে নয় পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। ধর্মঠাকুর অনার্য দেবতা। ওরাওঁদের গ্রামদেবী চাণ্ডী যেমন শিলায় উপাসীতা হন, ধর্মঠাকুরও তেমনি একজন গ্রাম্য দেবতা যিনি শিলায় উপাস্য। এই মূলসত্যকে আশ্রয় করেই ধর্মের বা ধর্মেশের বিবর্তন ঘটেছে বাংলার লোকায়ত সমাজে। ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতি এবং উৎসবের সামগ্রিক প্রকরণ বিচার করলে এই দেবতার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান গ্রামদেবতা ধর্মঠাকুরের পূজা পার্বণের তথ্যগুলো বিচার করা যাক।

লোকবিশ্রুত বাংলার গ্রামদেব-দেবীদের অন্যতম ধর্মঠাকুর মূলত থানাশ্রয়ী দেবতা। গ্রামান্তের বৃক্ষতলে তাঁর ঠাঁই। এটা শুধু বাংলাদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য বলা চলে। দক্ষিণ ভারতে বাংলাদেশের অনুরূপ লৌকিক দেবতার সন্ধান মেলে। বাংলাদেশে বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজা দ্বিবিধ উপায়ে পালন করা হয়। প্রথমত, নিত্যপূজা। দ্বিতীয়ত, বার্ষিক উৎসব। অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতাদের বেলায়ও এই নিয়ম। যেমন শিব, সূর্য, শীতলা ইত্যাদি।

ধর্মমঙ্গল যদি রাঢ়ের জাতীয়কাব্য হয়, তবে ধর্মঠাকুর রাঢ়ের জাতীয়ঠাকুর বা দেবতা। এই দেবতার উৎসবে রাঢ়ের জাতীয় মানস প্রতিফলিত হয়। রাঢ়াঞ্চলে (বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে) ধর্মরাজের বার্ষিক উৎসব হয় চৈত্রসংক্রান্তিতে। প্রায় তিনদিন ধরে চলে উৎসবের ঘটা। কোন কোন অঞ্চলে (হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, (দক্ষিণবঙ্গে) বাঁকুড়ায়) চৈত্রসংক্রান্তি থেকে শ্রাবণ সংক্রান্তি পর্যন্ত এই উৎসব হয়। তবে চৈত্র-বৈশাখেই ধর্মের প্রশস্ত উৎসবকাল। চৈত্রসন্ধ্যায় গাজনের ঢাক রাঢ়ভূমির রক্তরাঙ্গা মৃত্তিকায় এক উন্মাদনা জাগায়। উৎসবের হাওয়া গ্রামে গ্রামান্তে খুশির দোলা এনে দেয়। ভক্ত্যা সন্ন্যাসীর রুদ্রকণ্ঠে নিষ্ঠা ও সংযমের রুদ্রাক্ষ; 'বাবা ভোলানাথ' রবে মুখর হয়ে উঠে গাজনতলা, শিবতলা, ঠাকুরতলা, নদীরঘাট ও পুকুরঘাট। ঝড়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন থমথমে হয়ে উঠে, তেমনি ধর্মোৎসবের পূর্বে রাঢ়াঞ্চল যেন ধর্মের ধ্যানমন্ত্র জপ করেন ধর্মের পূজারীরা বিশেষত হাঁড়ি, ডোম, বাউড়ী, বাগ্‌দী, ধীবর, তাঁতি, মালি প্রভৃতি গোষ্ঠী। এটা অব্রাহ্মণ্য, অশাস্ত্রীয় অনুব্রত উৎসব। কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পূজার আচারবিধিও তাই সেইসব অঞ্চলে কতকটা পরিবর্তিত। ধর্মপূজার প্রধান পূজারীদের বলে সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস বা সৎ-ন্যাসই তাদের প্রধান কর্তব্য। ভারতীয় ধর্মাচরণে আত্মসংযম বড়

কথা। শুধুমাত্র উচ্চতর সমাজে এটা সীমাবদ্ধ নয়, বরং আদিবাসী কৌম সমাজ পর্যন্ত প্রসারিত। প্রত্যেক ধর্মাচরণ এবং ব্রতপার্বণের পেছনে পূজারীর বাসনালোক সক্রিয় থাকে। ব্রাহ্মণ্য মতে হিন্দুরা যেমন প্রার্থনা করেন: 'রূপং দেহি, যশং দেহি, ধনং দেহি', তেমনি অন্ত্যজেরা বলে: শস্য দাও, সন্তান দাও, বৃষ্টি দাও, রোগ-শোক পরিহার কর, কর্ম করার শক্তি দাও। মূলত উভয়ের প্রার্থনাই এক।

ধর্মের পূজারীকে 'দেয়াশী' বলা হয়। দেয়াশী শব্দটা দেববংশী জাত। দেবতার পূজারীই দেয়াশী। ডোম বা কলু, মাল গোষ্ঠীর লোকেরাই সাধারণত দেয়াশী হয়। বৈশাখী পূর্ণিমাতে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয় বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। বার্ষিক উৎসবের প্রায় ন-দশদিন পূর্ব থেকেই ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসী সঙ্কল্প করে। ধর্মের দেয়াশীর কাছে তাদের বাসনা জ্ঞাপন করে। দেয়াশী তাদের অর্থাৎ ভক্ত্যাদের একগাছি করে সূত্র-উত্তরীয় দেন। এই উত্তরীয় গলায় ধারণ করতে হয়। বাঁকুড়া অঞ্চলে ডোম পণ্ডিতেরা তাম্রধারণও করেন। একে তাম্রশুদ্ধিও বলে। আদিবাসীদের হাতে, মুখে কতগুলি পোড়া দাগ থাকে। এই দাগগুলি যৌবনকালেই দেওয়া হয়। এগুলি এদের গোষ্ঠীচিহ্ন। ডোমজাতীয় পণ্ডিতেরা যে তাম্রধারণ করেন, তা কতকটা গোষ্ঠীচিহ্নস্বরূপ। রাঢ়ের ধর্ম বা তারকেশ্বরের শিবপূজায় এক সার্বজনীন ভাব আছে। কারণ যে কোন জাতের লোক এদের পূজায় সন্ন্যাসী হতে পারে, মানত করতে পারে, ভক্ত্যা হতে পারে। ভক্ত্যাদের হবিষ্যকরণ এক অনমণীয় বিধান। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ধর্মরাজের থানে বা মন্দিরে দলে দলে নরনারী বিশেষত: বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ায় ছোট ছোট ঘোড়ার সুন্দর মাটির পুতুল মানত দেন। প্রদীপ দেওয়ার রীতিও প্রচলিত আছে। তাছাড়া শিলাখণ্ডে সিঁদুর লেপন করাররীতিও প্রচলিত আছে। সিঁদুরের রক্তিমবর্ণ এবং প্রদীপালোক গুজরাটের গর্বাপরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানেও যেন সূর্যকে আরতি করছে সেকালের অনুষঙ্গে একালের মানুষ। আলোই জীবন। সুতরাং মানব সভ্যতার ইতিহাসই হলো আগুনের অন্বেষা, আলোর তপস্যা। ধর্মরাজ, শিবসূর্য আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির অশ্বকে আলোক তীর্থের দিকে যেন টেনে নিয়ে চলেছে। এই দার্শনিক সত্যে ধর্মোৎসব যেন সমুজ্জ্বল। ঋতুচক্র যেমন ঘোরে, তেমনি মানুষের জীবনের চাকাও ঘোরে। সূর্য ঘোরে, রথ চলে, মানুষ এগিয়ে যায় কালের সোপানে। কোণারকের সূর্যচক্র এই কথাই প্রমাণ করে। কাজেই সূর্য জীবনসত্তাঅবিনয়, অনাদি শক্তির উৎস।

ধর্মঠাকুরের বার্ষিক উৎসব আরম্ভের পূর্বে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান পালন করতে

হয়। যেমন, লাপড়াভাঙ্গা, স্নানোৎসব, জলভরা, ফুলখেলা,লোটন, ফুলচাপা, চড়ক, ধর্মযজ্ঞ, দধিভরা, আগুন ঝাঁপ, চাঁড়াল খেলা, ভোগ, গাজন, সঙ, বোলান ইত্যাদি। চড়ক জীবনচক্রের প্রতীক। আদিম সূর্যপূজার সর্বশেষ চিহ্ন চড়ক। চক্র শব্দ থেকে এসেছে চড়ক। যেমন চক্র>চকর>বর্ণবিপর্যয়ে চড়ক। অতএব সূর্যচক্র জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। চক্রাকারে শূন্যে ঘোরাই চড়কের লীলা। জীবন এখানে সূর্যময়। ভক্ত্যার দৈহিক কৃচ্ছসাধনার চরম পরাকাষ্ঠা চড়কে ঘোরা। পিঠবান্ চড়কে ঘুরতে পারলে ধর্মঠাকুর প্রসন্ন হবেন। সারা বছরের জীবনচক্র সফল হবে। কর্মই জীবন। তাই কর্মে সাফল্য প্রার্থনায় বাণফোড়া। এটা ভারতীয় আদিম 'আকু পাংচার'। এটাই ভক্ত্যাদের বিশ্বাস। এবার ধর্মপূজার প্রধান প্রধান অনুষ্ঠানগুলি আলোচনা করা যাক :

১. লাপড়াভাঙ্গা :

রাঢ় এবং পুরুলিয়া ও বিহার সীমানার সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে ধর্মপূজার বার্ষিক উৎসব প্রারম্ভের পূর্বদিন পূজামন্দির প্রাঙ্গনে ভক্ত্যারা কন্টিকারি বা বঁইচি গাছের সকন্টক ডাল সংগ্রহ করে স্তূপীকৃত করেন। তারপর ঢাকের তালে তালে ভক্ত্যারা সকন্টক ডালসহ নাচতে থাকে এবং পরস্পর পরস্পরকে ডাল দিয়ে আঘাত করতে থাকে। উদ্দাম নৃত্যের তালে তালে চলে এই খেলা। কাঁটার আঘাতে ভক্ত্যাদের দেহ থেকে নির্গত হতে থাকে রক্তধারা। ভক্ত্যাদের এই দৈহিক যন্ত্রণা যেন তাদের অঙ্গভূষণ। এই কৃচ্ছসাধনার মাধ্যমে যেন তাদের পরম সিদ্ধিলাভ। কোন কোন অঞ্চলে স্তূপীকৃত কাঁটার ডালপালার উপর ভক্ত্যারা নগ্নদেহে ঝাঁপ দেন এবং বেশ কয়েকবার ঐ কাঁটার উপর গড়াগড়ি দেন। ধর্মের নামে জয়ধ্বনি দেন ভক্ত্যারা। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের আকাশভেদী ধ্বনি উৎসব প্রাঙ্গন মুখর করে তোলে। আত্মশুদ্ধির এই প্রক্রিয়া আদিবাসীদের মধ্যেও রয়েছে। সাঁওতাল, ওরাওঁরা তাদের ধর্মাচার তপ্ত লৌহশলাকা নিয়ে দেহাংশ দগ্ধ করে। এর সঙ্গে আত্মপরিশোধনের এক প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে। পরবর্তীকালে প্রকর্ষিত ধর্মসাধনায় এই কঠিন প্রণালী কিছুটা বিবর্তিত হয়ে সহজতর, সরলতর রূপ ধারণ করেছে। এই অনুষ্ঠানকে 'কাঁটাঝাঁপ' বলে। উত্তরবঙ্গেও 'কাঁটাঝাপ' অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। বাংলাদেশের ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। এই অনুষ্ঠানের রাঢ়ীয় নাম 'লাপড়াভাঙ্গা'। 'লাপড়া' শব্দের অর্থ কাঁটা। অন্য একটি অর্থ হলো প্রহেলিকা। লম্ফ বা লাপ্ দেওয়া অর্থেও লাপড়া শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে। কাঁটাঝাঁপ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে তাকেও বলে লাপড়াভাঙ্গা।

২. ধর্মশিলার স্নানোৎসব :

শিলা পূজার রীতি অতি প্রাচীন। আদিম মানবগোষ্ঠী শিলা উপাসনা করত। শিলার সঙ্গে লিঙ্গ ও যোনির প্রতীকীধর্মের এক গভীর সম্পর্ক আছে। সমাধি-শিলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর প্রমাণ পেয়েছি। ছোটনাগপুরের ওরাওঁরা চাণ্ডীনামক শিলা দেবার পূজা করেন। এমনকি বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তে পরিক্রমাকালে দেখেছি 'গেরাম থানে' অর্থাৎ শাল বা বটবৃক্ষতলে ছোট ছোট অসংখ্য নুড়ি বা শিলা স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে এবং সিঁদুর লিপ্ত করে ঐ শিলা পূজা করা হয়। এই শিলা বিভিন্ন গ্রামদেবতার নামের প্রতীক দ্যোতিত করে। বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শিলার এক সম্ভ্রমপূর্ণ আসন রয়েছে! বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানে এই শিলারূপী দেব-দেবীর স্নানোৎসব হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে চৈত্রমাসে নারায়ণ শিলাকে প্রায় একমাস কাল তুলসীতলায় জল-ঝারার নীচে রাখা হয়। এবং ঐ ঝারার বিন্দু বিন্দু জলধারা নারায়ণ শিলাকে জল সিক্ত করে। এইভাবে গ্রীষ্মের খরতাপে দেবতাকে শান্ত করা হত। পক্ষান্তরে, তাপমগ্না বসুন্ধরার তৃষ্ণা নিবারণ করা হত। প্রাচীন মানুষ সমাজে অনাবৃষ্টির হাত থেকে বসুন্ধরাকে রক্ষা করার জন্য বর্ষাবন্দনা বা বর্ষামঙ্গল করত। নৃত্যগীত এবং যাদুনৃত্য প্রভৃতি বৃষ্টি আনয়ন প্রথার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান করা হত। উত্তরভারতে এবং পূর্বভারতের আদিম অধিবাসীরা আজও স্পর্শমূলক যাদুবিদ্যার মাধ্যমে বৃষ্টি আনয়ন করার চেষ্টা করেন। সূর্য পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক। এই আদিম বিশ্বাস মানুষকে সূর্যবন্দনায় প্রনোদিত করেছে। যেহেতু ধর্ম, সূর্য আদিম সমাজে ভাবানুষঙ্গে সমার্থক। সেহেতু ধর্ম-শিলার সূর্যপ্রতীক স্নানোৎসব চৈত্র-বৈশাখ মাসে অপরিহার্য। আদিম সংস্কৃতির উপকরণ ধর্মশিলার স্নানোৎসবের সঙ্গে মিশে গেছে।

ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার দিনে ভক্ত্যাগণ ধর্মরূপী এক বৃহৎ শিলাখণ্ডকে এক চতুর্দোলায় স্থাপন করে গ্রামের পুকুরে বা নদীতে মহাসমারোহে নিয়ে যান। ঢাক আর কাঁসির সমবেত শব্দে চতুর্দিক মুখর হয়ে উঠে। ধর্মের দেয়াশী বা ডোম পণ্ডিতেরা ধর্মশিলাকে স্নানার্থে পুকুরঘাটে বা নদীর ঘাটে নিয়ে যান। রাঢ় অঞ্চলে বন্ধ্যা নারীদের মধ্যে একটি প্রথা আছে যে ধর্মশিলার স্নানোৎসবে ধর্মশিলার স্নানান্ত প্রথম জলবিন্দু যদি বন্ধ্যানারীর মাথায় পড়ে তবে সে নারী সন্তানসম্ভবা হবেন। গ্রাম-গ্রামান্তরের বন্ধ্যারা ধর্মশিলার স্নানোৎসবে সমবেত হন। ধর্মের দেয়াশী পণ্ডিত যখন ধর্মশিলার স্নানের আয়োজন করেন পুকুরের জলে, তখন বন্ধ্যানারীরা দেয়াশী এবং ধর্মশিলাকে ঘিরে দাঁড়ায়। মহা হৈ চৈ-এর মধ্য দিয়ে ধর্মশিলার স্নান সমাপন হয়। ধর্মঠাকুর বা শিলার স্নানজলের কয়েক বিন্দু ধর্মঘটের জলে মেশানো হয়। এই মাটির

কলসীকে অনেকে 'বিষয়কলসী'ও বলেন। পাটভক্ত্যা ধর্মঘটটি নিয়ে ধর্মশিলার অনুসরণ করেন। পাটভক্ত্যা অতি সন্তর্পনে ধর্মঘটটি নিয়ে ধর্মঠাকুরের মন্দিরে উপস্থিত হন। ধর্মঘটের এই জলভরার রীতির মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক কোন শক্তি-সম্পর্ক আছে। তা ছাড়া বন্ধ্যা নারীদের ধর্মশিলার স্নানের প্রথম জলবিন্দু কামনার মধ্যে প্রজনন শক্তি সাধনার আদিম বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত আছে। বসুন্ধরা, নারী, প্রজনন প্রতীকার্থে সমভাবাপন্ন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে ধর্মশিলার স্নানোৎসবে আদিম প্রজনন ধর্মের প্রত্যক্ষ স্মৃতি জড়িত রয়েছে। বৃষ্টি কামনার মধ্যে যে অনুকরণমূলক যাদুশক্তি নিহিত ছিল, এখানেও সেই রকম শস্য-প্রজনন শক্তির বন্দনার ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। স্নানোৎসবের শোভাযাত্রা এবং ঢাক-নিনাদ স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলার বিবাহানুষ্ঠানের জলভরার কথা। বিয়ের পূর্বাহ্ণে যেমন নারীর প্রজনন শক্তির জাগরণের প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি ধর্মশিলার স্নানোৎসবে বসুন্ধরার প্রজনন শক্তির জাগরণেরও প্রয়োজন রয়েছে। ধর্ম, সূর্য ও শিলা যেন অনাদিকালের এক স্মৃতিসূত্রে জড়িত। স্নানোৎসবের পর ধর্মশিলাসহ শোভাযাত্রা গ্রামের ধর্মতলায় বা ধর্মের মন্দিরে এসে থেমে যায়। এইভাবে ধর্মরাজের স্নানোৎসব শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ বিবাহের মত ধর্মোৎসবও সমাজ-স্বীকৃতি লাভ করে।

৩. ফুলখেলা :

ফুলখেলার পূর্বে এবং ধর্মশিলার স্নানোৎসবের পরে রাঢ় অঞ্চলে 'লোটন' নামে এক অনুষ্ঠান হয়। একমাত্র ধর্মঠাকুরের ভক্ত্যারাই এই লোটনানুষ্ঠান করেন। লোটন শব্দের অর্থ ধরাশয়ন বা গড়াগড়ি। স্নানোৎসব শেষে দেয়াশী যখন শোভা-যাত্রা সহকারে ধর্মমন্দিরের দিকে অগ্রসর হন, তখন ভক্ত্যার দল শোভাযাত্রার সামনে মাটিতে গড়াতে গড়াতে নদীর ধারে উপস্থিত হন। এটা ভূমিচুম্বন বা ভূ-লিঙ্গন অনুষ্ঠানও বটে। ভক্ত্যা = সূর্য ; সূর্য-পৃথিবী সঙ্গম হলো লোটন। তারকেশ্বরের শিবমন্দিরে এই ধরণের লোটন বা দণ্ডীকাটার প্রথা দেখেছি। ধর্মের ভক্ত্যাদের সঙ্গে এখানে বিশেষ মিল রয়েছে। ধর্মের এক শ্রেণীর ভক্ত্যাদের 'লোটনভক্ত্যা' বলে। ধূলি-সিক্ত লোটন ভক্ত্যারা ধর্মোৎসবে অতি পবিত্র বলে সম্মানিত হন। তাঁদের দেহ স্পর্শ পবিত্র কর্ম বলে ধর্মপূজারীরা বিশ্বাস করেন। লোটন অনুষ্ঠান শেষ হলেই 'ফুলখেলা' শুরু হয়। ধর্ম অর্চনায় দেহপীড়ন ও আত্মশুদ্ধি ভারতীয় লোকায়ত এবং চিরায়ত ধর্মে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। বস্তুবাদের সীমারেখা ছাড়িয়ে মায়াবাদের পথে ধর্ম মানসিকতার অগ্রগমনের পথে এই বিবর্তন দেখা গিয়েছিল। অনুমাত্র একদিনেই এই বিরাট বিবর্তন লীলা শেষ হয়নি।

বরং ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে এই লীলাখেলা চলেছিল। গ্রহণ-বর্জনের স্বাভাবিক রীতি অনুসারে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই মিশ্রণ ঘটেছিল। ঐতিহাসিকেরা এর কাল নির্ণয় করতে পারেননি। এক সুদীর্ঘ চলমান কাল প্রবাহে এই পরিবর্তন কর্ম নিষ্পন্ন হয়েছে। সমাজে সংশ্লেষণ ক্রিয়া ঘটে ধীরে ধীরে, রেণুতে রেণুতে অন্তঃ শীলা চৈতন্যপ্রবাহে।

ফুলখেলার মধ্যেও দেখতে পাব দৈহিক পীড়নের এক রহস্যময় ইঙ্গিত। ধর্মোৎসবে তান্ত্রিক প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ফুলখেলা এক বিস্ময়কর অনুষ্ঠান। এর সঙ্গে যাদু (magic) মিশে গেছে। যেমন ধর্ম ঠাকুরের ভক্ত্যারা ধর্মঠাকুর-মন্দিরে সমবেত হবার পর প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নিয়ে ঢাকের তালে তালে উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন। ডান এবং বাঁ হাতের তালুতে অগ্নিকণার দ্রুত সঞ্চালন অগ্নিকণার রক্তিম আভা রঞ্জিতজবাকুসুমের রূপ ধারণ করে। এই কুসুমাভাস থেকে 'ফুলখেলার' নামকরণ হয়েছে। তিব্বতের বজ্রযানী বৌদ্ধরা অনুরূপ অনুষ্ঠান করেন 'প্রেতনৃত্যে'। ধর্মপূজারীদের বিশ্বাস এই কঠোর সাধনার মাধ্যমে দেহ-মনের পরিশুদ্ধি ঘটে। ফলে অভীষ্ট কামনা-বাসনার সিদ্ধি সম্ভব হবে এবং দেবতার কৃপালাভ ত্বরান্বিত হবে। বেশ কিছুক্ষণ নৃত্য চলার পর ভক্ত্যারা একে একে মন্দির দ্বারে সমবেত হন। সূর্যোৎসব প্রভৃতিতে আরতির যে নৃত্য হয়, তার সঙ্গে ফুলখেলার মিল রয়েছে। ফুলখেলার পর 'ফুলচাপানো' নামে একটি অনুষ্ঠান হয়।

৪. ফুলচাপান :

ফুলচাপানোর অর্থ হলো ধর্মশিলার মাথায় শ্বেতপদ্ম চাপানো। গ্রাম-গ্রামান্তরের পূজারীরা ধর্মের দেয়াশীর হাতে নিজের পূজার ডালা তুলে দেন এবং পূজারীর নামে ঠাকুরের মাথায় ফুল দিতে বলেন। এখনও বাংলার প্রায় সকল পূজানুষ্ঠানে এই রীতি প্রচলিত আছে। ফুলচাপানোর সঙ্গে সঙ্গে যদি ফুলটি ধর্মঠাকুরের মাথা থেকে পড়ে যায়, তবে পূজারীরা মনে করে তাদের বাসনা সিদ্ধ হবে। ধর্মপূজার দিন এই ফুলচাপানো দীর্ঘক্ষণ চলে। শ্বেতপদ্ম সূর্যের যেন শতদল, বসুন্ধরাকে এ যেন আলোকস্নাত, বীর্যস্নাত করা।

৫. ধর্মযজ্ঞ :

ধর্মপূজানুষ্ঠানের পরদিন ধর্মঠাকুরকে আবার স্নান করানো হয় নির্দিষ্ট পুকুরে। তারপর ধর্মশিলাকে অত্যন্ত পবিত্রতার সঙ্গে মন্দিরে স্থাপন করা হয়। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য যে ধর্মের ভক্ত্যারা ধর্মপূজার পূর্বেই গলায় পবিত্রসূত্র বা উত্তরীয় ধারণ করেন।

শিবের ভক্ত্যারাও ধারণ করেন। ধর্মানুষ্ঠান দু-তিন দিন ধরে চলে। দ্বিতীয়দিনে ধর্মমন্দিরে বিরাট জনসমাগম হয়। মেলা বসে। এইদিনে ভক্ত্যাদের গলা থেকে উত্তরীয় মুক্ত করে দেওয়া হয়। সূত্রমুক্তভক্ত্যাগণ আর কোন নিয়ম পালন করেন না। সাধারণভাবে চলাফেরা করেন। মেলায় ঘুরে বেড়ান। অবশ্য এইদিন কোন কোন ভক্ত্যা জিভবান, বুকবাণ কর্ণবান্ অর্থাৎ জিভে ও বুকে, কানে বাণ ফুঁড়ে নৃত্য করেন। ধর্মের দেয়াশী আনুষ্ঠানিকভাবেই এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করান। পরের দিনে অর্থাৎ ধর্মপূজার তৃতীয় দিনে 'ধর্মযজ্ঞ' হয়। যজ্ঞ শব্দটা লৌকিক অনুষ্ঠানে সংযোজিত হয়েছে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রাচারের প্রভাবে। নরমেধযজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ প্রাচীন ভারতীয় যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। বলি প্রথা অত্যন্ত আদিম সমাজ-ধর্মস্মৃতিবহ। ধর্মযজ্ঞের দিনে ভক্ত্যা ও পূজারীগণ সমবেত হন ধর্মমন্দির প্রাঙ্গনে। ধর্মের নামে উৎসর্গীকৃত পাঠা বলি দেওয়া হয় ধর্মশিলার সামনে। রক্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয় প্রাঙ্গনে। প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে বাংলার অন্য পূজানুষ্ঠানের যজ্ঞের কথা। যজ্ঞের অর্থ হলো যাগকরণ। অন্যার্থ লিঙ্গ, সোমরস। যজ্ঞে দেখেছি লাল শালুকাপড়, কলা, ঘি, মধু, বালি, কাঠ, পাটকাটি ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয়। লাল শালুকাপড় এবং কলা বলির পরিবর্ত রক্ত ও লিঙ্গ প্রতীকে উৎসর্গিত হয় বলে মনে হয়। এটা আদিম স্মৃতির ভদ্র পোশাক পরে চিরায়ত রূপ ধারণ করেছে মাত্র। বলিকৃত মাংস পরমান্ন হিসেবে ভক্ত্যাদের মধ্যে সায়াহ্নে বিতরিত হয়।

৬. পাটপূজা :

শাল বা গম্ভীর বৃক্ষের একটি চ্যাপ্টা (প্রায় পাঁচফুট দীর্ঘ) এক কাঠের ফালিতে লোহার কাঁটা বিঁধে দেওয়া হয়। যেন একটি শরশয্যা। এই পাটে শয়নকে বলে 'পালেভরদেওয়া'। ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার প্রায় একমাস পূর্ব থেকে ভক্ত্যারা পাটখণ্ড নিয়ে ঢাকের তালে 'মাগন' করেন। গম্ভীরার সঙ্গে সঙ্গেও মাগন করে। এই ভিক্ষালব্ধ উপাচারে ও অর্থে ধর্মপূজা নির্বাহ হয়। এর মধ্যে ধর্ম পূজারীর সমষ্টিচেতনা এবং সামাজিক ঐক্যবন্ধন পরিলক্ষিত হয়। চড়কের দিন পাটভক্ত্যারা কাঁটার শয্যায় শুয়ে দৈহিক দক্ষতার পরিচয় দেন। এখনও রাঢ় অঞ্চলে এই অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে প্রচলিত। পুরুলিয়ায় এবং মেদিনীপুরের সংযোগস্থলে বাঁশপাহাড়ী গ্রামে ১৯৬৬ সালেও দেখেছি এই পাটপূজা। পাটপূজার পর ধর্মঠাকুরের পূজার প্রধান আকর্ষণ এবং তাৎপর্যের দিক থেকে চমকপ্রদ এবং নৃত্যের দিক থেকে ভয়াবহ হলো চড়ক অনুষ্ঠান। চড়ক শব্দটা চক্র শব্দ জাত ; চক্র বর্তুলাকার, সূর্যসদৃশ। সুতরাং উভয়ের আবর্তন সাদৃশ্যবাচক

ও অর্থপূর্ণ। 'চর্' ধাতুর অর্থ হলো চলন, গতিশীল, জঙ্গম। চক্র>চকর> চরক>চড়ক। 'ভূতং চরাচরম্'।

৭. চড়ক:

ধর্মোৎসবে দৈহিক পীড়ন ও আত্মবৃদ্ধির বিভিন্ন পদ্ধতির কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। চড়ক তাদের মধ্যে এক অর্থপূর্ণ অনুষ্ঠান। চড়ক অনুষ্ঠানকে অনেকে আদিম সূর্যপূজার স্মৃতিচিহ্ন বলে মনে করেন। গুজরাটের গরানৃত্যের মত চড়কেও অনুকরণমূলক যাদুবিদ্যার প্রভাব পড়েছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে রাঢ়বাংলা গাজনের ঢাক-নিনাদে কলরবমুখর হয়ে উঠে। শুধুমাত্র রাঢ়বাংলা কেন পূর্ব ও উত্তর বাংলায়ও গাজন-চড়ক অনুষ্ঠান শৈব উৎসবের অঙ্গ হিসেবে প্রতি বছর উদ্‌যাপিত হয়। প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় যেমন বৈচিত্র্য আছে। তেমনি মানুষের পালপার্বণের জগতেও পালাবদল ঘটে। আধুনিক বাংলার বর্ষশেষ চৈত্রমাসে। কাজেই চৈত্র গাজনে যেন বাঙ্গালীর মানসলোকের নবায়ণের পালা। মানুষের জীবনে উৎসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় দেহ-মনের চৈতন্যের জন্য। 'এক একটা উৎসব, এক একটা পূজা, এক একটা জন্মতিথি যেন নূতনের সূচক ও প্রবর্তক হইয়া আমাদিগকে একটু সজ্ঞান করিয়া তোলে।'[১] এইভাবে আমাদের জীবন নবীনতর হয়, উজ্জ্বলতর হয়। সমষ্টির কল্যাণে জীবনের অগ্রগমনই উৎসবের যথার্থ চরিতার্থতা।

রাঢ়ভূমিতে যেমন গাজন, বরিন্দভূমিতে (উত্তরবঙ্গে) তেমনি গম্ভীরা। উভয়েই শৈব উৎসব। চড়ক কিন্তু শিব ও ধর্ম উভয়কেই একসূত্রে বেঁধেছে। ধর্মোৎসবেও চড়ক হয়। আবার মালদহ অঞ্চলে শিব-উৎসবের অঙ্গ হিসেবেও চড়ক হয়। মনে হয় সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে চড়ক, ধর্ম ও শিবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। চড়ক শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়, দক্ষিণভারতেও হয়। তামিল ভাষায় এই উৎসবের নাম 'চেডুল'।[২] ডি. ডি. কোশাম্বী তাঁর গবেষণামূলক 'লিভিং প্রিহিস্ট্রি ইন্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে বলেছেন:

১. 'চড়ক সংক্রান্তি'/বাঙালীর পূজাপার্বণ: পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

২. 'চেডুল' গাজনে 'চতুর্দোলায়', চোডল বা চোড়ল শব্দের ধ্বনি সাম্য সাদৃশ্য রয়েছে। গাজনে চতুর্দোলার ব্যবহার হত। ধর্মমঙ্গল কাব্যে রানী রঞ্জাবতী ধর্মকে তুষ্ট করার জন্য গাজন করেন; এবং এই কাব্যেই উল্লিখিত হয়েছে:

> গাজন লইয়া এল ময়না মণ্ডপে.
> শিরে ধর্ম পাদুকা সোনার চতুর্দোলে।

চট্টগ্রামের বিভাষায় চতুর্দোলাকে বলে 'চণ্ডল'। চণ্ডল শব্দের সঙ্গে চোড়ল বা চোডল শব্দের সাদৃশ্য লক্ষনীয়।—লেখক

"The most spectacular example of fossised ritual I have encountered is begad, or hook-swing. Both the law and public opinion discourage this practice in India, but in hook-swinging posts are still to be found near many temples throughout Deccan"[১]

শ্রীকোশাম্বী কিন্তু পূর্বভারতের চড়ক ও বাণফোড়ার কোন উল্লেখ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে করেন নি। পূর্বভারতের চড়কের সঙ্গে দক্ষিণভারতের চড়কের অনুষ্ঠানগত সাদৃশ্যও রয়েছে। যেমন চড়কের দিনকয়েক আগে নিকটস্থ বনভূমি থেকে শাল কাঠের উঁচু খুঁটি সংগ্রহ করে আনা হয়। তারপর গাজনতলায় বা চড়কতলায় খুঁটি পোতা হয়। দক্ষিণভারতেও অনুরূপভাবে খুঁটি পোতা হয়।[১] বৃটিশ সরকার এই বিভৎস ধর্মীয় অনুষ্ঠান আইন প্রণয়ন করে বন্ধ করে দেন। তবুও এখনও দূর-দূরান্তের গ্রামে চড়ক হয়। বঁড়শির মত তীক্ষ্ণ দু'টো কাঁটা বাণভক্ত্যার পিঠে বিদ্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর তাকে চড়ক কাঠের সঙ্গে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে শূন্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। 'জয় বাবা মহাদেব' অথবা 'জয় ধর্মরাজ' ধ্বনিতে মুখরিত হয় গাজনতলা। অনেক সময় ভক্ত্যা ঘূর্ণ্যমান অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে যান। এমন কি ধনুষ্টঙ্কার রোগেও অনেকে মারা যান। চড়ক উপলক্ষে বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ায় বড় বড় মেলা হয়। কালিন্দী, মাহাত, ভূমিজরা শিব মন্দিরের চারপাশে সাতবার ঘুরেন। চক্রাকারে এই ঘোরাটাই যেন পিঠফোঁড় চড়কের পরিবর্ত। মালদহ জেলার কালীবাড়ী, গম্ভীরাবাড়ী, আধরাবাড়ী বগচড়া, কলিগ্রাম প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে গম্ভীরার চড়ক হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অমাবস্যা রাত্রে নরমুণ্ড নিয়ে ঢাক ও ঢোলের তালে তালে নাচতেন ভক্ত্যারা। এই নাচে অংশ গ্রহণ করে হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দী, বাউড়ীরা। নরমুণ্ড সহ এই নৃত্যকে বলা হত 'মশালনাচ'। কালক্রমে চড়কে যে তন্ত্রাচার অনুপ্রবেশ করেছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এমন কি চড়কে কুমারী বলির বিধানও ছিল।

আসামের কাছাড় ও বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলায় পিঠবাণ চড়ক হত। এখনও দূরান্তের গ্রামে পিঠবাণ চড়ক অনুষ্ঠিত হয়। সাধু পাটভক্ত্যা বা রাজভক্ত্যা চড়কে একমাত্র চড়তে পারেন। অন্য ভক্ত্যাদের চড়ক গাছে চড়তে দেওয়া হয় না।

---

১. A new crossem is ceremnially cut each year in a jungle some forty miles from the village; this is said to be the place from which clan X orignally migrated.—The American Review/P.45 (Vol. XII-No. 1) Oct. 1967.

চড়কের পূর্বদিনে হিন্‌দোলা বা দোলসেবা নামে এক অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে ভক্ত্যারা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যান। এখনও দুরান্তের গ্রামে এই অনুষ্ঠান হয়। এর লৌকিক নাম 'আগুন ঝাঁপ'। জাপানের টোকিও শহরের নিকটবর্তী 'মাউন্ট টাকাও' বৌদ্ধ বিহারের প্রাঙ্গনে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এখনও প্রজ্জ্বলিত আগুনের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যান। এটা একটা বৌদ্ধাচার। সম্ভবত বজ্রযানী বৌদ্ধদের প্রভাবে বাংলার ধর্মগাজনে এই লোকাচার সঞ্চারিত হয়েছে।

ছোটনাগপুরের ওরাওঁদের মধ্যেও চড়কের অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান হয়। চৈত্রসংক্রান্তিতেই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ছোটনাগপুর এবং মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া অঞ্চলের সঙ্গে ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক সংযোগ। সুতরাং সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, মাহালী, লোধা, কোঁড়া, ভূমিজ প্রভৃতি আর্যেতর সংস্কৃতির সঙ্গে চড়ক গাজনের উপাদানগত মিল বেশি। মনে হয় সাংস্কৃতিক বিকিরণ ও প্রসারণের স্বাভাবিক সূত্রের ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে একই ধর্মীয় ভাবধারার সঞ্চরণ ঘটেছে। প্রসারণের ধারাটি এই রকম : উৎস→ক→খ→গ→ঘ। এইভাবে কালের মাত্রা ধরে স্থানান্তরণ বা প্রসারণ ঘটতে পারে।

গাজন উৎসবটা 'গর্জন' থেকে এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। সংস্কৃত গর্জন>প্রাকৃত গজ্জন>হিন্দী গাজনা। মূল অর্থ 'সিংহনাদ'। সন্ন্যাসীদের সমবেত গর্জন থেকে গাজন শব্দের সৃষ্টি হয়। [পঞ্চম টীকা দ্রষ্টব্য]। অনেকে বলেছেন : 'গ্রামজন' থেকে গাজন এসেছে। গ্রামজন থেকে যদি গাজন শব্দ সৃষ্টি হয়, তবে লোকায়ত সব উৎসব-অনুষ্ঠানেই গ্রামজনের প্রধান ভূমিকা রয়েছে। সমষ্টির কল্যাণমূলক অনুষ্ঠানে গ্রামজনের ঐক্যই মূল কথা। গ্রামজন থেকে বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের নামকরণ ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। বরং গর্জনের সঙ্গেই গাজনের মিল সমধিক। ছোটনাগপুরের মুণ্ডারাও চৈত্র-বৈশাখ মাসে মহাদেও থানে বা দেবীথানে বার্ষিক পূজা উপলক্ষে 'চড়কি' নামে এক অনুষ্ঠান পালন করেন।[১] এই অনুষ্ঠানেও বাণফোড়া হয় পিঠে। বাংলা দেশের চড়ক উৎসবের সঙ্গে এর নামগত এবং অনুষ্ঠানগত সাদৃশ্য রয়েছে। এই চড়কি উৎসবে গম্ভীরা ও গাজনের সঙ্‌-যাত্রার মত গো, পশু ও হনুমান নৃত্য হয়। চড়ক শব্দের উচ্চারণ প্রাকৃত বিকৃতির ফলে চড়কি শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার অনেক লোকায়ত উৎসবানুষ্ঠানের সঙ্গে ছোটনাগপুরের ওরাওঁ এবং মুণ্ডাদের সাংস্কৃতিক সংযোগ রয়েছে। প্রাচীন কালে

১. Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal (Vol ; XXX 1934) K. P. Chattopadhyay and N. K. Basu.

ছোটনাগপুর বৃহত্তর বাংলার এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। সুতরাং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই মিশ্রণ স্বাভাবিক। অনেকে মনে করেন ওরাওঁদের ধর্মেশ বা ভেরম দেবতা থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। ভেরম<ভেরম্মা<ভের্ম<ধরম্<ধর্ম—এইভাবে শব্দটি বিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়। ধর্মোৎসব আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন: "পশ্চিমবঙ্গের ধর্ম ঠাকুর আদিম সমাজের সূর্যদেবতা ব্যতীত কেহই নহেন। ...হিন্দুভাব বশতঃ আদিবাসীর কৃষিসহায়ক সূর্যদেবতা প্রথমতঃ ধর্মঠাকুর এবং পরে শিবঠাকুররূপে পরিবর্তিত হইয়াছেন। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন লৌকিক শিবমন্দিরে আদিম সূর্যোপাসনারই কতকগুলি আচার পালন করা হইয়া থাকে। শালেভর, কাঁটাঝাঁপ, বাণফোঁড়া ও চড়ক তাহাদের অন্যতম।"[1] এই মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। কিন্তু একটা কথা এখানে বিচার্য ধর্মঠাকুর পরিবর্তিত হয়ে শিবঠাকুরের রূপ নিলেন কেমন করে? বাংলা দেশে সেন রাজত্বের পূর্বেই শিবের গাজন উৎসবের বিকাশ ঘটে। রাজা লক্ষণ সেনের তাম্রশাসনে 'সদাশিব' অঙ্কিত রয়েছে। সেকালে সদাশিব উৎসব নামে একটি উৎসব প্রচলিত ছিল। ধর্মের গাজনও তখন হত। শিব উত্তরবঙ্গের অত্যন্ত জনপ্রিয় লৌকিক দেবতা। গোপীচন্দ্রের গানে ও শিবায়ণ কাব্যে সে পরিচয় পেয়েছি। তাছাড়া গম্ভীরা মূলতঃ শিবকেন্দ্রিক উৎসব। শিববন্দনা গম্ভীরার প্রধান অঙ্গ। পৌরাণিক শিব ধর্মের সঙ্গে এক হতে পারেননি। উৎপত্তির দিক থেকে বিচার করলে ধর্ম এবং শিলা প্রাচীন 'মেন্‌হির' (Menhir) এবং 'মনোলিথ' (Monolith) সংস্কৃতি স্তরে প্রসারিত। সুতরাং আদিম ধর্ম বা ভেরম, পৌরাণিক বৃষবাহন শিব এক নন। অনুষ্ঠানগত সাদৃশ্যও থাকতে পারে। এই সাদৃশ্য সংস্কৃতিগত প্রসারণ, ব্যাপন বা সমন্বয়ের ফলশ্রুতি। কোন প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত রূপান্তরণ বলে মনে হয় না। যুগে যুগে আর্যসংস্কৃতির সঙ্গে আর্যেতর সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণ, গ্রহণ-বর্জন ঘটেছে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষে। পূর্ব-ভারতে বরং বিলম্বে এই প্রসারণ বা ব্যাপন ঘটেছে। 'শিবের গাজন, ধর্মের গাজনের পরবর্তী এবং শিবের গাজন ধর্মের গাজনের পূর্ণ অনুকরণমাত্র।'[2] লৌকিক স্তরে অনুকরণের চেয়ে বিবর্তনটাই বড় কথা। কোন অঞ্চলে কোন ধর্মানুষ্ঠানের প্রথম উদ্ভাবন হলে, কালক্রমে লোকায়ত সমাজের প্রসারণ, ব্যাপন, বিকৃতির ফলে সেই বিশেষ অনুষ্ঠান বা পর্ব, পার্বণ সন্নিহিত লোকসমাজে প্রচলিত হতে পারে। ধর্মোৎসবে এবং শিবোৎসবে অনুষ্ঠানগত সাদৃশ্য প্রসারণ প্রক্রিয়ার ফল বলেই গ্রহন

১. বাংলার লোকশ্রুতি / পৃঃ ৫৫
২. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা / ৩য় সংখ্যা, ১৮শ ভাগ / পৃঃ ২০২ / হরিদাস পালিত

করা শ্রেয়। কারণ কোন অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গ এক হলেও অন্তরঙ্গে অঞ্চল বিশেষে এবং পূজারী-পুরোহিত বিশেষে কিছু তারতম্য ঘটবেই। এটা স্বাভাবিক। স্মৃতিবাহিত, শ্রুতিলালিত ঐতিহ্য ধারা পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল। এই গতিশীলতাই লোকসংস্কৃতির প্রাণ। ধর্ম ও শিব সমগুণের নয়। ধর্মঠাকুর বৌদ্ধসংস্কৃতির ফলশ্রুতি। যদিও শিলারূপে উভয়ের সাদৃশ্য রয়েছে। শিব-শিলা প্রাচীন বা আদিম লিঙ্গ প্রতীক দ্যোতনায় অভিন্ন।[1] অথচ ধর্মশিলা লিঙ্গ দ্যোতক নয়। বরং যোনির প্রতীক বলে মনে হয়। কূর্মাকৃতি শিলার আদিম শিলাসংস্কৃতিতে যোনির দ্যোতনা করে ধর্মতন্ত্রাচারপ্রভাবিত বজ্রযোগিনীরা। অতএব ধর্মশিলা ও শিবলিঙ্গ সমার্থক নয়।

৮. গাজন: বাংলাদেশে গাজন একটি অতিপ্রাচীন ধর্মমহোৎসব। চৈত্র-সংক্রান্তিতে ধর্ম ও শিবোৎসবকে কেন্দ্র করেই গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাজন দ্বিবিধ। প্রথমত শিবের গাজন, দ্বিতীয়ত ধর্মের গাজন। শিবের গাজনের বরেন্দ্রী (উত্তরবঙ্গের) রূপ গম্ভীরা উত্তরবঙ্গের বাইরে অনুষ্ঠিত হয় না। বিশেষতঃ মালদহ, রাজশাহী, দিনাজপুরেই এই উৎসব সীমাবদ্ধ। গম্ভীরাও মূলতঃ শৈব উৎসব। লৌকিক শিবকে এই অঞ্চলে কৃষির ও কৃষকের দেবতারূপে পূজা করা হয়। শিব এই অঞ্চলে গণদেবতায় পরিণত।

গাজন উৎসবে মূল সন্ন্যাসী থাকেন একজন। গাজনের মূলহোতা হলেন মূলসন্ন্যাসী। ধর্মের ভক্ত্যাদের মত গাজনের সন্ন্যাসীরা নানাবিধ দৈহিক পীড়ন-লুব্ধ। গাজনের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান চড়ক।

আমরা দেখেছি চড়কের মূল অনুষ্ঠান 'বাণফোড়া' এবং 'চক্রদোল'। চৈত্র-সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত শৈব উৎসবকে সাধারণত গাজন উৎসব বলা হয়। উত্তরবঙ্গে বাণ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শিবের ভক্ত ছিলেন। শিবকে প্রীত করবার জন্য তিনি নাচ-গান করে নিজের দেহের রক্ত নিষ্কাষণ করে মহাদেবকে দিয়েছিলেন। সেই থেকে গাজন উৎসবের চড়ক অনুষ্ঠানে ভক্তরা বাণ ফোড়েন, দেহের রক্ত ঝরান শিবের থানে।

এই আচারগুলি প্রাগৈতিহাসিক এবং দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির স্মৃতিচিহ্নবহ। সঙ্‌যাত্রাও শিবোৎসবের অঙ্গীভূত হয়েছে। গম্ভীরা উৎসবে সঙ্‌নাচ, ছোট তামাসা ও বড় তামাসাও হয়ে থাকে। কালী সেজে নাচ করাকে বলে 'কালী-

---

১. বাংলায় ঘরে ঘরে যে শিবমূর্তি গড়া হয়, তাও কোন ভাস্করে গড়েন না, ঘরের মেয়েরা গড়েন মাটির শিবলিঙ্গ। এই শিবপূজার প্রবর্তনের কাহিনী শিবপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি একাধিক পুরাণ ও উপপুরাণে বর্ণিত আছে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি; বিনয় ঘোষ

নাচ' বা 'কালী পাতারা'। অনেক ক্ষেত্রে কাঠের বা মাটির তৈরী মুখোস পরে ঢাকের তালে তালে নৃত্য করা হয় গাজনতলায়। হরগৌরী, ভূতপ্রেতনী, সন্ন্যাসী, বুড়োবুড়ি ইত্যাদির মুখোস পরে নাচ করা হয়। 'পতঞ্জলির মহাভাষ্যে' মুখোস-নৃত্যের উল্লেখ আছে। (মুখোসনৃত্য অনুকরণমূলক এক আদিম নৃত্য। এরসঙ্গে ডাকিনীবিদ্যা জড়িত। মূকাভিনয়ের সর্বশেষ পরিণতি মুখোসনৃত্য। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এই নৃত্যের কোন বিধান নেই। লোকায়ত কোন নৃত্যধারাকে পতঞ্জলি অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। গম্ভীরার সঙনাচে মুখোসনৃত্য হয়। স্থানীয় অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে এই মুখোসনৃত্যকে বলে মখানাচ। চট্টগ্রামে চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন উপলক্ষে মুখোস নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এই নৃত্যকে বলে মুখানাচ। আসামেও এই নামে প্রচলিত এক নৃত্যধারা আছে। দার্জিলিঙ জেলায় ভুটিয়ারা মহাকাল বা কাঞ্চনজঙ্ঘার মুখোস পরে নৃত্য করেন। পুরুলিয়ায়, সোরাইকেল্লা ও ময়ূরভঞ্জে ছোনাচ নামে এক মুখোস নৃত্যধারার প্রচলন এখনও আছে। এইনাচ 'কাপঝাঁপ' (মূকাভিনয়) থেকে উদ্ভূত। এই নাচের বিষয় পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দানব, মানুষ ও পশুপক্ষী ইত্যাদির চরিত্র। এই নাচকে মিশ্র লোকনৃত্য-নাট্য বলা চলে। কারণ মার্গ নৃত্যের কিছু রূপাঙ্গ লৌকিক এই নৃত্যধারার সঙ্গে মিশে গেছে।)

গাজনের শেষ উৎসব চড়ক। শিবোৎসব উপলক্ষে যে চড়ক হয় তা ধর্মের চড়ক অনুষ্ঠানের প্রায় অনুরূপ। এখানে সন্ন্যাসীরা চড়ক গাছের জাগরণপালা করেন। প্রতি বছর চড়ক অনুষ্ঠানান্তে চড়কগাছটিকে শিবমন্দিরে বা নিকটবর্তী পুকুরে নিমজ্জিত করে রাখা হয়। সন্ন্যাসীরা জল মধ্য থেকে চড়কগাছ অন্বেষণ করে তুলে আনেন এবং কাঁধে করে বহন করে নিয়ে আসেন গাজনতলায়। গাজনতলায় চড়কগাছের পূজা করা হয়। পূজান্তে চড়কগাছ গাজনতলার মাটিতে পোতা হয়। দুটো বড় খুঁটির উপর লম্বালম্বি করে একটি মাঝারি খুঁটি শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। লম্বালম্বি দেওয়া খুঁটির সঙ্গে একটা শক্ত শণের দড়ি ঝুলানো থাকে এবং দড়ির অগ্রভাগে বড়শির মত লৌহকাঁটা বেঁধে দেওয়া হয়। সেই লৌহকাঁটা চড়ক সন্ন্যাসীর পিঠে বিঁধে দেওয়া হয় এবং তাকে মৃদু মৃদু দোলা দেওয়া হয়। ধর্মের চড়কের অনুরূপ বাণফোঁড়া, কাঁটাঝাঁপ ও বটিঝাঁপ, অগ্নিদোল বা হিন্দোল শিবের গাজনেও করা হয়। শিব বিষয়ক বহু লোকগীতি ও কথা উত্তরবঙ্গের (বাংলাদেশের) বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত আছে। গোপীচন্দ্রের গান ও শিবায়ন কাব্যে তার যথেষ্ট প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। ১৮৬৩ সালে বৃটিশ সরকার আইন করে চড়ক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেছিলেন। কেননা

প্রতি বছর অসংখ্য সন্ন্যাসী নির্মমভাবে পিঠবাণ চড়কে প্রাণ হারাত। এখনও পিঠবাণের পরিবর্ত হিসেবে কোমরে দড়ি বেধে বাংলার সীমান্তে চড়ক অনুষ্ঠান পালন করা হয়। পুরুলিয়ায় এবং মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে দুবছর আগেও পিঠবাণ চড়ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্ধমানের কুড়মুনে, বাঁকুড়ায়, মেদিনীপুর, বীরভূমের মল্লারপুরে, কাছাড়ের হাইলাকান্দিতে পিঠবাণ চড়ক এখনও প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়। এক প্রাগৈতিহাসিক লোকানুষ্ঠান আজও ভারতের লোকায়ত সংস্কৃতি-স্তরে সজীব সংস্কৃতি রেণু হিসেবে বেঁচে রয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন আদিম নরবলি বা বলি প্রথার শেষতম পর্ব হিসেবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নররক্তপাত ঘটানো হয়। বাণফোড়ার বিবিধ অনুষ্ঠান শুধুমাত্র দৈহিক পীড়ন বলে মনে হয় না। প্রাচীন দূরাগত ঐতিহ্যপ্রবাহে মূল স্মৃতি হয়ত আজ অবলুপ্ত। কিন্তু আচারগত প্রণালী যুগ-যুগান্তরের বিসর্পিত পথ বেয়ে আজ শেষ স্বাক্ষর বহন করে চলেছে চড়কের রক্তস্রাবী অনুষ্ঠানসমূহ। গাজনের শবনৃত্য বা বোলানের মুণ্ডমালানৃত্য প্রত্যক্ষত নরবলির স্মৃতিবহ। নরবলি নিষিদ্ধ হবার ফলে এবং সমাজ মানস কুসংস্কারমুক্ত হবার ফলে অনেক নির্মম, হিংস্র আচার কালক্রমে বর্জিত হয়েছে এবং নবীন কোন শাস্ত্রীয় আচারও পক্ষান্তরে গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিবর্তনশীল স্বভাবই সংস্কৃতির চিরনবায়ণের উৎস। বাংলার সংস্কৃতির মৌল উপকরণ বিশ্লেষণ করলে অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া চলবে।

শিবের প্রসঙ্গে বোলান উৎসবের নাম করতেই হয়। গাজন শিবোৎসবে, ধর্মোৎসবে এবং নীলোৎসবে, গম্ভীরা উৎসবে ও বোলান উৎসবে সমানভাবে পালনীয়। গাজনের এবং চড়কের এত ব্যাপকতার কারণ সম্ভবতঃ নিষাদচার বা তান্ত্রিক বামাচারে প্রভাব। আদিম মানসিকতা দীর্ঘদিন বাংলার লোকায়ত মানসে কাজ করেছে। ধর্মীয় বিশ্বাস সহজে মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। লোকাচার সহজে সমাজমন থেকে মুছে যায় না। তার স্মৃতিচিহ্ন রূপান্তরের মধ্যে বেঁচে থাকে সমাজের বুকে। বোলান, গাজন ও শিবোৎসবের অন্তরঙ্গ অঙ্গ। বিশেষত বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বোলান অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলার শিব ধ্যানমৌনী নয়, বরং গৃহী, কৃষক, আত্মভোলা পিতা। গাজন উৎসব যেহেতু লোকায়ত, সেহেতু বাগদী বাউড়ী, হাড়ী, ডোমরাই এঁর দেয়াশী। ব্রাহ্মণ্য শাসনের বাইরে এদের আচার। লোকরীতিতে এর ব্যাপন।

মুর্শিদাবাদের বাগড়া অঞ্চলে এবং বর্ধমানের কাটোয়া অঞ্চলে বোলান উৎসবের ব্যাপকতা লক্ষণীয়। বোলান উৎসবের কাল চৈত্রমাসের সংক্রান্তি। বোলান রাঢ় অঞ্চলের গাজনের অনুরূপ। শিবগাজনও এই সময় হয়।

বোলানের ভক্ত্যাদের উপাস্ত দেবতা শিব। শিবতলাতেই বোলান উৎসব হয়। বোলানে মুসলমান গায়কেরাও অংশ গ্রহণ করেন। সত্যপীরের মত এতে কোন জাতবর্ণ বিচার নেই। এ যেন primitive-comradeship—আদিম সখ্যবোধ, চিরন্তন মানব-ধর্ম।)

বোলানে শিব ছাড়া রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমগান বিশেষ স্থান লাভ করেছে। কারণ শ্রীচৈতন্তের বৈষ্ণবীয় প্রেম ধর্মের প্লাবন। একদিন শিবের গান বাংলা দেশজুড়ে প্রচলিত ছিল। নীলগাজনে শিবের বিয়ে থেকে শুরু করে হরপার্বতীর গৃহসংসারের নানা বিষয়ের পালাগান গাওয়া হয়। বাংলার শাক্তপদাবলীতে শিব বাংলার গৃহী, সংসারী। (বোলানে নৃত্য-গীতেরই প্রাধান্ত। আদিরসাত্মক ও ব্যঙ্গার্থক গানই অধিক। বোলানে গাজনের মত মড়াখেলা, ভূত-প্রেত নৃত্যের প্রচলন আছে। গম্ভীরার তামাসা বা সঙনাচের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই নিষাদাচার অনার্য ভাবধারাপুষ্ট। বোলানে মুখোস যদিও নাচের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না, তবুও সঙসাজার এক চমৎকারিত্ব চোখে পড়ে গৃধিনীবিশাল নাচে। মুখে সিঁদুর, গৈরিক মাটি ও কালি মেখে সঙ সাজেন বোলান গাইয়েরা। বোলানের সঙনাচ দক্ষিণ-ভারতের কথাকলি নৃত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয় লৌকিক স্তরে লোকনৃত্যধারার ক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মিল খুব বেশি। যক্ষগণ, মোহিনীআট্টম, কুট্টিয়াট্টম প্রভৃতি নাচের সঙ্গে সঙ, ছোনাচের মিল বেশি। গৃধিনীবিশাল নাচ ও শ্মশানখেলার নাচে নিষাদাচার বা তান্ত্রিকাচার অতি প্রত্যক্ষ। আদিম 'ম্যাজিক কাল্ট' (magic cult) এই ভয়াল নৃত্যমণ্ডনকলাকে প্রভাবিত করেছে। শ্মশানের মৃতদেহ। কালো রাত। প্রেত-প্রেতনী আর গৃধিণী যেন নরমাংস লেহন করছে উদগ্র লালসায়। নাচের মধ্যে প্রচণ্ড গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। বোলানে গাজনের মত মুণ্ডনৃত্যও হয়। বোলানের শিব শ্মশনাচারী, ভোলানাথ।)

চৈত্রসংক্রান্তির দুদিন আগে বোলানের সন্ন্যাসীরা হবিষ্যান্ন করে সংযম পালন করেন। এখানেও বিশ্বেশ্বর শিবের স্নানোৎসব হয়। গঙ্গার ঘাটে শিবশিলার স্নানোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। শোভাযাত্রাসহ সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। সঙ্গে চলে ঢাকের বাজনা। বাংলার লোকউৎসবে, শুধু লোকউৎসবে কেন সামগ্রিকভাবে সমস্ত উৎসব বা পাল-পার্ব্বণে গীত ও বাদ্য অপরিহার্য। আদিবাসী-দের সমাজে বাদ্য হচ্ছে গণসংযোগের মাধ্যম। সমগ্র সমাজকে ওয়াকিবহাল করার জন্ত বাদ্য-গানের একান্ত প্রয়োজন। ঢাক-ঢোল বাজনা সেকালের প্রতীকী-শব্দ সংকেত। এমনকি মৃত্যুতেও বাদ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখেছি। শোক ও

আনন্দের বাজনার তাল-মাত্রা পৃথক। লোকসমাজ বাজনার তালে বুঝে নেয় সংকেত। বাংলাদেশে মৃত্যুর পর শবযাত্রায় কীর্তন ও 'হরিনাম' মনে হয় আদিম সংস্কৃতিধারার আধুনিক রূপ। মধ্যভারতের বইগারা মৃত্যুর বার্তা সমগ্র গ্রামে প্রচারার্থে ধামসা বাজায় করুণ সুরে। বাংলার স্ত্রীয়াচারে উলু বা হুলুধ্বনি আর্যেতর সংস্কৃতির শুভদ্যোতক শব্দধ্বনির পরিচয়বহ।

বোলান উপলক্ষে নীলোৎসব হয় বর্ধমান জেলায়। মুর্শিদাবাদেও এই উৎসব হয়। উত্তরবঙ্গের শিবের বিবাহ গৃহ-সংসার সম্পর্কিত ছড়াগান কোচ্, পলিয়া, দেশী ও রাজবংশীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। চৈত্রমাসে গাজনের সময় বা গম্ভীরার সময় এই গানগুলি গীত হয়। মেয়েরা নীলব্রতও পালন করেন। নীলব্রত শিবের ব্রতের আঞ্চলিক নাম। ব্রতিনীরা বলেন: "নীলের ঘরে দিয়ে বাতি। জল খাও গো পুত্রবতী।" অত্যন্ত কামনা-বাসনার দীপ জেলে বাংলার মেয়েরা গৃহকোণে তাদের ব্রতপালন করেন। বাইরে পুরুষ সমাজে চলে নাচগান, রঙ্-তামাসা। যেন জীবনের বলিষ্ঠতার অফুরন্ত নান্দনিক প্রকাশ। কর্ম ও আনন্দের যৌগিক তরঙ্গ নাচ-গান-অভিনয়।

বাংলার শিবোৎসব প্রসঙ্গে বিশেষত গাজন, চড়ক আলোচনা করতে গিয়ে গম্ভীরা উৎসবের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, মালদহ ও দিনাজপুরে গম্ভীরা এক বহু ব্যাপক উৎসব। সেখানকার আদিবাসী কোচ, বা পলিয়া, ও রাজবংশীরা যেমন শিবোৎসব করেন তেমনি হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত, বাগ্‌দী, বাউড়ী, জালো, মালোরাও গম্ভীরা উৎসব পালন করেন।

গম্ভীরা শব্দটা গাজন শব্দের মত পণ্ডিতদের মধ্যে এক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। বিতর্ক শব্দ নিয়ে নয়, অর্থ নিয়ে। এই ধরনের বিতর্ক প্রায় সব দেশেই হয়। কেননা শব্দের অর্থ সমালোচকের অভিপ্রায়ানুগ। কাজেই দৃষ্টি ও ব্যবহারের পার্থক্যের জন্য শব্দার্থের সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটে। গম্ভীরা শব্দটা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসাহিত্যে ব্যাপকভাবে 'গর্ভগৃহ' অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। গর্ভগৃহ, মধ্যগৃহ, মন্দির, দেউল গম্ভীরার সম ভাবদ্যোতক শব্দ। গোপীচন্দ্রের গীতে আছে: 'ধ্যানে বৈসে ময়না মন্ত্রি আপন গম্ভীরায়।' আবার শিবসংহিতায় শিবের যে অসংখ্য নাম রয়েছে 'গম্ভীর' তাদের মধ্যে অন্যতম। শিবোৎসব উপলক্ষে সেন রাজত্বে বাংলাদেশে চৈত্র সংক্রান্তিতে যে উৎসব হত তাকেও 'গম্ভীরা উৎসব' বলত। গম্ভীরা শিবালয় এবং শিবোৎসব এই উভয় অর্থের ব্যঞ্জনা করে উত্তরবঙ্গে। মালদহ জেলায় অসংখ্য গম্ভীরাবাড়ি গম্ভীরার দেবগৃহের প্রতি ইঙ্গিত করে। রাঢ় অঞ্চলেও গম্ভীরা দেবগৃহ বোঝায়। যেমন: 'গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর' ইত্যাদি।

চৈতন্যচরিতামৃতেও গম্ভীরা গৃহবাচক। উৎকল দেশেও 'গর্ভগৃহ' বোঝাতে গম্ভীরা শব্দ ব্যবহার করা হত। মনে হয় গম্ভীরা প্রথমে শিবকে বোঝাত। পরে শিবের দেউল বা মন্দিরকে গম্ভীরা শব্দ দ্বারা বোঝানো হতে লাগলো। যেমন চণ্ডীদেবীর নামকে কেন্দ্র করেই চণ্ডীমণ্ডপ এবং কালীকে কেন্দ্র করে কালীতলা, শিবকে কেন্দ্র করে শিবতলা ইত্যাদি শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। এ রকম বহু উদাহরণ দেওয়া চলে। দেব-দেবী এবং তাঁদের আলয়, দেউল, মন্দির এক হয়ে যায় লোকমানসের অজ্ঞাতে। ভারতীয় ধর্ম চেতনায় এই প্রবণতা এক অভিনব সংশ্লেষণ ধর্মের ফলশ্রুতি বলে মনে হয়।

(মালদহে গম্ভীরার প্রকাশ ও ব্যাপ্তি।) যুগে যুগে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গম্ভীরা আজকেও তার সজীবতা হারায়নি। নব নব উপাদান-সংশ্লেষে গতিশীল হয়েছে। চৈত্রমাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত গম্ভীরার কাল। আদি গম্ভীরা চৈত্র মাসেই অনুষ্ঠিত হত। কালক্রমে কালসীমা প্রসারিত হয়েছে। মালদহ জেলার প্রায় সর্বত্রই গম্ভীরা বাড়ি সহজ দৃষ্ট হয়। বার্ষিক উৎসবে সেখানে ফুলপত্র দিয়ে সাজানো হয়। গম্ভীরা মণ্ডপের প্রাঙ্গনে বৃহৎ প্রদীপ জ্বালানো হত। এখন সেখানে বেলোয়ারি ঝাড়, হেজাক, ডেলাইট জাতীয় আলোর ব্যবস্থা দেখা যায়। পুষ্পমালা এখনও গম্ভীরামণ্ডপের শোভা বর্ধন করে। মালদহের কালীতলা, জোহারিতলা, ফুলবাড়ি, কলিগা প্রভৃতি মণ্ডপের গম্ভীরা উৎসব খুব প্রাচীন। ইংরেজবাজার, চাটখোলাতেও বড় তামাসায় সঙ্‌নাচ, মখানাচ ইত্যাদি আজও অনুষ্ঠিত হয়।

গম্ভীরা উৎসবের অনুষ্ঠানকে মোটামুটি পঞ্চরঙ্গ পর্যায়ে ভাগ করা চলে। যেমন: ঘটভরা, ছোট তামাসা, বড়তামাসা, আহারা ও চড়ক। চৈত্রমাসের শেষ সংক্রান্তির পাঁচদিন ধরে গম্ভীরার উৎসব চলে। তার আগে অবশ্য মখানাচ মালদহের গ্রাম-গ্রামান্তরে অনুষ্ঠিত হয়। মুখোস পরে শিব-শিবানী এবং তাঁর অনুচর নন্দী, ভৃঙ্গী, ভূত-প্রেত, বুড়া-বুড়ি ও কালীনৃত্যাদি ঢাকের তালে তালে সারা চৈত্র মাস ধরে করা হয়। ঘরে ফসল তোলার পূর্বাহ্নে কৃষক শিবের কাছে জীবন বন্দনা ও অনুকরণমূলক নাচের মাধ্যমে কৃষিজীবনের, ফসল তোলার আনন্দবার্তা ঘোষণা করেন। শিববিষয়ক উৎসবাদি কৃষিপ্রজননমূলক। বাঙ্গালীর মৃন্ময় জীবন বাসনার উজ্জ্বলচিত্র গাজন-গম্ভীরা। কর্মশক্তি সঞ্চারের, নবান্নের অনন্ত উৎসব সূর্য-শিব-ধর্মোৎসব সমূহ।

ঘটভরার প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। পবিত্র জলকণা ঘটে পূর্ণ করে মন্দিরে সংস্থাপনাই মূল সন্ন্যাসীর কাজ। গম্ভীরা মণ্ডপে পবিত্র ঘট বা ধর্মঘট স্থাপন

করার মধ্য দিয়ে প্রকৃত গম্ভীরার সূচনা। ঘটভরার দিন অন্য কোন অনুষ্ঠান পালিত হয় না। পরের দিন হয় ছোট তামাসা। এইদিন শিবমূর্তি ও লিঙ্গ পূজা করা হয়। সারা বছরের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং পরবর্তী বছরের জন্য সুখ সৌভাগ্য কামনা করে মানতসন্ন্যাসী বা বালকও শিবোপাসনা করে। নিরোগ দেহই কর্মের মূল উৎস। শিবোপাসনার গানে শিবের বহুরূপের বিচিত্র বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, 'জলবন্দ, স্থলবন্দ, বুড়াশিবের গম্ভীরা বন্দ। বাসুয়া বৃষ বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম।' শিবসংহিতার বৃষবাহন গম্ভীরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শিবকে আদ্য, শূন্য, সদাশিব, শিবঠাকুর, ধর্মনিরঞ্জন ইত্যাদি সম্বোধন করা হয়েছে। বৌদ্ধ, পৌরাণিক ও লৌকিক বহুবিধ উপকরণের সংমিশ্রণে গম্ভীরার গম্ভীরশিব গড়ে উঠেছে। গম্ভীরা উপলক্ষে যে লোকসঙ্গীত খণ্ড খণ্ড এবং কাহিনীবদ্ধভাবে মালদহে, দিনাজপুরে, রংপুরে শোনা যায় তা মূলতঃ কৃষি-জীবনকথাময়। সারা বছরের সুখ-দুঃখ, জীবনচক্র ও জীবনবিচিত্রার বাণী সুরের ও নাচের মাধ্যমে গম্ভীরায় প্রকাশ করা হয়। গম্ভীরার গানে ঐশীভাবনা বিরল। এ গান একান্তই বাস্তব জীবনমুখী। চলমান জীবনের, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার অনেক কথাও গম্ভীরার গানে (পুরুলিয়ার ও মেদনীপুরের টুসুর মত) প্রতিফলিত হয়েছে। মনে হয় কালের প্রবাহে মূল অভিপ্রায় থেকে গায়কেরা কতকটা সরে এসেছেন। শিবের জীবনবন্দনা যেখানে মুখ্য ছিল, সেখানে রাজনৈতিক চেতনা সম্পূর্ণ বিচিত্র উপকরণ। বোলবাই গানের মধ্যেও জীবনের বাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন ব্যাখ্যানে, সংলাপ ধর্মিতায় গম্ভীরাগান আলকাপের মত পালাধর্মী, নাট্যময়। শ্মশানচারী শিবের উদ্দাম নৃত্যই বড় তামাসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিবের সহচরও থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নৃসিংহ, কালীকাচ, বুড়াবুড়ি, কংকাল, পরী ও জন্তুজানোয়ারের মুখোস নৃত্যও দেখা যায়। এইগুলি মঙ্গোলয়েড জাতিসমূহের বৌদ্ধ বজ্রযানী ধর্মের প্রভাবে সৃষ্ট। গভীর রাতের অন্ধকারে স্তিমিত প্রদীপালোকে চলে বড় তামাসার সঙনাচ। নাচের তালে তালে বিকট শব্দ মন্দিরতল মুখর করে তোলে। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা উৎসবের মৃত্যু ও উজ্জীবনদ্যোতক নৃত্য-গীতগুলিই, 'মিরাকল' বা 'মিষ্ট্রি প্লে'গুলির উৎস। তিব্বতের 'ডেভিল ড্যান্স' এই রকম একটি 'মিরাকল প্লে'। বড় তামাসার তামসিক আচারের মধ্যে মশাল নাচ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মরার মাথার করোটি বা খুলিতে সন্ন্যাসীরা আসব সেবন করে নৃত্য করেন।

প্রায় সত্তর বছর আগেকার কথা। মালদহের কলিগাঁর গম্ভীরা বাড়িতে কুমারী-বলিদেওয়ার রীতি ছিল। এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। তার পরিবর্ত হিসেবে নরমুণ্ড

নৃত্যের প্রচলন হয়েছে। তাজা নরমুণ্ড না পেলে বাসিমুণ্ড অথবা শ্রীফল হাতে নিয়ে নাচ করার রীতি আছে। ধর্মের ও শিবের চড়কানুষ্ঠানে বা গাজনে নরমুণ্ড নৃত্যের প্রচলন আছে বাংলা দেশের প্রায় সব প্রান্তে। সুতরাং এই নরমুণ্ড নৃত্য এই কথাই প্রমাণ করে যে একদিন নরমুণ্ড অত্যন্ত অপরিহার্য ছিল বাংলার ধর্ম, শৈব ও সূর্য উৎসবে। আদিম, আদিবাসী, লোকায়ত সংস্কৃতির ত্রিধারায় সেই স্মৃতিচিহ্ন আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এখন কোথাও জীবজন্তু বলি দেওয়া হয়, আবার কাথাও ফল বলি দেওয়া হয়। দুর্গাপূজার কুভবলি, পাঠাবলি, সাঁওতালদের সিংবোঙাকে পায়রা বলি দেওয়ার প্রথা প্রাচীন নরবলির প্রত্যক্ষ স্মৃতিবহ।

চড়কের যে অনুষ্ঠান গম্ভীরায় হয় তা ধর্মের চড়কের অনুরূপ। বাণফোঁড়া চড়কের প্রধান অনুষ্ঠান। বাণ বা শলাকা বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন জিভবাণ, কপালবাণ, অগ্নিবাণ পিঠবাণ এবং পার্শ্ববাণ। চড়ক সন্ন্যাসীরা বাণবিদ্ধ করে নিজেদের দেহে। এতে সংযম ও সহিষ্ণুতার চরম পরীক্ষা হয়। এই বাণফোঁড়া আকুপাংচারের সমতুল্য আদিম স্নায়ু শল্য চিকিৎসা পদ্ধতি। এই বাণ ফোঁড়ার ফলে যে রক্তপাত হয়, তা নরবলির বিকল্প হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বাণের পরিবর্তে সন্ন্যাসীরা বেলকাঁটা শরীরের বহুস্থানে বিদ্ধ করে নাচ করেন। বেলকাঁটায় আবার জবাকুসুম সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। জবাকুসুমের রক্তিমতায় রক্তদানের পূর্বস্মৃতি এক চরম শিল্পসুষমার মধ্য দিয়ে আজও পালন করা হচ্ছে কণ্টকশয্যা বা কাঁটা ঝাঁপ যোগ ও জাদুর যোগফল।

বাংলা দেশের অধিকাংশ উৎসবকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক মেলা বসে। মেলার অর্থ মিলন। সমগ্র ভারতে মেলার এক বিশিষ্ট স্থান আছে সামাজিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে। ভারতীয় সমাজসংহতি ও ঐক্যের ক্ষেত্রে মেলা এক মৌলিক উপকরণ। সংহত সমাজই লোকায়ত সংস্কৃতির মূল ভিত্তিভূমি। মেলা বা মিলনধর্মী অনুষ্ঠান শুধু লোকায়ত স্তরে সীমিত ছিল না। প্রাচীন ভারতে এর বহুমাত্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিককালে যজ্ঞ মূলত দেববন্দনা, উপনিষদে মানবকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে ঘোষণা, রামায়ণের যুদ্ধবিজয়োল্লাসজনিত আনন্দমিলন, মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞ, হরিবংশে জলকেলি উৎসব, শিবসংহিতায় শিবোৎসবে দেবারাধনা, বৌদ্ধদের সঙ্ঘারাম মন্ত্র: 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি', বিক্রমাদিত্যের যুগে বৌদ্ধ শোভাযাত্রা, পালরাজত্বে বাংলার ধর্মমহোৎসব ও শোভাযাত্রা, শ্রীচৈতন্যের সপারিষদ লীলা ও যাত্রা, গাজনের সন্ন্যাসী মিলন, গম্ভীরার মিলন মহোৎসব, শিবযজ্ঞ, ধর্মযজ্ঞ এবং দুর্গোৎসবের বিজয়াদশমী ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের একতা এনে দিয়েছে। বহুজাতিক মানবতীর্থ ভারতে একতার

রাখীবন্ধন করেছে। বাংলার গাজন ও চড়কের মেলায়ও সেই প্রাচীন ঐতিহ্য সমানে চলেছে।

এমন কি একান্ত লৌকিক পর্যায়ে মেদিনীপুর, ঘাটাল, হুগলী, আরামবাগ প্রভৃতি অঞ্চলের 'সয়লা', 'টুসুপরবের', 'সই পাতানো', মিতালির উৎসব বলেই পরিচিত। পৃথিবীর সব প্রাচীন দেশেই এই ধরনের মিতালির উৎসব রয়েছে। সামাজিক ঐক্য মানসিক সমাজ বন্ধনে এই উৎসবগুলির সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। এদের উজ্জীবন জাতীয় সংহতিকে দৃঢ়তর করবে।

পশু-প্রাণী

সংস্কৃতির ঐতিহাসিকগণ মনে করেন খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের পূর্বেই বাংলাদেশে সর্পপূজার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। এই শতকের বাংলা দেশের ভাস্কর্যে মনসামূর্তির অস্তিত্ব থেকেই এই ধারণা সত্য বলে মনে হয়। আরও উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অসংখ্য মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। বেহুলা-লখিন্দরের ভাসানপালা, বিষহরির গান, মনসার গান, মনসার লাচান, ঝাঁপান প্রভৃতি বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত আছে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের শুক্লাপঞ্চমী ও সংক্রান্তিতে মনসার পূজা হয় বাংলা দেশে। সাপ, সিজ্‌মনসা গাছ আর দেবী মনসা এক অজ্ঞাত রহস্যে এক হয়ে গেছে। সর্প পূজা যে আদিম কৌম সমাজের সৃষ্টি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ বৈদিক 'সাহিত্যে-শিল্পে সর্পপূজার কোন উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' 'সর্পরাজ্ঞী' কথার উল্লেখ আছে। সেখানে সর্পরাজ্ঞী ও পৃথিবী সমার্থক।

সিজ্‌মনসার সঙ্গে সর্পের এক ভাবানুষঙ্গ অথবা পূজার স্মৃতি বাংলা দেশে কোন এক সময়ে অন্বিত হয়ে পড়ে। ফলে বৃক্ষ ও সর্প এক হয়ে মনসাদেবীতে রূপান্তরিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সিজ্‌মনসার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যেমন, 'উত্তরপ্রদেশে সেহুণ্ড, থুহর ও সীজ এবং বোম্বাইয়ে নিবডুঙ্গ বা থোর বলে। গুজরাটে থোরডাং, ডলিয়ো কটালী, হাতলোতর থারী, নানো পরদেশী; মহারাষ্ট্রে নিবডুঙ্গ, কাংটে নিবডুঙ্গ, কনীচেং-নিবডুঙ্গ, বিকাংডী; কর্ণাটে নিবডিংগু, তৈলঙ্গে চেংমুড় বলে।[১] বাংলা দেশে বলে কণীমনসা বা সিজ্‌মনসা। এর ইংরেজী নাম 'Cactus-Indianis'; মনসার আর এক নাম 'চেংমুড়ি'। আমেরিকার পুব্‌লো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে 'ক্যাকটাস্' অতি পবিত্র তরু বলে বিবেচিত। বিশেষত

১. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস: (৩য় সংস্করণ) / ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য / পৃঃ ১৭৩

ক্যাক্টাসের সর্পিল অপুষ্পক বর্ধিতকাণ্ড সর্পের আকৃতির সঙ্গে একটা সাদৃশ্য কল্পনার মধ্যদিয়ে সর্প ও সিজমনসা এক হয়ে গেছে। বৃক্ষলতা, তরু বাংলার দেব-দেবীরা প্রচুর ব্যবহার করেছেন। যেমন লক্ষ্মীর ধানের ছড়া, মনসার সিজ্‌মনসা, দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা বা কলাবৌ। বাংলা দেশে মনসা লৌকিক দেবতা। বিষ্ণুপুরের ঝাঁপান উৎসব মনসা পূজার একটি অঙ্গ। রাঢ়দেশে এর ব্যাপক প্রচলন আছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে বলছেন: 'আষাঢ়েতে হব নাগপঞ্চমীর পূজা। ঝাঁপান করিব যত ঝাঁপানিয়া ওঝা।' বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলায় এখনও প্রতি বছর মনসার ঝাঁপান হয়। বিষবেদেরা বিষ্ণুপুরে মহাসমারোহে ঝাঁপান উৎসব করেন। চতুর্দোলায় জ্যান্তসাপের মিছিল ভক্তদের শিহরিত করে। মাটির বাঘের পিঠে বসে ঝাঁপান খেলা এখানকার বৈশিষ্ট্য। আসাম ও বাংলার মত তান্ত্রিকভাবাপন্ন দেশে মন্ত্র-তন্ত্র, জলপড়া, তুকতাক ওঝার মন্ত্র ইত্যাদি সর্পবশীকরণের এক আশ্চর্য পদ্ধতি। মেঘালয়ের আদিবাসীরা সাপপূজা করেন। সুন্দরবন ও ছোটনাগপুরের ওরাওঁরাও সাপ পূজা করেন। চেরাপুঞ্জীতে খাসিয়ারা প্রতিবছর এক বিশালাকায় সাপের সামনে নরবলি দিয়ে থাকেন।[১] নররক্ত উর্বরতার সহায়ক—এটাই আদিম বিশ্বাস। সাপকে যৌন-প্রতীক কল্পনাও করা হয়। উভয়ের সমন্বয়ে কৃষিজীবী খাসিদের ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে—এটাই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বীরভূমে হাড়ি, ডোমেরা বার্ষিক সাপ পূজা করেন। জেলেরাও সাপ পূজা করেন। মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ী অঞ্চলে "সাপবন্ধ" অর্থাৎ সাপ যাতে ঘরে ঢুকতে না পারে এমন একটি অনুষ্ঠান মেয়েদের করতে দেখেছি। জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম দিকে এই অনুষ্ঠান ঐ অঞ্চলে মেয়েরা করেন। গোবর দিয়ে তারা ঘরের চারদিক লেপে দেন। তারপর তরল পিটুলি ঘরের আঙিনায় ছড়িয়ে দেন। সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা 'সাপবন্ধের গান' করেন সমবেতভাবে। এদের বিশ্বাস সাপ আর তাদের ঘরে প্রবেশ করবে না, তাদের কামড়াবে না। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরাও 'বিষহরির পালা'র মধ্য দিয়ে সর্প বন্দনা করেন। তাদেরও বিশ্বাস সাপের দেবী মনসা তুষ্ট হলে সাপ আর ক্ষতি করবে না। এর পেছনে যাদু বিশ্বাস সক্রিয় রয়েছে বলে মনে হয়। বাংলা দেশে মনসাপূজার বা সর্পপূজার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় প্রতি বছর 'নাগপঞ্চমী' আষাঢ়-পঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীহট্টে মনসার সঙ্গে 'অষ্টনাগ' পূজাও করা হয়। অষ্টনাগ হচ্ছে অনন্ত, বাসুকী, পদ্ম, মহাপদ্ম, যক্ষ, কুলির, কর্কট

---

১. Man in india. Vol ; VII / 1927 / P. 54.

এবং শঙ্খ। এদের 'নাগবীর'ও বলা হয়। বাংলা দেশে মনসা পূজায় পশুবলি প্রথা প্রচলিত আছে। শ্রাবণ সংক্রান্তিতেই ছাগ, হাঁস বা শ্বেতপায়রা বলি দেওয়া হয়। চেরাপুজীতেযে নরবলির কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে পশুবলির গভীর সংযোগ রয়েছে। নরবলি যে সমাজে নিষিদ্ধ হয়েছে আইনের বলে, সেখানে পশুবলি বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। গাজন, গম্ভীরা, ধর্মোৎসব প্রভৃতিতে একই রীতি অনুসৃত হয় এই রীতিগুলি আদিম উর্বরতাবাদের অন্তিম লোকস্মৃতি।

সর্পপূজা প্রসঙ্গে বাংলাদেশে বহু কাহিনীর ও কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। চাঁদ-সদাগর, মনসা ও বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী মনসা মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। মনসা বা সর্পপূজার জনপ্রিয়তা না থাকলে এতগুলি মনসা মঙ্গলকাব্য রচিত হত না এবং মনসার ভাসান ও বিষহরির লাভান, ঝাঁপান পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে রচিত এবং গীত হত না। 'খৃঃ ত্রয়োদশ শতকে বাংলা মঙ্গলগানে 'বেহুলা-লখিন্দরের' কাহিনী সর্বপ্রথম প্রচলিত হয় বাংলাদেশে।[১]

'নাগপঞ্চমী' শুধু বাংলাদেশে নয়, নেপালেও শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশেও নাগপঞ্চমী মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। বেহুলার পতি প্রেমের উপাখ্যান মেয়েরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ ও শ্রবন করেন। 'মনসার ব্রতে'ও অনুরূপ ভাবে বেহুলা উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করা হয়। ধনৈশ্বর্য কামনা এই ব্রতের মূলকথা। চাঁদবেনের ও বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক প্রচলিত হয়েছিল মধ্যযুগে। দৈব ও পৌরুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং অবশেষে দৈবশক্তিরনতিস্বীকার ও মানুষের অপরিমেয় মহিমা মনসা-মঙ্গলকাব্যের মর্মবাণী। মানবশক্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী মনসা মঙ্গলকাব্যে আমরা লক্ষ্য করেছি। বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিশেষতঃ ২৪ পরগনা জেলায় বহু স্থানে 'মনসাবাড়ি' দেখা যায়। কোথাও চতুর্ভুজা সর্প বিভূষিতা শ্বেতহংসবাহনা মনসার মৃন্ময়ী মূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে সমস্ত মন্দিরে নিত্য পূজাও করা হয়। আবার শ্রাবণ মাসে বার্ষিক উৎসবও করা হয়। বর্ধমান জেলার পানাগড় অঞ্চলে বেহুলা নামে এক মরা নদী আছে। কিম্বদন্তী, সে নদীর নাম মনসামঙ্গলের বেহুলার নামানুসারে হয়েছে। সেখানকার লোকের ধারণা চাঁদ সদাগরের রাজবাড়ি বেহুলার নদীর তীরে অবস্থিত। বর্ধমান জেলার এই অঞ্চলটি বিপুল সর্প অধ্যুষিত। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে এখানে মনসার ভাসান উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে।

পাঞ্জাবের অধিবাসীরা সর্পকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন। এমন কি কোন

---

১. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সংস্করণ): ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃ. ২২০

সর্পের মৃত্যু হলে, তাকে খঞ্জুরীয়া আচ্ছাদন করে দাহ করা হয়। বাংলাদেশের শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামে অনুরূপ ভাবে মৃত সর্পকে দাহ করার রীতি আছে। সাপ মেরে ফেলে দিলে ঐ সাপ পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। অতএব সাপকে দাহ করাই শ্রেয়। সাপ বাংলা দেশের কোন আদিবাসীর 'টোটেম' বা কৌল চিহ্ন ছিল বলে বিশ্বাস। 'নাগ' উপাধি এই ধারণার সত্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

লৌকিক দেবতা মনসা বহুরূপা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বীরভূম অঞ্চলে দ্বিবিধ মনসা পূজা দেখেছেন। যেমন, (এক) দাঁওডালে মনসা, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এর পূজা করা হয়। (দুই) ভাদুলে মনসা—ভাদ্র সংক্রান্তিতে এর পূজা করা হয়। সাপের ফণাবিশিষ্ট মৃন্ময় মূর্তি ছাড়াও বাংলাদেশের বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ঘটে মনসামূর্তি আঁকার রীতি আছে। ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত অঞ্চলে বাংলাদেশের উদ্বাস্তুরা মনসার ঘট ও ফণা দুটোই পূজা করেন। পশুবলি প্রথা এই সব অঞ্চলেও প্রচলিত আছে।

অনেকে বৌদ্ধ 'জাঙ্গুলী দেবীর' সঙ্গে বাংলাদেশের মনসার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। বজ্রযানী বৌদ্ধরা 'জাঙ্গুলী দেবী'র পূজা-সাধনা করতেন। সর্পদংশনের হাত থেকে এই দেবী রক্ষা করতেন। কিংবদন্তী আছে যে 'জাঙ্গুলীর' নাম শুনলে সাপ পালিয়ে যেত। বাংলাদেশের অধিবাসীদেরও ধারণা 'মনসা' বা তৎপুত্র আস্তিকের নাম শুনলে সাপ পালিয়ে যায়; কোন অমঙ্গল করতে পারে না। জাঙ্গুলী দেবীর মূর্তিরূপ ছিল এই রকম: "শুক্ল মূর্তিতে জাঙ্গুলী একমুখী ও চতুর্ভুজা, সৌম্যামূর্তি ও শ্বেত সর্পের অলঙ্কারে বিভূষিতা। ইনি দুইটি প্রধান হস্তে বীণা ধারণ করেন, দ্বিতীয় দক্ষিণ করে অভয় মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং দ্বিতীয় বাম করে একটি শুক্লসর্প ধারণ করেন।"[১] বাংলাদেশে মনসার মূর্তি কোথাও চতুর্ভুজা আর কোথাও দ্বিভুজা। ঘটে, পটে মূর্তিতে সাধারণতঃ দ্বিভুজা মূর্তিই দেখা যায়। মৃন্ময় মূর্তিতে চতুর্ভুজা মনসাও দৃষ্ট হয়। শ্বেতহংসবাহনা মনসা মূর্তি ২৪ পরগনার বিভিন্ন গ্রামের মনসাবাড়িতে দেখেছি। শ্বেতসর্প হাতে বিরলদৃষ্ট। ডান হাতে সিজ মনসার ডাল এবং বাম হাতে সর্প, পাশে দু'জন সহচরীও দেখা যায়। জাঙ্গুলী ও মনসার মূর্তিগত এবং গুনগত সাদৃশ্য রয়েছে। মূর্তি প্রকরে তান্ত্রিকতার প্রভাবের ফলে বাংলা দেশে জাঙ্গুলী ও মনসা একই রূপের এপিঠ ও ওপিঠ। কিন্তু সর্প ও সিজমনসার ডালের সঙ্গে জাঙ্গুলীর কোন সম্পর্ক নেই। বাংলা দেশে মনসা প্রকরের বিবর্তনে সর্প ও সিজমনসা আদিম এবং মৌলিক পশু ও তরু

---

১. বৌদ্ধদের দেব-দেবী / শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য / পৃ. ৭৪

বিগ্রহ। কালক্রমে ধর্ম অধিমানসিকতার প্রভাবে মানুষী মূর্তি(Anthropomorphic figure) গড়ে উঠে। বাংলার অন্যান্য লৌকিক দেব-দেবীর ক্ষেত্রেও একথা প্রয়োগ করা চলে। সার্বজনীন জনপ্রিয়তার জন্য মনসা বাংলার সর্বপ্রান্তে পূজিতা হন প্রতি বছর। পক্ষান্তরে জাঙ্গুলী দেবী বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোক সমাজের অন্তরালে হরিয়ে গেছেন। এখন শুধু ইতিহাসের সামগ্রী।

সর্প ও মনসা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে জীব-জন্তু বন্দনার একটু পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাংলা দেশের লৌকিক দেব-দেবীর মূর্তি প্রকল্পের আলোচনা করলে দেখা যাবে আদিম সমাজের 'টোটেম রূপী' জীবজন্তু গুলি আমরা পরিত্যাগ করতে পারিনি। সর্বপ্রাণবাদ ও যাদু, প্রজননবাদ বাংলার লৌকিক ধর্মের উৎস। ফলে সমগ্র দৃশ্য প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ আমাদের মানস লোকে এক সশ্রদ্ধ আসন লাভ করেছে। এক অসীম মমত্ববোধ, এক গভীর প্রেমানুভূতি, এক অনন্তদৃষ্টিবিলাস এবং জীবন রসবোধ বাঙ্গালীকে করেছে প্রেমিক, সাধক ও ভাবুক। এর মূলে রয়েছে বহু জাতির রক্তের ও সংস্কৃতির অবদান। দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, নিগ্রিটো এবং মঙ্গোলয়েড এই চতুরঙ্গ রক্তধারার সঙ্গে মিশেছে আর্য-শোণিত। তৈরী হয়েছে বাঙ্গালী জাতি এবং গড়ে উঠেছে বাংলার আধ্যাত্মিক, বাস্তব, মানসিক সংস্কৃতি। প্রত্যেকটি ধারার অণু ও পরমাণু বিশ্লেষণ আজ দুঃসাধ্য। একে অন্যের গভীরে এত নিবীড়ভাবে মিশেছে যে বহু জাতিবিদ্যার ফলিত প্রয়োগে বিশ্লিষ্ট করাও দুঃসাধ্য।

গরু, বাঘ, সিংহ, হাতী, ঘোড়া, শৃগাল, পেঁচা, কূর্ম, হংস, ময়ূর, ইঁদুর, সাপ ইত্যাদি বাংলার অতি পরিচিত প্রাণী। অরণ্য, নদ-নদী, পাহাড় ইত্যাদির বৈচিত্র্যের ফলে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই জীব-জন্তুগুলির অবাধ প্রবেশ ঘটেছে। মহাকাব্যের যুগ থেকে ভারতে এই জীবজন্তুগুলি জীবনের ফলিত ক্ষেত্রে এবং অধিমানসিকতার বিশেষ আসন পেয়ে আসছে। চর্যাপদে শবর জাতির টোটেম রূপে ময়ূরকে পাওয়া গেছে। গরু হিন্দুদের পরম উপাস্য। গোমাংস তাই বেদোত্তর কালে হিন্দুদের কাছে 'ট্যাবু', গোবন্দনাসূচক বহু অনুষ্ঠান বাংলা তথা ভারতে অনুষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে 'গোপাষ্টমী' ও 'বন্দনা পরব' বা বাঁধনা পরব অন্যতম। নান্দী বৃষও শিব-বাহন হিসেবে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন পেয়েছে ভারত বর্ষে। বৃষকে সূর্য প্রতীকও বলা হয়।[১] গ্রীক উদ্ভিদ দেবতা ডাইওনাইসাসকে

১. 'The bull, because of his strength, his energy, and above all, his sexual virility, was everywhere considered to be a fitting representative of the masculine creative force, of fertility, of reproductivity. In all lands he was the personification of the primitive and basic Sun god". Encyclopoedia of Religion and Ethics / Vol V / James Hastings (Ed).

বৃষরূপেও বর্ণনা করা হয়। গ্রীসে শস্যের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য বৃষবলি দেওয়া হত। অনাবৃষ্টির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যও বৃষ-বলি দেওয়া হত। ডাইওনাইসাস শিবের মত কৃষি-দেবতা। বৈদিক দেব-দেবীগুলি মূলতঃ নিসর্গ মূল ও স্বর্গীয়। শিকার জীবন থেকে কৃষি-জীবনে স্থায়ী বিবর্তনের পথে আদিম মানুষ কৃষিজাত উদ্ভিদ ও বৃক্ষের সঙ্গে তার 'টোটেম' ও সামাজিক 'ট্যাবু'কে একাত্ম করে নেয়। বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের একাত্মতা এই সূত্রেই ঘটেছে বলে মনে হয়। বৃষ, মহিষ, ছাগ, সর্প প্রভৃতি উদ্ভিদ দেবতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে দৈবসত্তায় রূপান্তরিত হয়। দুর্গার বাহন সিংহ কোন 'সিংহ উপজাতি'র টোটেম দেবতা বলেই বিশ্বাস। 'সিংহ' পদবী সেকথা প্রমাণ করে। 'মহিষ'ও তাই। 'সিংহ' ও 'মহিষ' 'ক্ল্যানে'র মধ্যে সংঘর্ষই দুর্গার মূর্তি পরিকল্পনার নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য। পরবর্তীকালে নানা কাহিনী আর উপকরণ এতে মিশে গেছে। এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য না হ'লেও এর মূলে এক ভয়ঙ্কর সামাজিক সংঘর্ষ রয়েছে। সেটা জাতিগতও হতে পারে, আবার আর্য-সাংস্কৃতিকও হতে। শিকার জীবনের সঙ্গে কৃষি জীবনের সংঘর্ষও হতে পারে।

প্লেইসটোসীন কালে যে সমস্ত প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল তাদের মধ্যে হায়না, শূকর গবাদিপশু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মধ্য প্লেইসটোসীন কালে ভারতে যে সমস্ত প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রাপ্তি হলো সিংহ। (panthera of leo) অন্ধ্রপ্রদেশের কারনুল গুহায় সিংহের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এ ছাড়া বাঘ (panthera of tigris), গবাদিপশু, ছুঁচো, ইঁদুর, শজারু ইত্যাদি প্রাণীই বেশি পাওয়া গেছে। পশ্চিমবাংলার গিরি উপত্যকা ও পার্বত্য নদীর দু'পাশে যে একদা উপলাস্ত্র নির্মাণ করার ক্ষেত্র ছিল তার সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার প্রত্নাশ্মর সংস্কৃতির যে সংযোগ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, পুরা প্রস্তর যুগের সভ্যতার তীর্থ। এখানেই প্রাচীন বনচারী মানুষের বাস একদিন ছিল।

আদিম মানুষ একই সঙ্গে জীবজন্তুকে শ্রদ্ধা ও হত্যা দুইই করত। 'টোটেম' প্রাণীকে পূজা করত আর যে সমস্ত প্রাণীকে জৈব প্রয়োজনে হত্যা করত তাদেরকেও তারা পূজা করত। এই মানসিকতায় স্ববিরোধ থাকলেও এটাই সত্য। আমাদের ধর্মমানসিকতাকে এই স্ববিরোধী চেতনাই নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং আজও করছে। বিভিন্ন দেব-দেবীর কাছে নিবেদিত পশুকে উৎসর্গ ও মন্ত্র বারিপূতঃ করা ভারতীয় হিন্দুদের এক আদিম শাস্ত্রশাসিত আচারের সংক্রমন মনে হয়।

উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের টোটেম জন্তুকে হত্যা করে না,

বরং পূজা করে। দক্ষিণ ভারতের টোডারা মহিষকে পবিত্র প্রাণী জ্ঞান করে। পক্ষান্তরে চট্টগ্রামের মুসলমানেরা 'উরস' নামক পরবে প্রচুর মহিষ, উট বলি দেয়। হিন্দুরা বিভিন্ন দেব-দেবীর কাছে মহিষ, ছাগল বলি দেন। জাতিগত এবং সংস্কৃতিগত তারতম্যের জন্য এই ধরনের উৎসব বিচিত্রা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যায়।

সুন্দরবনের 'দক্ষিণরায়ের' বাহন বাঘ, তিনি ক্ষেত্রপাল দেবতা। বনগামী শিকারী ও কাঠুরেরা নদী ও সমুদ্রগামী জেলে ও নাবিকেরা সমানভাবে বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের পূজা করেন। বাংলাদেশে বাঘের দেবতাকে বলে 'বাঘাই'। খুলনা-যশোহর অঞ্চলেই 'বাঘাই' দেবতার পূজা সমধিক। পৌষ-মাঘ মাসেই 'দক্ষিণরায় ও 'বাঘাই' দেবতার উৎসব হয়। এই দেবতাদের তুষ্টির জন্য পশুবলি দেওয়া হয়। 'বাঘের বয়াত' নামে এক ধরনের ছড়া মুসলমান গায়কেরা গেয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গে বাঘ-বাহক দেবতা হলেন 'সোনারায়'।

বাংলাদেশে সাপের পরই গরু বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করেছে। মেদিনীপুরে 'গো বন্দনা' একটা বিশিষ্ট লোকোৎসব। বীরভূমে 'গোপাষ্টমী', পুরুলিয়ায় 'গোপালন' বা 'গো-পরব' বিশেষভাবে কার্ত্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় চৈত্রসংক্রান্তিতে 'গোস্নান' পরব অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে বাংলার মেয়েদের 'গোকাল ব্রতের' উল্লেখ করা যায়। গোকাল ব্রত চৈত্র মাসের চড়ক সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। সংক্রান্তির দিন সকালে গরুকে নদীর জলে স্নান করিয়ে দিতে হয়। স্নানের পূর্বে শিঙে সরষেতেল মাখানো এবং কপালে হলুদ, সিন্দুর ও চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয়। চার পায়ে তেল-হলুদ দিয়ে তারপর জল দিয়ে ধুইয়ে দিতে হয়। মেয়েরা শাড়ির আঁচল দিয়ে গরুর পা মুছিয়ে দেয়। চিরুনী দিয়ে মাথা আঁচড়িয়ে দেওয়ার পর একটা আরশি গরুর মুখের সামনে মুখ দেখার জন্য ধরা হয়। গরুকে মানুষের মত যত্ন করা এই ব্রতের লোকাচার। এই স্নান ও প্রসাধন পর্ব শেষ হলে কয়েক আঁটি দূর্ব্বা ঘাস ও একটি কলা গরুকে খাওয়ানোর রীতি আছে। কুমারী মেয়েরা গরুর কাছে প্রার্থনা করে: 'গো-কল গোকুলে বাস গরুর মুখে দিয়ে ঘাস। আমার যেন হয় স্বর্গে বাস।' গরু যেন স্বর্গীয় দেবদূত: গো-বন্দনায় যেন 'স্বর্গবাস' হয়—এটাই নারীদের কামনা। গো ও ব্রাহ্মণ একদা সাধারণের কাছে স্বর্গীয় দেবতুল্য বিবেচিত হত।

মেদিনীপুরে কার্ত্তিক মাসে 'বন্দনা' (গরুর) পরব হয়; বিশেষতঃ লোধা, কোরা এবং মাহাতো, কুর্মিরাই এই উৎসব পালন করেন। এই উৎসব কৃতজ্ঞতা সূচক উৎসব বলে মনে হয়। কিন্তু গরু উপাস্য বলে 'টোটেম পূজাও বলা চলে।

গোবন্দনা পরবের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানকে বলে 'জাগান'। রাখাল বা গোয়ালারা নাচ-গানের মধ্য দিয়ে গরুকে জাগায় বলে একে জাগান বলা হয়। এর অর্থ গরু-জাগরণ। দ্বিতীয় দিনে 'চুমন' বা 'চুমন' গরু ও বাছুরকে চুমন করা হয়। গরু-বাছুরকে ফুলমালা দিয়ে সাজানো হয়। কপালে ও শিঙে সিঁদুর লেপে দেওয়া হয়। তৃতীয় দিনে যে অনুষ্ঠান হয় তাকে বলে 'নাচন'। ফুলমালা পরিয়ে গরুকে মুক্ত মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। ধামসা, মাদলের তালে তালে চলে নাচ আর গান। গানগুলো মূলতঃ গো-বন্দনাসূচক। কিছু কিছু গানে তাদের সুখ-দুঃখ ও সামাজিক চিত্রও পরিস্ফুট হয়। বাড়গ্রামের লোধারাও 'গো-বন্দনা পরব' পালন করেন। গোয়াল ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সন্ধ্যায় প্রদীপ ও ধূনা দেওয়া হয়। গোয়ালঘর পরিষ্কার করে সেখানে ফুল-মালা দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়। এই উৎসব গো-কল্যাণমূলক। উপকারী জীবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য গো-বন্দনা করা হয় বলে এটা কৃতজ্ঞতা সূচক উৎসব। গোপাষ্টমীতে 'রাখালিয়া গান' প্রাধান্য লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণের 'গোষ্ঠলীলা ও গোপাষ্টমীর' সঙ্গে এক হয়ে গেছে। পৌরাণিক উপকরণ 'গোপাষ্টমীকে' বিশিষ্টতা দান করেছে বটে, লোকায়ত 'রাখালিয়া গান' বা উত্তরবঙ্গের 'মৈষাল গান' একান্তভাবেই প্রেমসঙ্গীত এবং বিরহানুভূতির পরিচায়ক। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রাখালিয়া প্রেমসঙ্গীত ও উপাখ্যানের প্রবর্ধিত রূপমাত্র। লোকায়ত ধ্যান-ধারণা ভারতীয় চিরায়ত সাহিত্য ও শিল্পকে অসংখ্য উপকরণ যে দান করেছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কৃষি : শস্য উৎসব :

বৈদিক যুগে আর্যদের মুখ্য উপজীবিকা ছিল কৃষিকাজ ও পশুপালন। বৈদিক আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিল ধান ও যব। ধান ও ধান্য শব্দটি ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তে উল্লিখিত হয়েছে। আর্যরা বৃত্রকে ধ্বংস করার জন্যই ইন্দ্রকে বন্দনা করেছিলেন। বৃত্র হলো অনাবৃষ্টির অধিদেবতা, অসুর। বৃত্রকে বাধা দেওয়ার জন্য পাঞ্জাবের সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বজ্রসহ প্রবল বৃষ্টিপাত করাতেন ইন্দ্র। বর্ষার প্রধান শস্য হলো ধান। ইন্দ্র-বৃত্র সংঘর্ষে যাঁরা ইন্দ্রকে সহায়তা করেছিলেন তাঁরা হলেন—বিষ্ণু, সূর্য ও রুদ্র।

একদা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর তীরেই আর্যরা বসবাস করতেন। নদীর জলধারা ও বর্ষার জলধারাই ছিল আর্যদের কৃষিকাজের প্রধান সহায়। আর্য-কৃষি বিস্তারে সরস্বতী নদীর জলধারার ভূমিকা ছিল বহু ব্যাপক। বৃত্র তথা অনাবৃষ্টিকে সরস্বতী নদীই প্রবল প্রতিরোধ দান করেছিল। আর্যরা তাই সরস্বতীকে বলেছেন :

'কৃষ্যী' [ঋগ্বেদ: ৬ষ্ঠ মণ্ডল/৬১/৩—১৪]। অবশ্য ভারতে কৃষি সভ্যতার সূত্রপাত কর অরণ্যে। আশ্রম সন্নিহিত বনৌষধি চাষ এর উৎস।

মহাকবি কালিদাস তাঁর ঋতুসংহারে প্রকৃতি বন্দনা প্রসঙ্গে একাধিকবার বাংলার প্রিয় শালিধানের উল্লেখ করেছেন। শরতের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে মহাকবি বলেছেন: 'প্রপক্বশালিরুচিরা'। কলভারানত ধানগুচ্ছকে বলেছেন: 'আকম্পয়ন্ কলভারানত শালি জালা'। 'মেঘদূতে' ও 'রঘুবংশে', 'মালবিকাগ্নিমিত্রেও' বৃষ্টি ও বর্ষা, শস্য ইত্যাদির উল্লেখ আছে। প্রায় চার হাজার বছর আগে গাঙ্গেয় সমভূমিতে চাষাবাদ হয়েছিল। বর্তমান পৃথিবীতে ভারত, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যে এখন ধানের চাষ প্রচলিত আছে। বাংলা দেশে কৃষির উৎপত্তি হয়েছে নব্যপ্রস্তর যুগের শুরুতেই। (৩০০০—২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদি অস্ট্রেলীয়দের কাছ থেকে বাঙালীরা চাষ-বাস শিখেছেন। কৃষির প্রবর্তন বিশ্বের বৈপ্লবিক ঘটনা।[১] কৃষির দেশ বাংলা। কবি গেয়েছেন: 'আমার সোনার বাংলা তোমায় আমি ভালবাসি'। ভালবাসার মত দেশ বাংলা। এখানে সোনা ক্ষেতে-খামারে, পথে এবং পথের প্রান্তে। গানের সুরে মাতাল করে গ্রামের পথচারীকে। প্রকৃতির বৈচিত্র্য বিমুগ্ধ করে আগন্তুককে। চলনে-বলনে, আচার-আচরণে বাংলার মেঠো পথে এমন বিশিষ্টতা, এমন শান্তশ্রী সত্যিই একদিন অতুলনীয় ছিল। নানা কারণে পল্লীর শ্রী আজ ক্ষয়িষ্ণু। তবুও বাংলার আত্মার সম্পদ এখনও অমৃতের সন্ধান দেয়।

কুসুমের মাস বসন্ত, আর ফসলের মাস অগ্রহায়ণ-পৌষ। 'ঋতুণাং কুসুমাকর' আর 'মাসেষু মার্গশীর্ষ' বাংলার সামগ্রিক জীবনে বিশেষ অর্থবহ। ঋতুর পরিবর্তন জীবনের নবায়ণের সূচক। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নববর্ষ শুরু হ'ত অগ্রহায়ণ মাসে। সাম্প্রতিককালে বৈশাখে নববর্ষ শুরু হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এবং প্রয়োজনে এই পরিবর্তন ঘটে থাকে। গ্রামদেশে এখনও অগ্রহায়ণ মাসে নববর্ষ শুরু হয়।

একদিন বাংলার ঘরে ঘরে 'নবান্ন' ও 'তোষলা' বা তুঁষ-তুষলী ব্রত হ'ত।

---

১. The most profound revolution in human history, anthropologists have long felt, was the switch from hunting and gathering to farming. It was only after the transition thousands of years ago that wandering hunter—gatherers could settle down into villages and begin to develop true civilisation. '

—Science: 1982

The American Association for the Advancement of Science.

মাঠের সোনার ফসল ঘরে উঠছে—এই আনন্দে লোকসমাজ চঞ্চল হয়ে উঠত। নবান্ন শস্যোৎসব। এ যেন মাটি-ফসল-আর মানুষের একাত্মতার উৎসব। বাংলা দেশে দু'বার শস্য ঘরে তোলেন কৃষকেরা। একবার অগ্রহায়ণ-পৌষে আর একবার শ্রাবণে। প্রথমবার আমন ধান, দ্বিতীয়বার আউস ধান। বাংলাদেশের প্রধান ফসল হল আমন ধান বা হৈমন্তিক ধান। একদিকে পৌষের পাতা ঝরার শন্ শন্ শব্দ, আবার অন্যদিকে কৃষাণ-কৃষাণীর কণ্ঠে গান শোনা যায়: 'এসো পৌষ যেওনা। সোনার পৌষ যেওনা।' এ এক করুণ মিনতি। পৌষলক্ষ্মীকে মেয়েরা যেতে দিতে চায়না। তাঁরা যেন বলেন: 'যেতে নাহি দিব'। 'জন্ম' 'জন্ম' পৌষলক্ষ্মীকে তারা ঘরে বেঁধে রাখতে চায়। কিন্তু প্রকৃতি নির্মম। চলনশীলতাকে রোধ করা যায় না। সে এগিয়ে যায়।

অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতে মেয়েরা করে 'তোষলা'। 'নবান্ন', 'তোষলা', 'পৌষালী' প্রায় সমজাতীয়। শুধু একটু সময়ের হেরফের। পিঠে-পুলির পার্বণ পৌষালী বা পৌষ পার্বণ। নবান্নও তাই। নব-অন্নই নবান্ন উৎসব। এখানে ছোট-বড় বা জাত বিচার নেই। সবাই এক, অভিন্ন। ফসল আহরণ ও সঞ্চয়ের উৎসব নবান্ন; পৌষালী উৎসব। সুন্দরবনের ওরাওঁরা একে বলে "নওয়াখানি" (Festival of new rice), দক্ষিণভারতে নবান্নের মত একটি উৎসব প্রতিপালিত হয়। এর নাম: "পঙ্গল" (Pongal)। আসামে অনুরূপ একটি উৎসব হয়, তার নাম: 'মাঘবিহু' বা 'ভোগালিবিহু'।

নবান্নকে অনেকে বলেছেন—অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার উৎসব।[১] আশ্বিন সংক্রান্তিতে রাঢ় অঞ্চলের মেয়েরা 'গারুব্রত' নামে একটি ব্রতানুষ্ঠান পালন করে। কৃষাণী সংক্রান্তির দিন সকালে স্নানান্তে নতুন কাপড় পরে কাঁচা হলুদ বেটে সরষের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ধানের ক্ষেতে ছিটিয়ে দিয়ে বলেন: 'ধানরে ধান সাধ খা, পাক্যা ফুল্যা ঘরে যা।' বর্ধমান জেলার 'পৌষ আগলানো' উৎসবও অনুরূপভাবে কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জ্ঞাপন করে ক্ষেতের ধানকে—ফসলকে। অসীম মমত্ববোধে নিখিলবিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করাই প্রাণবাদের মূলকথা। বাংলার লোকায়ত আচার, ধর্ম এবং উৎসবের মূলে সর্বপ্রাণবাদ সক্রিয় রয়েছে।

---

১. 'The Navanna (New rice), a ceremony of first fruits, it performed after the harvest has been gathered, and is accompanied with Sradha and offerings to all creatures, birds of the air and beasts of the field. It serves the purpose of a thanksgiving service on one of the appointed days in the Calendar.': Batuknath Bhattacharya, The Cultural Heritage of India.

বাংলার প্রায় সমস্ত লোকসাহিত্য ও পূজাপার্বণ কৃষিকর্মকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে লক্ষ্মী কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেই পূজা পেয়ে আসছেন। লক্ষ্মীপূজা সাধারণতঃ মেয়েরাই করেন। বারমেসে লক্ষ্মীপূজা বৃহস্পতিবারে হয় বলে ওর আর এক নাম লক্ষ্মীবার। বৃহস্পতিবার ছাড়া যে সমস্ত লক্ষ্মীপূজা আছে তার মধ্যে পৌষ সংক্রান্তির লক্ষ্মীপূজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পূজা সারা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলেও মেদিনীপুরে এর একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত লক্ষ্মীপূজা মেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হলেও পৌষ সংক্রান্তির লক্ষ্মীপূজা মেয়েদের করণীয় নয়। পুরুষরাই এই পূজা করেন। পৌষ সংক্রান্তিকে এতদঞ্চলে মকর সংক্রান্তি বলে।

সূর্য ঐদিন ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে সংক্রমণ করে তাই এই নামকরণ। পূজার নৈবেদ্যে ঐদিন মকরের প্রাধান্যই বেশি। আতপ চাল, গুড়, কলা, রাঙাআলু, শাঁক আলু, নারিকেল, আদা ইত্যাদির সংমিশ্রণকে 'মকর' বলে। অনেক সময় আতপ চালের পরিবর্তে চিড়া ব্যবহার করা হয়। উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে দিবামানের বৃদ্ধি শুরু হলেও এই অঞ্চলে "মকর খেলে চকর বাড়ে" এই কথাটি প্রচলিত আছে। পৌষ সংক্রান্তি না গেলে মকর না খেলে যেন দিবামান বাড়বে না, এই ধারণা। ছোট বড় সমস্ত কৃষকের খামারে এই লক্ষ্মীপূজা-উৎসব হয়। খামারকে মেদিনীপুরে "খোলা" বলে, এইজন্য এর আর এক নাম "খোলা পূজা।" উৎসবান্তে পাড়া-প্রতিবেশী সকলের বাড়িতে মকর বিতরণ করা হয়। ঘর-দোর খামার-উঠোন সবই ঐদিন নিকিয়ে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে আলপনা দেওয়া হয়। ধানশীষ ও ধানের গাদা এই আলপনায় প্রধান স্থান পায়। দেওয়াল, দরজা, চৌকি, পিঁড়ি, ধামা, কুলো সবেতেই আলপনা দেওয়া হয়। ঘরের প্রবেশ-পথের আলপনাটি কেবল লক্ষ্মীর পায়ের ছাপের হয়। খামারের মাঝখানে যেখানটায় দাউন মাড়ান হবে, সেখানটায় একটি খুঁটি পোঁতে; খুঁটিটিকে কেন্দ্র করে আট-দশটি গরু বাঁধা যায় এইরকম লম্বা ব্যাসার্ধ নিয়ে, পিটুলি গোলা জল দিয়ে একটি বৃত্তরেখা টানা হয়। খুঁটি থেকে বৃত্তরেখা পর্যন্ত একটি দাউন আঁকে। দাউন বলতে দড়িটাতে আট-দশটা গরু বেঁধে দেয়, আর দড়িটি আটকে দেয় খুঁটিটাতে। এই খুঁটিকে কেন্দ্র করে, গরুগুলো ঘুরপাক খায়, সঙ্গে সঙ্গে খেনো বিচালী ছড়ান হয়। এইভাবে বিচালী থেকে ধান পৃথক করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে দাউন মাড়ান বলে। দাউন ও বৃত্তরেখার সংযোগস্থলে গোবর দিয়ে একটি 'বৃষভ' তৈরি করে দাঁড় করিয়ে দেয়। বৃষভটির পুচ্ছ করে দেয় একটি শাকসুদ্ধ মুলো দিয়ে। গোবরের বৃষভটিকে এতদঞ্চলের লোকেরা 'বাহুরা' বলে। বাহুরার পুচ্ছে মুলো দেওয়ার পর লোকে

আর মুলো খায় না। খুঁটিটিকে বলে 'মেহী'। আমার মনে হয়, 'মহী' শব্দ থেকে 'মেহী' শব্দটি এসেছে। মহীর মানে পৃথিবীর চতুর্দিকে 'বাহুরা' ঘুরে ঘুরে কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলছে।

মেহীর গোড়ায় ধামা, কুলো কুনকে প্রভৃতি যেগুলো ধান মাপা বা পরিষ্কার করার জন্ম প্রয়োজন হয় সেগুলো সব জড় করে। আর মেহীর গায়ে ঠেসান দিয়ে বেঁধে দেয় গুরুবাঁড়া আর ক্ষেত-ঝড়ানী। প্রথম ধান্ত ছেদনের দিন আড়াই মুঠো ধানগাছ দিয়ে যে আঁটি বাঁধা হয় তাকে বলে 'গুরুবাঁড়া'। ধান্ত ছেদনের শেষের দিন, আড়াই গোছ ধান দিয়ে যে আঁটি বাঁধা হয় তাকে বলে 'ক্ষেত-ঝড়ানী।' লোকে বলে এইভাবে ধান্ত ছেদন আরম্ভ ও শেষ করেছিলেন "ভীম"। অন্যান্ত পূজার পূজারীর মত পূজক 'গৃহ-কর্তা' ভাত না খেয়ে সেদিন ফলমূল খান। খোলা পূজার এই সমস্ত উদ্যোগপর্ব সন্ধ্যার পূর্বে ঠিক করে রাখে।

এর সমস্ত আয়োজন লক্ষ্মীপূজার মত এবং এই পূজাকে পৌষ-সংক্রান্তি মকর সংক্রান্তির লক্ষ্মীপূজা বলা হলেও পূজারী কিন্তু প্রথমে লক্ষ্মীপূজা না ক'রে শেয়াল (শিবা) পূজার জন্ত আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করেন, কখন ডাকবে। শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করেন মহিলারা, আর পূজক গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে ছড়া ফেলতে ফেলতে মেহীকে কেন্দ্র করে সাত পাক ঘোরেন বৃত্তরেখার উপর। এইভাবে তিনবার শেয়াল ডাকার প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। প্রবাদ আছে যেদিকে প্রথম শেয়াল ডাকে ঐদিকেই ধান ভাল হয়।

ঐদিন শেয়াল অত্যন্ত বরেণ্য দেবতা। পাছে তার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় তাই সারাদিন তার নাম ধরে ডাকে না, বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে। ঐদিন শেয়ালের ডাককে শেয়াল ডাকছে না বলে "সার ডাকছে" বলা হয়। গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে ঐভাবে পাক খাওয়াকে বলা হয় "সার ধরা"। সার ধরার পরে বাহুরা পূজা ও শেষে লক্ষ্মীপূজা। লক্ষ্মীপূজার পর আরম্ভ হয় কৌতুকপ্রদ ধান মাপা। পূজার পূর্বে কিছু ধান জড় করে রাখা হয়, ধান মাপার জন্ত ধামা, কাঠা, কুনকে প্রভৃতি যে সমস্ত মাপক যন্ত্র সেখানে থাকে ঐগুলো দিয়ে ধান মাপ করতে শুরু করে দেন পূজক। মালকোঁচা মেরে ডান হাঁটুটা মাটিতে গেড়ে বাম হাঁটুটা বুকের কাছে রেখে, বীরের আসন অনুকরণে চলে মাপ। কাঠা, কুনকে, ধামা প্রভৃতি মাপক-যন্ত্রগুলিকে উবুড় করে পেছন দিক দিয়ে দু'বার করে মেপে মাপক পাত্রসহ ধান মেহীর দিকে ফেলে দেয়। এক এক বারের মাপকে গোনে "এক কুড়ি", "দুই বিশি" ইত্যাদি। ছোট ছোট ধামাকে 'কাঠা' বলে। এক কাঠায় পাঁচ সের ধান ধরে। ষোল কাঠাতে এক কুড়ি হয়। কুড়ি কুড়িতে এক 'বিশি'। মাপক

বন্ধসহ ধান সেদিন খামারেই পড়ে থাকে। জু'খায় করে ধান রাখার কারণ,—লক্ষীর কাছ থেকে দ্বিগুণ করে ধার শোধ করার প্রতিশ্রুতিতে তাঁর যে বীচন ধার এনেছিলেন এখন সেই ধার শোধ হল। তাই বাগক পাত্রসহ ধান খোলায় পড়ে থাকে সেই রাতটা। এইভাবে শেষ হয় খোলা পূজা। তারপর পাড়া-পড়শী সবাইকে বছর বাঁটা শুরু হয়।

বেদ, মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনীগুলোকে লক্ষ্য করলে মেদিনীপুরের বহু প্রচলিত পৌষ সংক্রান্তির লক্ষ্মীপূজার মাধ্যমে খোলা বা খামার পূজার বাছুরা (বৃষ) ও শেয়ালের (শিবা) প্রাধান্য কেন,—এর উত্তর পাওয়া যায়। কৃষি বিস্তারের দ্বারা আর্যসভ্যতা বিস্তার করা আর্যদের ব্রত ছিল। এই ব্রত উদ্‌যাপনের পথে অনার্যদের কাছ থেকে পদে পদে তাদের বাধা পেতে হয়েছিল।

বাধা অপসারণের জন্য কখনও যুদ্ধ, কখনোও সন্ধি, কখনও বা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন প্রভৃতি বহুমুখী প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। ঘরে-বাইরে এই প্রচেষ্টার অগ্রণী ছিলেন আর্যাবর্তের হিমাচল প্রদেশের রাজা হিমালয়। তিনি কৃষিবিপ্লবের ঘোর বিরোধী। অনার্য দলপতি শিবকে নিজ কন্যা দুর্গার বিয়ে দিয়ে অনার্য অন্তঃপুরে কৃষি-বিপ্লবের চেষ্টা করেন। মহাভারতের ঘটনাগুলিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় পাণ্ডবেরাই আর্য-অনার্য সন্ধি স্থাপনের জন্য বেশি চেষ্টা করেছেন। ভীম অনার্য হিড়িম্বককে বধ করে তার ভগিনী 'হিড়িম্বাকে' বিয়ে করেন। অর্জুন নাগ-কন্যা উলুপিকে বিয়ে করেন। যুদ্ধে অনার্যরা হেরে গেলে তাদের দাস করে রাখা হ'ত। পাণ্ডবদের এই প্রচেষ্টাতে বাধা দিতে গিয়ে শিব একবার হেরে যান, ফলে তাঁকে পাণ্ডব শিবিরের দারোয়ানী করতে হয়। সেই সময় তিনি তাঁর শেষ চেষ্টা "অন্তর্ঘাতী প্রক্রিয়া" অবলম্বন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে বিজয়ী পাণ্ডবরা যখন রাত্রিতে শিবিরে নিশ্চিন্ত নিদ্রামগ্ন তখন শিব দরজা খুলে দেওয়ায় আর্য-বিরোধীরা সহজে শিবিরে ঢুকে নিদ্রিত 'পাণ্ডব'পক্ষীয় বীরদের হত্যা করে। সবশেষে শিবকে বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে আর্য ও অনার্যদের বিরোধ মেটাতে হয়েছিল। এরপর শিব আর্য-সভ্যতা বিস্তারে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। আর্য-বিরোধী ত্রিপুরাসুরকে বধ করে তিনি 'ত্রিপুরারি' উপাধি গ্রহণ করেন। সমুদ্রমন্থনজাত দ্রব্যের বণ্টন-বৈষম্যের জন্য তিনি দেবতাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করেন।

এইভাবে আর্যরা আর্যাবর্তে অরণ্য-বাধা অপসারিত করে পশু-সম্পদের স্থলে কৃষিসম্পদকে প্রবল করে তুললেও ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, নীলধ্বজ প্রভৃতি কয়েকজন রাজা তখনও দ্রাবিড় সভ্যতার ধ্বজা বহন করে চলেছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত তাম্রধ্বজ, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুকের রাজা ছিলেন। অর্জুনের সঙ্গে

তাম্রধ্বজের যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত হন, যার জন্ত আজও বাংলাকে 'পাণ্ডববর্জিত' দেশ বলা হয়। অবশেষে শিবের আপ্রাণ চেষ্টায় বাংলাদেশে কৃষিকর্মের বিস্তার ঘটে। বাংলার কৃষিকার্যের উত্তোক্তা শিব বা রুদ্র কিভাবে শিবা বা শেয়ালে রূপান্তরিত হয়েছেন তা' যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'পূজা-পার্বণ' নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন,' 'ঋকবেদের রুদ্রদেবের রূপ সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে এর বিস্তার ঘটেছে। কিছু নতুনও এসেছে। অথর্ববেদে রুদ্রের কিরাত রূপ। তিনি এক বিরাট মুখ-গহ্বর বিশিষ্ট কুকুরকে নিয়ে বেড়ান। ঋকবেদের কাল থেকে যজুর্বেদের কালের বহু প্রভেদ দেখা যায়। ঋকবেদে দিব্যসরস্বতী বা পুরাণে সর নদী কখনও ধবলপর্বত কখনওবা পুষ্পিত মুঞ্জ বা শরবন নামে কল্পিত হয়েছে। দিব্য সরস্বতী (ছায়াপথ) শ্বেত হিমালয়, তারই দক্ষিণ পার্শ্বে কালপুরুষ নক্ষত্র। কালপুরুষ নক্ষত্রই মহাকাল বা রুদ্র। যিনি রুদ্র তিনিই রুদ্রানী বা হিমালয় কন্তা হয়েছেন। যজুর্বেদের আর্যরা স্বর্গের ব্যাপার মর্তে এনেছিলেন। ঋকবেদের সময় বিশ্ব ভুবন সলিল মগ্ন ছিল। যজুর্বেদের সময় তার পার্থিব প্লাবন হয়। বৈবস্বত মনু নৌকায় চড়ে (নোয়ার মত) জলপ্লাবন থেকে রক্ষা পান। তিনি হিমালয়ের সর্বোচ্চ স্থানে নৌকা বেঁধে ছিলেন। যজুর্বেদে এর নাম 'নৌ-বন্ধন'। যজুর্বেদে (১৬।১৮) রুদ্রের মুখ কুকুরের মত বলা হয়েছে। এর থেকেই মহাভারতে দুর্গাস্তবে দুর্গা 'কোকামুখা' হয়েছেন। কুকুরের মুখ থেকে শৃগালের মুখ কল্পনা হয়েছে, পরে কালপুরুষ নক্ষত্রই পুরাণে 'শিবা' হয়েছেন। শিবা শব্দের অর্থ শৃগাল। কৃষি যুগের আরম্ভ থেকে কৃষি দেবতা হয়তো এইভাবে রূপান্তরিত হয়ে পূজা পেয়ে আসছেন।

এই জেলায় 'পটুয়া' নামক এক সম্প্রদায় বাস করে, এরা পৌরাণিক কাহিনীগুলি তুলিতে চিত্রায়িত করেও সঙ্গীত রচনা করে। গুরুসদয় দত্ত সংগৃহীত "পটুয়া সঙ্গীত" নামক পুস্তকে "বাহুয়া" নামের উল্লেখ আছে। ভীম ও শিব দুজনে বাঘ ও বাহুয়ার (বৃষ) সাহায্যে লাঙ্গল চালিয়ে কৃষিকর্ম শুরু করেন। শিব দীর্ঘকাল ধরে আর্য ও অনার্যদের সন্ধি স্থাপনের চেষ্টায় সময় অতিবাহিত করেন। ঘরের কিছু কাজ হয় না। শেষে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েন। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা শুরু করেন। যা ভিক্ষা পান তাতে অভাব মেটে না, দুর্গাকে সংসার চালাবোর জন্ত এখান ওখান থেকে ধার করতে হয়। অবস্থা এরকম পর্যায়ে এসে পড়ে আর ধার শোধ করা যায় না, তখন লোকে আর ধার দিতেও চায় না। একদিন দুর্গা শিবকে বললেন ঃ

দুর্গা বলে ভিক্ষার বাবা ছাড় ঠাকুর, চাষে দাওগো মন,
চাষ যে দুর্লভ জিনিষ এ তিন ভুবন।
ভূঁইয়ে লাগাও মুগ-মশুরী পাহাড়ে লাগাও কলা,
নৈবেদ্য বাড়াবে ঠাকুর ধর্ম সেবার বেলা।
চাষ কৃষাণ কর মহাদেব সুখে অন্ন খাবে
বড় বড় মুনিলাগ (মুনি-ঋষি) দুয়ারে বসে পাবে।
হাতের ত্রিশূল ভাও ঠাকুর গড়াও কোদাল ফাল
আমার বাঘ তোমার বাহুয়ায় মর্তে যোড় হল।
বাঘ-বাহুয়াতে হাল মর্তে জুড়ি দিল
এক চাষ দুই চাষ তীয় তিন চাষ মারিল।

কৃষি-দেবতার পূজা উপলক্ষে কেবল যে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় শিবা শেয়াল পূজা হয় তা নয়। জাপানের শস্য দেবতা "ইনারীর" পূজাও ঠিক এইভাবে হয়। চিত্রে দেখা যায় শস্য দেবতা ইনারী বসে আছেন একটি শস্য বোঝাই থলের উপর, তার দু'পাশে দুটি শেয়াল বসে আছে। এতে অনুমান করা যায় ভারতবর্ষের বাইরেও সমাজের মানসিক জগতে শেয়ালের একটা প্রতিপত্তি ছিল।[১]

বাংলার লোকউৎসব সমষ্টিচেতনার ফলস্বরূপ। সংহত সমাজের সৃষ্টি বলেই সমগ্র সমাজের বাসনালোক মুক্তি পায় উৎসব কলায়, মানুষের আচারে-আচরণে, নাচে-গানে। পণ্ডিতেরা মনে করেন—উৎসব প্রাঙ্গনে সমবেত নর-নারীর নাচ-গান ও আচার প্রভৃতি থেকেই গ্রীসদেশে নাটকের সৃষ্টি হয়েছে।[২] বাংলাদেশের উৎসব প্রাঙ্গন এবং দেবতার দেউল-মন্দিরকে আশ্রয়করে, দেবতার উদ্দেশ্যে যে 'বাদ্য', গান-নাচ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করেই নাট-গীত ও নাটকের প্রথম যাত্রা শুরু হয়। কারণ কৃষির দেশে কৃষি কর্মের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে অনুষ্ঠান ও পাল-পার্বণের উৎস ও বিকাশের সংযোগ রয়েছে। নবান্ন, পৌষালী, ভোবলা ইত্যাদি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান জেলায় শস্যের দেবীর নাম ইতু।[৩]

---

১. পূর্ণচন্দ্র দাস / উন্নত কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রতিষ্ঠার কাহিনী / চতুষ্কোণ / কার্ত্তিক / ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা / ১৩৭৪।

২. Rituals connected with agricultural and other cults have given rise to theatrical drama and comedy: Encyclopaedia of the Social-Sciences New york: Pp. 199. Edited: Edwin R. A. Seligman.

৩. পৌষ মাস ইতুপুজোর মাস। দুধে মাটির ঘট ভরে সেই ঘট স্থাপন করা হয় সরার উপর। ...দুধ ছাড়াও ঘটে কলমী ফুল ও আমের পাতা দেওয়া হয় আর সরায় দেওয়া হয় ধানের শিষ, গোখুর, যবের শিষ, কচু গাছ ইত্যাদি। পৌষ সংক্রান্তি ঘট ও সরার ভাসান।
সুরজিৎ দাশগুপ্ত / 'এসো পৌষ যেও না পৌষ' / আনন্দবাজার পত্রিকা ৩ পৌষ / ১৩৮০

'তোষালাব্রতের' উপকরণে মেয়েদের প্রয়োজন হয় নতুন ধানের তুষ, কালো গাই গরুর গোবর, সরষের ফুল, মূলার ফুল আর দূর্বা। তুষ আর গোবর একসঙ্গে মেখে ছুঁচুড়ি ছুঁগলা গুলি পাকাতে হয়। তারপর বাড়ির সরায় গোবর-গুলি সাজিয়ে রাখেন এবং মেয়েরা গুলির উপর সরষের ফুল এবং পাঁচ গাছি করে দূর্বা বসিয়ে দেন। তারপর ছড়া কাটতে থাকেন :

তুষ তুষলি, তুমি কে ?
তোমার পূজা করে যে,
ধনে ধানে বাড়ন্ত,
সুখে থাক্ আদি অন্ত।

নবান্ন কৃষিমূলক উৎসব। শস্যোৎসব। শুধুমাত্র কৃষকেরা এই উৎসব পালন করেন না। গ্রামের সব লোকেরা জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে নবান্ন করেন। আমাদের দেশে সুপ্রাচীন কাল থেকেই নতুন অন্ন দিয়ে দেবতা এবং পিতৃপুরুষদের পূজার্চনা করার রীতি আছে। শুধুমাত্র পিতৃপুরুষ ও দেবতা নয়, পশু-পক্ষীদেরও দেবতার মত নবান্ন নিবেদন করা হয়। পূর্বেই বলেছি এক বিশ্ববোধ আমাদের পাল-পার্বণগুলিকে অসীম মহত্ব দান করেছে। সীমার সঙ্গে অসীমের সংযোগ সাধন, ক্ষুদ্রের সহিত বৃহত্তের সম্মিলন, সসীম 'আমি'কে অসীম বিশ্বের মধ্যে উৎসর্গ করাই ভারতীয় উৎসবের ধর্ম। লোকায়ত পর্ব থেকে চিরাচরিত পর্বে—এই ত্যাগের দীক্ষা ও সাধনা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এখানে আমাদের অখণ্ড শান্তি এবং পরমা প্রাপ্তি। এই অনুভূতিকে বলা যায় : বিশ্বানুভূতি। নবান্ন প্রসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলেছেন : 'আমার যে ক্ষুধা, তাহা যে বিশ্বেরও ক্ষুধা। ইহাই নবান্নতত্ত্ব।'[১] বৃহত্তমান্ জগতের সঙ্গে নিজের ভোগ বাসনাকে একাত্ম করে বাঙালী আনন্দ পেয়েছে, বিশ্বে নিজেকে প্রসারিত করেছে।

উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় মেয়েরা মহাসমারোহে 'নবান্ন' উৎসব উদ্‌যাপন করেন। সেখানে অগ্রহায়ণ মাসেই নবান্ন হয়। নবান্ন অগ্রহায়ণের যে কোন শুভ তিথিতেই হতে পারে। তবে বিশেষ করে সংক্রান্তিতেই নবান্ন হয়। নবান্নের আগের দিনে ঘর-মেঝে-উঠোন-আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। গোবর-মাটি দিয়ে উঠোন ঝকঝকে করা হয়। সুন্দরবনের ওরাওঁরাও 'নওয়াখানি'তে ঘর-দোর ঝকঝকে পরিষ্কার করেন। বিশেষত মালদহ অঞ্চলে মেয়েরা পিটুলির রং দিয়ে নানা রকম আলপনা আঁকেন ঘরের উঠোনে, মেঝে এবং ভেতরের দেয়ালে।

●

১. বাঙালীর পূজাপার্বণ, পৃঃ ৭২

আলপনার প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো : পেঁচা, ধানের শীষ, পদ্ম ও লক্ষীর পদচিহ্ন এবং ধানের গোলা। কৈবর্ত, জেলে-মালোরা ঘরঘর আলপনা দেয়। অপূর্ব শিল্পশ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠে সমগ্র গ্রাম। নবান্ন যেন লক্ষীর কল্পনা। লক্ষী হলেন ধনৈশ্বর্যের দেবী (Goddess of Wealth), সুতরাং তাবাহুকে লক্ষী নবান্নের প্রধানা দেবী। মূলতঃ শস্যই দেবী এবং ঐশ্বর্যের প্রতীক। কৃষি শিল্পের শুভাগমনে শস্য বা ধানের ছড়া প্রতীক হয়ে ঠাঁই পেল লক্ষীর হাতে। নতুন একটি হাঁড়িতে আলপনা এঁকে লক্ষীর ঝাঁপি করা হয়। নবান্নের দিন সকালে ব্রতিনী স্নানান্তে নতুন শাড়ি পরেন। তারপর কপালে সিঁদুর দিয়ে পায়ে অলক্তক মেখে, পান খেয়ে লক্ষীর ঘট নতুন আলোচাল দিয়ে ভর্তি করে দেন। সোনার ধান ঘরে তোলার আনন্দে মেয়েরা গান গাইতে থাকেন। একটি গানের মধ্য দিয়ে সমগ্র বছরের (বার মাসের) চিত্র ফুটে উঠেছে :

> আয় লো দিদি তুঁই নিড়াতে যাই।
> পৌষ মাসে দিলাম পুজা বাস্তুদেবতার পায়,
> মাঘ মাসে বসুমতীর চরণ ছোঁয়ায়।
> ফাগুন মাসে দিলাম লাঙ্গল, চৈত্র মাসে বীজ.
> বৈশাখেতে চিক্‌চিহানী[1] জ্যৈষ্ঠে ধানের শীষ।
> আষাঢ় মাসে সোনার ধান, সোনার ফসল ফলে
> শ্রাবণেতে আউস ধান গৃহস্থে তোলে।
> ভাদ্র গেল, আশ্বিন আইল[2] কার্তিক দেয় সাড়া,
> অগ্রহানিতে[3] ক্ষেতের পরে দেখরে আমন ছড়া।
> আমন উঠে ঘরে ঘরে বন্দি চরণ তার।
> সপ্তডিঙ্গা মধুকরে যত ধান্য ধরে,
> এবার যেন সোনার ধানে আমার গোলা ভরে॥

চব্বিশ পরগণা জেলার 'হালাকাটা' অগ্রহায়ণের শেষে অনুষ্ঠিত ফসল আহরণের একটি অনন্য অনুষ্ঠান। অগ্রহায়ণের প্রথম বৃহস্পতিবার ধানের তিনটি গোছা এক প্যাঁচে কেটে নিয়ে আসেন চাষী ক্ষেত থেকে। সিঁদুর, ধূপধুনো দিয়ে ধানের গোছা পুজো করা হয়। কাস্তেটাতেও সিঁদুর মাখানো হয়। তিনদিন ঐ কাস্তে দিয়ে আর অন্য কাজ করা হয় না। এতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। ঘরের

১. চিক্‌চিহানী—সেকে উজ্জ্বল হওয়া
২. আইল—এলো। আসিল>আইল
৩. অগ্রহানি—অগ্রহায়ণ

ঈশান কোণে ধানের গোছা রাখা হয়। পরে ধানের গোলায় তুলে রাখা হয়। নৈবেদ্য হলো মকর চাল, শশা, কলা, ডাবের জল, খেজুরের গুড়, ঘি, মৌ, আদা, নারকেল, গরুর দুধ, দূর্ব্বা, ফুল ইত্যাদি। ঘটে সিঁদুর দিয়ে বসুধরা আঁকা হয়। ধান উঠলো গোলায়। এবার ধানের নতুন চালে পায়েস আর পিঠে-পুলি হবে। নতুন চালের গুঁড়োয় কলা, নারকেল মিশিয়ে পিঠের মত করা হয়। একেই মেয়েরা বলেন 'নবান্ন'। ব্রাহ্মণ পুরোহিতও নবান্ন উৎসবে পূজা করেন। ধানের গোলার পূজাও করা হয়। নবান্নের দিন ছেলে-মেয়ে সবাই নতুন কাপড় পরেন। নবান্ন এই অঞ্চলে যেন 'নববর্ষোৎসব'। 'নববর্ষে' সাম্প্রতিককালে নতুন জামা-কাপড় পরার রীতি প্রচলিত হয়েছে। নবান্নেও তাই। আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠে সবার মন। **ওরাওঁরা "নওয়াখানির" দিন 'গ্রাম খানে' মুরগী বলি দেয়। বাংলার 'নবান্ন উৎসবে' বলিপ্রথা নেই।** তবে ক্ষেত্র দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়ার রীতি একদিন প্রচলিত ছিল। ক্ষেত্রপাল পূজায় বলির নিদর্শন থেকে এ'কথার সত্যতা অনুমান করা যায়।

রাঢ় অঞ্চলের 'পৌষআগলানো' ('আউনি-বাউনি') শস্যোৎসব। ফসলের প্রার্থনা উৎসব। পৌষের শেষ সংক্রান্তিতে মেয়েরা গোবর দিয়ে 'পৌষবুড়ি' তৈরী করেন। তোবলাতেও তাই হয়। অনেকে পৌষবুড়ি ঘরের বহির্দ্বারে দেয়ালে আটকে দেন। গোবরের গুলির উপর তুলসীর মঞ্জরী বা দূর্ব্বা ছড়িয়ে দেয়। তারপর খড়ের আঁটির বেষ্টনী দিয়ে সাঁঝের প্রদীপালোকে পৌষ আগলায়। তোবলার মত ছড়ায় বলে: 'এসো পৌষ যেও না। জন্ম জন্ম ছেড়ো না।" বর্ধমান জেলার হাড়ি, মুচি, বাগ্দী, বাউড়ীরা পৌষ আগলানো বিশেষভাবে পালন করেন। লক্ষীকে ঘরে আটকে রাখার অক্লান্ত চেষ্টা চলে পৌষ আগলানো পরবে। সমগ্র সমাজ এই সময় এই পরবে অংশ গ্রহণ করে। কৃষি-ভিত্তিক সমাজে এটাই স্বাভাবিক। সারা বছরের আশা-নিরাশার ফলশ্রুতি সোনার ফসল আমন ধান। গোলায় ভরে রাখতে হবে তাকে। তাই ব্রতিনী বার বার বলে: 'এসো পৌষ যেও না'।[১]

মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলে ধান রোয়ার কাজ শ্রাবণ মাস শেষ হয়ে যদি ভাদ্রমাস আরম্ভ হয়ে যায় তাহ'লে প্রত্যেক বন্দ জমিন রোয়ার শেষে চাষী জমির ঈশান কোণে দাঁড়িয়ে অন্ত জমিন থেকে তিনবার আজলা ভরে জল ছিটিয়ে দেয়। জল ছিটানোর সময় ছড়া বলে:

১. লোকায়ত বাংলা / সুধীর চক্রবর্তী

সবেস্তকার ধান লাল হউ, আমর ধান হালি (সবুজ)।
আমর ধানহু যে নজর দয, তার চক্ষুর পড়িব বালি।
(সকলের ধান লাল হউক, আমার ধান হালি।
আমার ধানে যে নজর দেবে, তার চোখে পড়ুক বালি।)

যেদিন ধান রোয়ার কাজ আরম্ভ হয় সেদিন বিউনী কড়াই ভাজা ও চাল ভাজা খেতে দেওয়া হয় জনমজুরদের, আর যেদিন রোয়া শেষ হয় সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে খেনো খই ও নারিকেল খেতে দেওয়া হয়। খাওয়ার সময় মজুরেরা যা'তে বলে খইতে প্রচুর ধান থেকে গেছে। এই ব্যবস্থায় ওদের মুখ থেকে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়ে নেওয়া হয়। ধান কাটার শেষে হয় 'পোড়া-পিঠে।'

নলপুজা সংক্রান্তি শুধু হিন্দুরাই করে না; মুসলমানরাও সঙ্গে যোগ দেন। এঁরাও ঐ রকম নল গাছ কাঁধে নিয়ে একই সঙ্গে ডাক সংক্রান্তির ডাক মারেন। তবে হিন্দুদের মত এত ছড়া বলেন না। কেবল নল পোঁতার সময় বলেন :

হিঁদুয়াকা যোহি বোল,
হামরাভি ওহি বোল—ধান কো-ও-ল।

এই রকম অনুষ্ঠানের পর ঐ দিন সন্ধ্যায় আমরা 'দেবতার সাথে মিতালী পাতাই, আকাশে প্রদীপ জ্বালি।' পিণ্ড বা ভক্ষ্য ভোজ্য দান করে মহালয়ার দিন যে সমস্ত মৃত পিতৃলোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাঁদের যেন অন্ধকারে কষ্ট পেতে না হয় তার জন্য 'আকাশ প্রদীপের' ব্যবস্থা। একটি হাঁড়িকে পিটুলীর জলে সাদা করে তার চারদিকে ছোট ছোট ছিদ্র করে, যাতে হাঁড়ির ভিতর থেকে বাইরে আলো বেরিয়ে আসতে পারে। গায়ে দেয় স্বস্তিকা চিহ্নের আলপনা। হাঁড়ির মধ্যে আতপ চালের তুষ দিয়ে তার উপরে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হাঁড়ির উপরে একটি সরাকেও ঐ রকম রাঙিয়ে ঢাকা দেয়। তুলসী মঞ্চের কাছে একটি লম্বা বাঁশ পুঁতে হাঁড়িটাকে দড়ি ও সিকের সাহায্যে কপিকলের মত ব্যবস্থায় উপরে বাঁশের ডগায় তুলে দেওয়া হয়। সারা মাস সন্ধ্যায় এই আকাশ প্রদীপ দেওয়া হয়। মাসের শেষে পুরোহিত ঠাকুর দড়ি, হাঁড়ি, সরা, বাঁশ সব বিসর্জনের ব্যবস্থা করে একটি সিদে (একজনের আহার উপযোগী চাল, ডাল, তরি-তরকারী, লবণ) বাড়ী নিয়ে যান। আকাশপ্রদীপ ব্যবস্থাকে হিন্দুরা কুল-ধর্ম বলে মনে করেন।

উচ্চৈঃ প্রদীপমাকাশে যো দদ্যাৎ কার্তিকে নরঃ।
সর্বং কুলং সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥

এই ব্যবস্থাই আসলে বংশে বাতি দেওয়ার ব্যবস্থা। আগেকার দিনে এই দীপ-দান মহালয়া অমাবস্যা থেকে ভূত অমাবস্যা পর্যন্ত পুরো সৌর কার্তিক মাস চলত, এখন পুরো চান্দ্র কার্তিক চলে। কেউ কেউ আবার পয়লা কার্তিক থেকে কার্তিকসংক্রান্তি পর্যন্ত আকাশপ্রদীপ দেন। মহালয়ায় পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধ গয়ায় দিতে হয়। যাঁরা গয়ায়-শ্রাদ্ধ দিতে পারেন না তাঁদের গয়া-শ্রাদ্ধ করতে হয়। (গয়া শব্দের অর্থ প্রয়াণ, পিতৃপুরুষেরা মহালয়া বা পিতৃপক্ষে পৃথিবীতে আগমন করেন। আবার দীপান্বিতায় প্রস্থান করেন। তাই এতদঞ্চলের লোকেরা দীপান্বিতা বা ভূত-অমাবস্যাকে গয়াকালী অমাবস্যা বলেন।) ঐদিন হয় অলক্ষ্মী পূজা বা ভূত পূজা। এই কারণে এর নাম হয় ভূতঅমাবস্যা। সকালে হয় চতুর্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ আর অলক্ষ্মী পূজা। যেখানে ঘরের চালার জল পড়ে সেইখানেই পূজার অনুষ্ঠান। ভাঙ্গা ধুকচি, ভাঙ্গা কুলো, ভাঙ্গা চুপড়ি এগুলি হয় বাদ্যযন্ত্র। ভোগ বা ভোজ্য হয় কলার খোসা, পানীয় হয় ব্রাহ্মণের পা ধোওয়া জল। পূজোর প্রদীপ জ্বালানোর পরিবর্তে পাট-কাঠি জ্বালানো হয়। রাত্রের বেলায় পুকুরের চারদিকে পাট-কাঠির ছোট ছোট আঁটি বা বাতিল জ্বালিয়ে পুঁতে দেওয়া হয়। বিসর্জনের সময় বলে 'লক্ষ্মী আইল' অলক্ষ্মী গলা।' এর মানে হল শান্তি এল, অশান্তি পালাও। বিসর্জনের মন্ত্র: 'যমলোকং পরিত্যজ্য আগতাযে মহালয়ে। উজ্জ্বলজ্যোতিষাবর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তুতে।' আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই চারি মাসে বাংলা দেশের পক্ষে আকাল বা অসময়। এই কয় মাস বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। 'অতঃ বর্ষাকাল হরিণ চাটে বাঘের গাল।' বর্ষার বন্যায় বাংলার অধিবাসীদের দুঃখের সীমা থাকে না, ধনী-দরিদ্র সকলেই অন্নবিত্তর এই আকালের দুর্ভোগ ভোগ করেন। সবশেষে অলক্ষ্মীকে প্রণাম করে প্রার্থনা করেন: 'বর্ষাকালে মহাঘোরে যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম। সুখরাত্রি প্রভাতেহস্ত ত্রস্যে লক্ষ্মী ব্যাপোহতু॥'

জাপানেও এককালে অলক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে ওটানো-নো-হোগাই রাজপ্রাসাদ থেকে এক বর্ণাঢ্য মিছিল যেত সেখানে আবর্জনাপূর্ণ স্থানে অমঙ্গলের দেবতা লুকিয়ে আছেন সেখানে।

শাকভোজন বাংলার সমাজজীবনে ভোজনপর্বের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিবাহের মত সাড়ম্বর ভোজন-পর্বের অনুষ্ঠানেও আত্মীয়স্বজনের নিমন্ত্রণ চিঠিতে লেখা হয় 'সবান্ধবে মদীয় ভবনে শুভাগমন করতঃ শাকান্ন ভোজনে বাধিত করিবেন।' ভাদ্র-সংক্রান্তির দীপজ্বালানোর দিন যেমন সাত শাকের ভাজা খেতে হয়, তেমনি দীপান্বিতায় দীপদেবানার দিন চৌদ্দ শাকের ভাজা খেতে হয়।

মহাভারতের বনপর্বে শাকভোজনের এক সুন্দর কাহিনীর বর্ণনা আছে। 'সপ্ত সারস্বত তীর্থে মহর্ষি মঙ্কনকের কুশাগ্রে ক্ষত হাত থেকে রক্ত না বেরিয়ে শাকরস বের হওয়াতে তিনি আনন্দে কেবলই নাচতে লাগলেন। সে নাচ আর কিছুতেই বন্ধ হয় না। তাই দেখে দেবতারা মহাদেবকে তাঁর নাচ বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করতে বললেন। মঙ্কনক ছিলেন শৈব। তিনি শিবের কৃষি-বিপ্লবের এক চরম সমর্থক ছিলেন। এই সবুজ বিপ্লব তাঁর রক্তেও ছোঁয়া লেগে রক্তের মৌলিকত্ব নষ্ট করে সবুজের মৌলিকত্ব এনে দিয়েছে, এতেই তিনি আত্মহারা। মহাদেব কোনও উপায়ে তাঁর নাচ বন্ধ করতে না পেরে অবশেষে নিজের বুড়ো আঙুল ক্ষত করে দেখিয়েছিলেন ভস্ম ছাড়া কিছুই নেই। শাকরস, রক্ত, ছাই সমুদয় বস্তু দিয়েই শরীর। এক উদ্ভিদই জীবজগতের দেহরক্ষা করছে। পরম দুর্লভ দেবীস্থানে শাকম্ভরী তীর্থ। এইখানে সুব্রতা দেবী মাসে মাসে শাকাহার করে সহস্র বর্ষ কাটিয়েছিলেন। মহর্ষিরা এই তীর্থে উপস্থিত হ'লে শাকের দ্বারা তাঁদের আতিথেয়তা করতেন। এইজন্য এই তীর্থের নাম 'শাকম্ভরী'। সমাহিত ও ব্রহ্মচারী হয়ে শাক খেয়ে এখানে ত্রিরাত্র বাস করলে বার বছর শাক খেয়ে যে ফল হয় সেই ফল সঞ্চিত হয়।

শ্যামাপূজার পরের দিন 'দর্পণদর্শন' উৎসব। ঐ দিন নরসুন্দরেরা নিজ নিজ এলাকায় কাংসদর্পণ দেখিয়ে কাপড় জামা, পয়সা, বখশিশ্ আদায় করে। ছোট শিশু থেকে আরম্ভ করে আশি বছরের বুড়ো পর্যন্ত সকলকে দর্পণ দর্শন করতে হয়। এই কাংসদর্পণ দেখলে নাকি পরমায়ু বাড়ে ও শৈশবের স্মৃতি জেগে ওঠে। কাঠের বাঁটের উপর আটকানো কাংসদর্পণটিকে নিয়ে যখন কোন তরুণী দর্পণদর্শন করেন তখন আমাদের মনকে পিছিয়ে নিয়ে যায়। মনে পড়ে সেই ঐতিহাসিক খাজুরাহ মন্দিরের সামনে দণ্ডায়মানা রূপ-মুগ্ধা নিটোল তন্বীর কথা। জল ও পাথরকে বাদ দিয়ে ধাতু যুগে প্রথমে যেদিন মানুষ ধাতুর সাহায্যে রূপ-তৃষ্ণা মিটিয়েছিল সেদিনটিকে আজও স্মৃতিপথে জাগিয়ে রেখেছে এই উৎসব। রূপ-তৃষ্ণাকে বিলাসিতা বলে মনে করলে ভুল হবে। আমাদের ঋষিরা বলে গেছেন, 'রূপের ধর্মই হচ্ছে প্রতিবিম্বিত হওয়া। আমরা যখন কাউকে দেখি তখন তার রূপ আত্মাতে প্রতিফলিত হয়। এই রূপ আবার স্বপ্নে অনুরূপ মানসপটে প্রতিবিম্বিত হয়।' রূপকে আমরা আলো-ছায়ার সাহায্যে সচল বা অচল ভাবে প্রতিফলিত করতে সমর্থ হই। জাপানে বলে, আত্মাতে প্রতিবিম্বিত না দেখা পর্যন্ত রূপকে সম্পূর্ণ বোধ করা বা প্রকাশ করা অসম্ভব। এ হেন আর্শিকে শুধু দেখা নয় এর কাছে এক কালে প্রার্থনাও ছিল। 'আর্শি, আর্শি, আমার বর

যেন পড়ে কাসি।' দর্পণদর্শন উৎসবকে এঁরা বলেন 'পড়িয়ন'। কাক ডাকার আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে আলো জ্বালিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গায়ে হলুদ দেওয়ার ধুম লেগে যায়। ভোর হতে না হতেই কপালে চন্দনের ফোঁটা, চোখে কাজল, ভ্রূর দক্ষিণ প্রান্তে 'রক্ষা টিপ' নিয়ে, পোড়া-পিঠে খেয়ে বেরিয়ে পড়ে পাড়ায়, কে আগে সেজেছে, কার সাজ-সজ্জা ভাল হয়েছে দেখানোর জন্য। কাক ডাকার আগে না সাজলে কাক সব রূপ হরণ করে নেয় বলে লোক-প্রবাদ। বাড়ী থেকে বেরোবার আগে মা বাঁ' হাতের কড়ে আঙুলটি কামড়ে উচ্ছিষ্ট করে দেন পাছে ছেলের উপর লোকের কু-দৃষ্টি পড়ে। ঐদিন হলুদ গায়ে দিয়ে গা' থেকে যে ময়লা বের হয় সেই ময়লা দুর্বা ঘাসের উপর ফেলা হয়। এই ব্যবস্থায় ছেলের স্বাস্থ্যও দিনে দিনে কচি দুর্বার মত সুকোমল ও নধর হয়ে উঠবে এই বিশ্বাস।

বাংলার সর্বত্র এই উৎসব 'ভাতৃদ্বিতীয়া' নামে উদ্‌যাপিত হয়। অনেকে আবার 'পড়িয়নকে' প্রতিপদের ফোঁটা বলেন। দীপান্বিতার পরের দিনের এই শুক্লা প্রতিপদ বা পড়িয়ন সম্বন্ধে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'পূজাপার্বণ' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, 'যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদের কালের লোকেরা ঐ দিন থেকে শারদ বৎসর গণনা করতেন। গুজরাটের লোকেরা এখনও ঐ দিন থেকে নতুন বৎসর গণনা করেন, নতুন খাতা খুলেন। পড়িয়ন ও দর্পণদর্শন উৎসব দেখলে মনে হয় এককালে এতদঞ্চলেও শারদ বৎসর গণনা হতো।

উপরোক্ত পুস্তকে দীপান্বিতা সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে "আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস পুণ্যাত্মা পিতৃপুরুষের মৃত্যুর পরেই উচ্চ স্বর্গে দেবতাদের সহিত দেবলোকে বাস করেন। দেবলোক সর্বদা আলোকময় কিন্তু সকলের ভাগ্যে দেবলোক হয় না। তাঁহারা দক্ষিণে অন্ধকারে যমলোকে গমন করেন ও সেখানেও বাস করেন। এই কারণে দক্ষিণ দিকে পা রাখিয়া শয়ন নিষিদ্ধ। পিতৃপুরুষের দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাইবার পথকে বলা হয় 'পিতৃযান পথ।' অমান্ত ভাদ্র অমাবস্যা মহালয়া। সেদিন পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃগণকে দীপ দেখাইতে হয়। অন্ধকার যমলোক হইতে তাঁহারা পিতৃযান পথে মহা আলয়ে গমন করেন। এই কারণে মহালয়া অমাবস্যা দীপান্বিতা অমাবস্যা। অবিকল সেই কারণে আশ্বিন অমাবস্যা দীপান্বিতা।"

পড়িয়ন উৎসবের ঠিক সাতদিনের মধ্যেই পঁচুঁয়া অষ্টমী। শারদ বর্ষ গণনা কালে এটি ছিল বছরের প্রথম অষ্টমী। পঁচুঁয়া শব্দের অর্থ প্রথম। বাপ-মায়ের প্রথম সন্তানের এই তিথিতে জন্মোৎসব পালন করে। জাতকের গায়ে হলুদ মাখিয়ে মাথায় চন্দনের ফোঁটা দিয়ে হলুদ রঙের জামা কাপড় পরিয়ে সাজানো হয়। ব্রহ্মা,

বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে কল্পনা ক'রে তিনটি গোবরের মূর্তি তৈরী করে তার মাথায় নতুন ধানের শিষ গুঁজে দেওয়া হয়। এদিনও লক্ষী পূজা হয়। নৈবেদ্য হয় পরমান্ন।

কার্তিকের অপর নাম কুমার, তাই যে পূর্ণিমায় চান্দ্র কার্তিক আরম্ভ হয় তার নাম কুমারপূর্ণিমা। একে কোজাগরী পূর্ণিমাও বলে। সব লক্ষীপূজা বা লক্ষীব্রত মেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কুমারপূর্ণিমার লক্ষীপূজা পুরুষেও করেন। ঐদিন প্রত্যেক বাড়ীতে গৃহলক্ষী পূজাতো পুরুষরা করেনই তা'ছাড়া যেখানে প্রতিমা করে সার্বজনীন লক্ষীপূজা উৎসব হয়, ব্রাহ্মণপূজারী, সেখানেও একজন পুরুষ যজমান বা ব্রতী হয়ে সমস্ত দিন উপবাস করেন। রাত্রে ঘট স্থাপনের সময় ব্রতী স্নান করে ভিজে কাপড়ে জলন্ত ধুপ-সরা মাথায় করে নিয়ে আসেন পূজা মণ্ডপে। পূজার আহুতিতে একটি আস্ত নারকেল দেওয়া হয়। একে বলে 'চরু'। ব্রতী দর্শকদের মধ্যে চরু ভক্ষণে আগ্রহীদের হাতে একটু একটু এই চরু দেন। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে লক্ষী পূজার পর খই, নারকেল, তাল ফোঁপ্লা ইত্যাদি একটি থালাতে রেখে জ্যোৎস্নায় চাঁদকে বন্দনা করা হয়। পরে প্রত্যেকে চাঁদের প্রসাদ গ্রহণ করেন। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে চাষীরা সেই বছরের রবিশস্যের ভবিষ্যৎ ঘোষণা করেন। আকাশে যদি এক টুকরাও মেঘ দেখা যায় তাহলে রবিশস্য ভাল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ছেলেরা এদিন সারারাত তাস পাশা খেলে রাত জেগে কাটিয়ে থাকেন। কোজাগরী পূর্ণিমা দেখলে মনে হয় এটি যেন পুরুষদের জন্য নির্বাচিত উৎসব।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' বইতে উল্লেখ আছে মেক্সিকো পুরাণের লক্ষী পূজার কথা। এই উৎসবে মেয়েদের প্রাধান্যই বেশী। এঁরা মাথার চুল খুলে দিয়ে এলোকেশী সেজে প্রার্থনা করে শস্য যেন এলোকেশের মত গোছা গোছা লম্বা হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে যেমন পঞ্জিকা দেখে যোগিনী ইত্যাদি বিচার করে ধান্যছেদন আরম্ভের দিন তিন, পাঁচ বা সাত গোছা ধানের গাছ কেটে তার ভিতরে খোসাশুদ্ধ সুপারী রেখে সুন্দর করে বেঁধে সিঁদুর লাগিয়ে মালক্ষী কল্পনা করে শঙ্খধ্বনি করে বরণ করা হয় পেরুর লোকেরা ঠিক সেই রকম শস্যসংগ্রহের দিন ভুট্টার ছড়া একত্রিত করে লক্ষীমূর্তি গড়ে।[১]

পৃথিবীর সভ্যতার উষালগ্নে নারীই প্রথম কৃষির আবিষ্কার করেন। ভূমির সঙ্গে নারীর একটা সাদৃশ্য আছে। সেটা উর্বরতার। উত্তরবঙ্গ এবং আসামের

---

১. পূর্ণচন্দ্র দাস/চতুষ্কোণ/পৌষ/১৩৭৮

মাতৃতান্ত্রিক রাজবংশী, কোচ্ ও মেচ্, খাসি, লেপচা, কুকিরা এবং চট্টগ্রামের গারো, ত্রিপুরা, চাকমাদের সমাজে মেয়েরাই কৃষিকাজ করেন। নারীর প্রজনন শক্তি ও প্রকৃতির প্রজনন শক্তি এই সমাজে সমার্থক। সম্ভবতঃ এই কারণে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা 'হুদুমদেও' উৎসবে বা বউবরণ উৎসবে নগ্নদেহে বৃষ্টির জন্য মেঘের দেবতা হুদুমের কাছে 'নগ্ন নৃত্য' প্রদর্শন করেন। পৃথিবীর বহুদেশে এই রীতি প্রচলিত আছে। আদিম মানুষের চেতনায় শস্য উৎপাদন ও সন্তান প্রজনন সমধর্মী। মেচ্ রমণীরা ক্ষেতে বীজ বপন করেন। তাদের বিশ্বাস এতে ক্ষেত্র শস্যশালিনী হবে। সাঁওতালদের মধ্যেও এ ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত আছে। পৌষ আগলানো উৎসবেও ইন্দ্রজাল, মনস্তত্ত্ব বিশেষভাবে কাজ করেছে। খড়ের বেষ্টনী যেন ঐন্দ্রজালিক 'গণ্ডী আঁকা'। লক্ষ্মণ যেমন সীতাকে পঞ্চবটী বনের পর্ণকুটীরে গণ্ডী এঁকে রেখেছিলেন। আমাদের থালা ইত্যাদি গোলাকার বা চক্রাকার করার পেছনে ঐ ইন্দ্রজাল মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে। পৌষবুড়ির পাশেই রাখা হয় একটি সিঁদুর-রাঙা নোড়া। ভীলরা ক্ষেত্রে বীজ বোনার পূর্বে মাটিতে একটু সিঁদুর মেখে দেন। ফলে বসুন্ধরা ঋতুমতী হবে—এটাই তাদের বিশ্বাস। রাঢ় দেশের পৌষআগলানো উৎসবে যে সিঁদুর-সিক্ত নোড়া ব্যবহার করা হয়, তা' লিঙ্গ এবং প্রজনন শক্তির প্রতীক দ্যোতনা করে। নর-নারীর জননাঙ্গের সঙ্গে ভূমির উর্বরতা অবিচ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ। এ যেন সূর্য-বসুন্ধরার আসঙ্গলিপ্সা। আর্যরা ভারতে প্রবেশ করার বহুপূর্বেই এদেশে লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০—২০০০ অব্দের সিন্ধু সভ্যতায় উদ্ধৃত-লিঙ্গ এক দেবমূর্তি পাওয়া গেছে। এই দেবমূর্তি শিবসম্ভব কোন দেবতার। প্রাচীন গ্রীসে পুরুষ নিজেকে আকাশের প্রতীক মনে করত। আকাশ যেন বৃষ্টি দান করে পুরুষের মত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে পৌষবুড়ির পাশে রক্ষিত নোড়াটা সহ পৌষ বুড়িকে একটা বড় নতুন ঝুড়ি চাপা দেওয়া হয়েছে। কালনা অঞ্চলে এই রীতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ যেন পৌষবুড়ির বাসরঘর। পৌষের কুয়াশা ভেজা রাত শেষ হয়। পাখির প্রথম ডাকে ঘুম ভাঙে ব্রতিনীদের। তারা আচমকা চেঁচিয়ে উঠে: 'পৌষ পালালো, পৌষ পালালো ছোলা আড়ি দিয়ে। ওই পৌষকে ধরে আনবো শেঁয়া শাড়ি দিয়ে।'[১] কিন্তু নারীমনের ব্যাকুলতর মিনতি সত্বেও পৌষের বিদায় অনিবার্য। কালের গতি, ঋতুর লীলারঙ্গ এই চলমানতার অধীন। পৌষকে আগলানো গেলনা। মাঘের ১লা দিনের ভোরে পুকুর ঘাটে পৌষবুড়ি বিসর্জিতা

১. লোকায়ত বাংলা/বরুণ চক্রবর্তী

হলেন। মেয়েরা এরপর স্নান করে ঘরে ফিরে যান। একে 'মাঘস্নান' বলে। স্নানান্তে মেয়েরা পুকুর পাড়ে আগুন জ্বালে। আগুন একদিকে সূর্যের প্রতীক, অন্যদিকে আবার অশুভ বিনাশিনী, পরিশোধনের প্রতিরূপ।

ইউরোপে কৃষকেরা ডিসেম্বরের শেষ দিনে বহ্ন্যুৎসব উদ্‌যাপন করেন। প্রজ্বলিত অগ্নিকে ঘিরে নৃত্যকরা আদিম শিকারী জীবনের এক সাম্য-অনুষ্ঠান। জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে আজও আগুনকে ঘিরে চক্রনৃত্য হয়। শস্যের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করার জন্য গ্রীস, স্কটল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়ার চাষীরা বহ্নিউৎসব করেন। বাংলাদেশে চাঁচর, চট্টগ্রামে 'ভেড়ার ঘর পোড়ানো' কৃষিনির্ভর মানুষের ফসল প্রার্থনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। শস্য ও সন্তান কামনার সঙ্গে বহ্নি-উৎসব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পৌষআগলানো উৎসবে যুবক-যুবতীরা আগুনকে ঘিরে নৃত্য-গীত করে। আদিরসাত্মক গানও কোন কোন ক্ষেত্রে গাওয়া হয়। মাঘের সূর্য আকাশে উঁকি মারতেই মেয়েরা পৌষআগলানো উৎসব সাজ করেন।

এই উৎসব একান্তভাবে লোকায়ত এবং কৃষিনির্ভর। কৃষি যেমন ঋতুনির্ভর, এই উৎসবও তেমনি ঋতুকেন্দ্রিক। কৃষি, ভূমি ও শস্য—এই উপকরণ ত্রয় এই শস্যোৎসবের প্রধান উপাচার। এখানে পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। শাস্ত্রাচার নেই। মেয়েরা এর ব্রতিনী এবং পূজারী। নবান্নের মতই এর মূলভাব। শস্য, শ্রী, ইত্যাদি কামনাই প্রধান বিষয়।

শস্যোৎসব প্রসঙ্গে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমের টুসু উৎসবের আলোচনা অপরিহার্য। কারণ টুসুও শস্য এবং কৃষিকেন্দ্রিক উৎসব। টুসু পরব পশ্চিম প্রান্ত বাংলা ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না। অন্যান্য অঞ্চলের লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে এর একটা ভাবগত মিল থাকলেও আচারগত পার্থক্য কম নয়। তবে স্থানীয় লোকের', বিশেষ করে পুরুলিয়ার বান্দোয়ান, চাকুলতোড় প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা টুসুকে "পৌষলক্ষ্মীও" বলেন। টুসু এখানে আদুরে মেয়ে, আবার শস্যদেবী। এক সর্বব্যাপক অনুভূতিতে 'প্রিয়কে দেবতা' এবং 'দেবতাকে প্রিয়' করেছেন এখানকার নারী সমাজ। টুসুর সঙ্গে বাংলাদেশের মেয়েদের তোষলা বা তুঁষ-তুষলির আচারগত সাদৃশ্য আছে। অনেকে মনে করেন—'তুষ' থেকে 'তুসু' এবং 'তুসু' থেকেই 'টুসু' হয়েছে। তোষলার মত টুসুও মেয়েদের অনুষ্ঠান। টুসু শস্যদেবতা। পূর্বে টুসুর কোনো মূর্তি ছিল না, এখন মূর্তি গড়ছেন পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, এবং বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পীরা। অনেক জায়গায় টুসুকে দেখেছি হংসবাহনা। টুসুর গায়ের রং হলদে, মাথায় মুকুট, হাতে পদ্ম ও শস্য-শীষ, হাতে-গলায় গয়না। শোলা ও রঙিন কাগজ দিয়েও টুসু গড়েন শিল্পীরা। ছোট ছোট মূর্তি হয়

টুসুর। প্রায় সর্বত্রই টুসু দাঁড়ানো। কোথাও উপবিষ্টা। এখন পুরুলিয়ার 'টুসু' ও 'ভাদু' মূর্তি প্রায় এক হয়ে গেছে। ভাদু অবশ্য কোথাও কোথাও পদ্মাসনা। মনে হয় হিন্দু দেবদেবীর প্রভাবে টুসু ও ভাদুর মূর্তি প্রকরে এই অর্বাচীনতা ও ভাব সংশ্লেষণতা দেখা দিয়েছে।

অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি থেকে টুসু পরব শুরু হয়। পৌষসংক্রান্তিতে প্রতি বছর টুসুর ভাসান এবং মেলা হয়। পশ্চিম প্রান্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার মাহাতো, কুর্মি, ভূমিজ, কোরা, লোধা ও রাঁচির (বিহার) সাঁওতালেরাও টুসু পরব পালন করেন। টুসুকে গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন 'পুতুল' এবং 'টুসু পরব'কে 'পুতুল পরব।'[১] কিন্তু এই মন্তব্য আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কারণ টুসুর পুতুল-প্রতিমা মৌলিক উপকরণ নয়। প্রথমে টুসু ছিল গোবর নাড়ু। যার উপর সরষে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ত। যেমন ভোবলা এবং পৌষআগলানো পরবে 'পৌষবুড়ি' গড়া হয়, ঠিক তেমনি ছিল টুসুর প্রতীক প্রতিমা। হিন্দুদের প্রকল্পিত দেবদেবী প্রতিমা কল্পনার প্রভাবে টুসুর রূপগত পরিবর্তন ঘটেছে। টুসুর মূর্তিতে সেজন্য কোন অঞ্চলেই কোন লোকায়ত আদর্শ নেই। গোবর নাড়ুর টুসু চোড়লে (চতুর্দোলে) করে কাঁসাই, ডুলুং নদীতে পৌষ সংক্রান্তিতে বিসর্জিত হয়। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম টুসুর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না। সেজন্য টুসু মূলত পুতুল নয়। বাংলা দেশের মেয়েরা ব্রত-পার্বণে মাটি, খড়, কাগজের যে পুতুল-প্রতিমা গড়েন তা' প্রত্যক্ষত: বাস্তব জগৎ ও জীবন ভিত্তিক। পশু-পক্ষী মানুষের রূপকে তারা অনুকরণ করেন। শিল্পের অনুকরণবাদ লোকশিল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। লোকায়ত শিল্পচেতনা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়, বরং একটা ঐতিহ্য ও প্রতি, স্মৃতি এর পেছনে সক্রিয় থাকে। লোকাচার ও লোকধর্মই লোকশিল্পের জনক। এই লোকধর্মও আদিম ধর্ম বিশ্বাসের সূত্রে বাংলার সঙ্গে মাহেন-জো-দড়ো ও গ্রীস, মিশরের সাংস্কৃতিক রাখী বন্ধন ঘটেছে।

টুসু উৎসবকে তিনভাগে বিভক্ত করা চলে। (১) সন্ধ্যা বা 'সন্ঝা', (২) জাগরণ, (৩) ভাসান। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে টুসু পাতা হয়। তারপর প্রতিদিন সন্ধ্যায় তুলসীতলায় বা টুসুতলায় চলে 'সন্ঝার' অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে ব্রতিনীরা গাঁদাফুল দেন তুলসীতলে টুসুর উদ্দেশ্যে। তারপর পাড়ার মেয়েরা মৃদু মৃৎ-প্রদীপালোকে বসে শীতের সন্ধ্যায় টুসু গান বাঁধেন। এই গান

---

১. Tusu connotes a 'doll': Naturally the nucleus of festival is a doll. —ProbodhKumar Bhowmick—Indian Folklore—Vol: 1 /No: II: 1958/p-17

বাঁধা চলে সারা অগ্রহায়ণ মাস। এর মধ্যে 'সইপাতানো' বা 'সয়লা' নামে একটি মিতালী অনুষ্ঠানও পালন করেন মেয়েরা। সইপাতানো সমাজ বন্ধনের এক প্রাচীন অনুষ্ঠান। ঘরে লক্ষ্মী-শ্রী এলো আনন্দের মাস অগ্রহায়ণে। অতএব আনন্দ-উচ্ছলতায় সবাই প্রীতির রাখীবন্ধন করেন। টুসু যেন এই লোকমিতালির দূতী।) পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমের অরণ্যস্মৃতিও টুসু গানে দুর্লভ নয়। যেমন, 'বড় বনে লতাপাতা/ছোট বনে শাল বাতা।/ কোন্ বনে হারালে টুসু/সোনায় বাঁধা লাল ছাতা।/ ধরগো ছাতা, যাব আমি কলকাতা : / গাড়ি ছুটছে বাঁশপাতা।' কবিত্ব ধর্মে এই গান অসামান্য। এর সঙ্গে মন ও প্রকৃতি চলমান।

টুসুর 'সন্ঝার' সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের 'তোষলার' আচারগত সাদৃশ্য রয়েছে। তোষলাতেও "অঘ্রাণের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি সকালে স্নান করে গোবরের ছ-বুড়ি, ছ-গণ্ডা বা ১১৪টি নাড়ু পাকিয়ে, কালো নিদাগ নতুন সরাতে বেগুন পাতা বিছিয়ে তার উপরে নাড়ুগুলি রাখতে হয়। প্রত্যেক নাড়ুতে একটি করে সিঁদুরের ফোঁটা এবং পাঁচগাছি করে দুর্বাঘাস গুঁজে দিতে হয়। তার উপর নতুন আলোচালের তুঁষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে সরষে, শিম, মুলো ইত্যাদির ফুল দিয়ে ছড়া বলা হয়। ব্রতের নাম এবং উপকরণগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটি সারমাটি দিয়ে খেত উর্বর করে তোলার ব্রত।"[১] টুসু ও 'পৌষআগ্লানো' উৎসব প্রসঙ্গেও এ'কথা সমান সত্য। টুসুর 'সন্ঝা' অনুষ্ঠানে মাটির সরাতে গাঁদাফুল দেওয়া হয় অগ্রহায়ণের প্রতি সন্ধ্যায়। টুসুর ঘটও ব্যবহার করা হয়। তারপর চলে গানের মহড়া। পাড়ার মেয়েরা টুসুতলায় সমবেত হন। টুসু গানে প্রতিফলিত হয় প্রান্ত পশ্চিম বাংলার জীবনচিত্র ও সমাজচিত্র। টুসুকে আদুরে খুকী ভেবে গাইছে মেয়েরা : 'আমার টুসু ঝাড়গ্রাম যাবে, খিদা পেলে খাবে কি? আন গো টুসুর গায়ের গামছা, বেঁধে দিব জিলাপি।' (তোষলাতে ভক্তিরস প্রাধান্য লাভ করেছে, কিন্তু টুসুগান বাৎসল্য রসপ্রধান। প্রিয় ও দেবতার মধ্যে এত সহজ অন্তরঙ্গতা একমাত্র লোকায়ত উৎসবেই সম্ভব।)

টুসু পরবে কন্যার মনোবেদনাও অসীম। কন্যা বলছেন : 'এত বড় পৌষ পরবে রাখলি মা পরের ঘরে, ওমা পরের মাকি বেদন বোঝে অন্তর পুড়ায়ে মারে।'

(পৌষসংক্রান্তির পূর্বদিনে সারারাত ধরে চলে 'জাগরণ' পালা। গান আর গান। সঙ্গে বাজে মাদল ও বাঁশি।) পৌষসংক্রান্তির রাতে সমগ্র পুরুলিয়াও মানভূমের গ্রাম মুখর হয়ে উঠে গানে। কোথাও করুণ বিষণ্ণ রাগিনী, কোথাও

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বাংলার ব্রত/পৃঃ ২৯-৩০

সারা বছরের সালতামামি গানের মধ্যে প্রকাশ পায়। টুসুর বিষণ্ণ বিদায়ের পালা আসন্ন। 'এস পৌষ যেওনা'—এই গান তোষলাতেও করুণতা আনে। টুসুতেও একদিকে যেমন আনন্দ, অন্যদিকে তেমনি বিষাদ। একটি গানে আনন্দ-ধ্বনি শোনা যায়। এ যেন টুসুর আগমনী :

পৌষ মাসে সংক্রান্তি গো',
টুসু মা এসেছে।
সকল সখি মিলি মিলি
পূজা কইরব সারা নিশি ॥

—এই 'সারানিশি' জাগরণ যেন টুসুর 'বাসর জাগা'। ভোর হ'তেই 'টুসু সই'য়ের মন বিষণ্ণ। তবুও টুসুকে বিদায় দিতে হ'বে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে-যুবতীরা ভোরের আলোয় বেরিয়ে পড়ে ঘরের বাইরে। আঙিনায় 'চোড়ল' সাজানো হয়। কাগজ, রঙিন কাগজ আর বাঁশের সরু কাঠি দিয়ে তৈরী করে 'চোড়ল'। সেকালের 'চতুর্দ্দোলার' লৌকিক সংস্করণ। গোবর গুলে, সরষে দিয়ে, গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে টুসুকে 'চোড়লে' তোলে। তারপর ব্রতিনীরা 'চোড়ল' নিয়ে চলে বাঁধের পথে, কাঁসাই নদীর ঘাটে। চাকলতোড় ও তারাবাঁধেই আজকাল টুসুর ভাসান হয়। মেলা বসে। দু'দিন ধরে চলে লেন-দেন, মেলা-মেশা। পথ চলতে চলতে মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে গান ধরেন :

এক সড়কে, দুই সড়কে
তিন সড়কে লোক চলে।
আমার টুসু এমনি চলে গো
বিন্ বাতাসে গা টলে ॥

—ঢাক, মাদল, কাঁসি ও বাঁশীর সুরে-তালে এক বিষণ্ণ রাগিণীতে টুসুর চোড়ল বিসর্জিত হয় কাঁসাইয়ের জলে। মেয়েদের চোখের জলও সম্ভবতঃ কাঁসাইয়ের বালুচরে ঝরে পড়ে। এ' বিদায় যেন মেয়েকে পরের ঘরে বিদায় দেওয়ার মত। এ কারুণ্য সর্বকালের মাতৃহৃদয়ের। 'বিসর্জনের বেদনায় এ যেন পৌষালী-বিজয়া।'

(টুসু বিসর্জনের পর মেয়েরা সমবেত ভাবে কাঁসাই নদের জলে স্নান করেন। এই স্নানকে সেই অঞ্চলে 'মকরস্নান' বলে।) দক্ষিণ ২৪ পরগণার 'সাগর স্নানের' মত। পৌষ আগলানো উৎসবে এই স্নানকে বলে 'মঘাস্নান'। পৌষ সংক্রান্তিতে টুসু ভাসানের দিন কাঁসাই নদীর তীরে এবং তারাবাঁধে বিরাট জনসমাবেশ হয়। বসে মেলা। মেলা ভারতীয় সমাজ বন্ধনে, পারস্পরিক ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। মনে হয়

বাংলা তথা ভারতের গ্রামীণ সংহতির মূল শক্তি মেলা ও উৎসব। একটা জাতির চিন্তা-ভাবনা, ব্যক্তি হৃদয় ও মনের কতো অজানা কথা মেলার পটভূমিতে মুক্তি পায়। প্রান্তিক বাংলার দূর-দূরান্তের মানুষ দুরান্তবর্তী স্বজনের সঙ্গে মেলার তীর্থে মিলিত হয়। সারা বছরের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সালতামামি লেন-দেন হয়। সুতরাং এককথায় মেলা জনসংযোগের একটি সুদূর প্রসারী বলিষ্ঠ মাধ্যম। টুসু মেলাও তাই। লোকায়ত শিল্প-সংস্কৃতির সংযোগ সূত্র মেলা। ভারতীয় লোক-মানসের মুক্তিতীর্থ মেলা। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই মেলার ঐতিহ্য চলে আসছে, চলছে এবং চলবে।

এই টুসু মেলার দিনই গৃহে গৃহে পিঠে-পুলির পার্বণ হয়। নবান্নের পায়েস সবাই ভাগ করে খান। 'সবার পরশে' পবিত্র হয় উৎসব প্রাঙ্গনতল। টুসু সংগ্রহের ও সঞ্চয়ের উৎসব। এই সঞ্চয় ভোগবাদের নয়। বরং ত্যাগের আদর্শে, প্রেমের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল। টুসু গানের মধ্যে এই ত্যাগ, স্বচ্ছ প্রেমের ও সুখ-দুঃখের ইতিকথা অভিব্যক্তি লাভ করেছে। ডঃ সুধীর করণ টুসু গান প্রসঙ্গে বলেছেন : 'গোটা একটা সমাজের রূপরেখা প্রেমের গান, প্রীতির গান, সুখের গান, দুঃখের গান, হাসি-ঠাট্টা—আনন্দের গান, এমন কি অশ্লীল গানও। গানের মধ্যে পরিবেশ আছে, প্রতিবেশ আছে, বিধি-নিষেধ, কর্তব্যবোধ আছে ; পুরাণ আছে, কাহিনী আছে, কটাক্ষ আছে, ঈর্ষা আছে, অভিসার আছে, অভিমান আছে, আছে রাজনীতি। সবচেয়ে বড়ো কথা এ গানের মধ্যে পল্লী হৃদয়ের কাব্য আছে।'[১]

লোকসঙ্গীত একদিকে যেমন সর্বকালিক, অন্যদিকে তেমনি প্রান্তিক ও আঞ্চলিক। টুসু প্রান্তিক পশ্চিম বাংলার মৃৎকল্প মানুষের প্রাণের গান। এ যেমন সহজ, তেমনি সরল ও সুন্দর। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া এবং চটকাও তাই, সেই বিশেষ অঞ্চলের জীবন ও সমাজচিত্রের বিশ্বস্ত দর্পন।

টুসু একান্তভাবেই লোকায়ত। টুসু, ভোষলা, তুঁষ, তুঁষু, পৌষলা যে নামেই ডাকি না কেন টুসু শস্য, সোনার ফসল। টুসু শ্রী এবং লক্ষ্মী। টুসু আদিম-কালের উর্বরতাবাদের প্রাক্তন স্মৃতি।[২] ভোমলা ব্রতও উর্বরতাবাদের উৎসব। গবেষকদের মধ্যে অনেকে টুসুর সঙ্গে লক্ষ্মীর সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন। লক্ষ্মী শস্য-দেবী এবং ঐশ্বর্যের ও শ্রীর প্রতীক। বাংলা দেশে আশ্বিন ও কার্তিক মাসের

---

১. সীমান্ত বাংলার লোকযান। পৃঃ ১৯৭

২. It is a reminiscent of primitive rite of the fertility of the soil. Journal of the Deptt. of Letters. Vol : II Part II. 5958—Pp 83.

Vide-'Folk Religious Rites'.—Dr. S. R Das.

পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা করা হয়। বাংলার মেয়েরা ব্রত হিসেবে লক্ষ্মীকে ভাদ্র মাসে, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে এবং পৌষ মাসে পূজা করেন। আশ্বিন পূর্ণিমার লক্ষ্মী পূজাকে বলে : 'কোজাগরী' বা 'কোজাগর'।[১] নবান্নে যেমন নতুন ধানের চাল, গুড়, নারকেল দিয়ে নাড়ু করে সবাইকে দেওয়া হয়। এখানেও তাই। এমনকি পিতৃপুরুষ, দেবতা, স্বজন-প্রতিবেশী এবং পশুপক্ষীকেও উৎসর্গ করা হয়। আচারগত সাদৃশ্য রয়েছে উভয়ের মধ্যে। লক্ষ্মী মূলতঃ আর্যেতর সমাজের দেবী।[২] পৌরাণিক নানা উপাখ্যান এসে টুসু ও লক্ষ্মীর সঙ্গে লগ্ন হয়েছে। আসলে টুসু ও লক্ষ্মী এক এবং অভিন্ন ; শস্যের দেবী তবে টুসুর সঙ্গে গৃহের কথা মিশে এক অনন্যতা লাভ করেছে। বাল্যবিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, কিংবা অসম বিবাহ ও নারী নির্যাতনের নানা কাহিনী পশ্চিম প্রান্ত বাংলায় দীর্ঘদিন ঘুরে ঘুরে মরছে। টুসুর আখ্যানে, গানে তারই কিছু কিছু তরঙ্গবিক্ষোভ বিচ্ছুরিত হয়েছে। মাতৃহৃদয়, স্বজনহৃদয় তাই কান্নায় আছড়ে পড়ে নদীর ঘাটে, বাঁধের পাড়ে।

নবান্নে আলপনার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। লক্ষ্মী পূজায়ও আলপনা অপরিহার্য। মালদহ জেলায় আলপনায় ধানের ছড়া, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, পদ্ম, মাড়াই বা গোলা ইত্যাদির প্রতিচিত্র আঁকা হয়। লক্ষ্মীব্রতে বা পূজায়ও তাই। পিটুলীর মুকুট, দু'খানি চরণ ও গৃহময় লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, লক্ষ্মীপেচা, ধানছড়া, কলসী ও লোপাটীলতা আঁকা হয় অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি যেন গৃহাঙ্গনে আসন পেতে বসে। আলপনার পরই বলতে হয় 'ডালার' কথা। বাঁশের তৈরী ডালায় উপাচার রাখা হয়। নৈবেদ্যের মধ্যে থাকে ফল। তারপর প্রয়োজন হয় একটি মাটির হাঁড়ি। যাকে বলে 'রচনা পাতিল'। সমগ্র বাংলাদেশে এটার প্রচলন আছে। ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 'লক্ষ্মীর সরা' মৃৎশিল্পের একটি দর্শনীয় বস্তু। এ'যেন পটচিত্র। এ'যেন লোকায়ত চালচিত্র। ওপার বাংলায় লক্ষ্মীর সরার বর্ণবহুল চিত্র শিল্পগত সার্থকতার পরিচয় বহন করে। এই সাধারণ অথচ অত্যন্ত লোকায়ত সামগ্রীগুলি নিঃসন্দেহে লক্ষ্মীর অনার্য-উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করে। তাছাড়া লক্ষ্মীর কোন পরিচয় ঋক্‌বেদের কোথাও নেই। অথর্ববেদে লক্ষ্মীস্তোত্র আছে। তাতে দুটো লক্ষ্মীর পরিচয় পাওয়া যায়। একটি শুভলক্ষ্মী, অন্যটি অশুভ বা অ-লক্ষ্মী। অ-লক্ষ্মীই সাম্প্রতিককালের বাংলার কোজাগরী লক্ষ্মী। লক্ষ্মীব্রতের লক্ষ্মীও 'অ-লক্ষ্মী'।

---

১. শস্য সংগ্রহের কালে পেচকতে লোকেরা কুটার ছড়াগুলি দিয়ে তাদের মা লক্ষ্মীর মূর্তিটি গড়ে। পূজার পূর্বে তিন রাত্রি জাগরণ করে ছড়াগাছা বা সন্ধ্যাছড়াকে নজরে-নজরে রাখা নিয়ম। একে পূর্ণিমা জাগরণ বা কোজাগর বলা যেতে পারে। বাংলার ব্রত/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/পৃঃ ২০

২. 'Lakshmi was originally a non-Aryan primitive deity.'—A Study of the Vrata Rites of Bengal. —Dr. S. R. Das.

মেয়েরাই এর পূজারী। কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র প্রয়োজন হয় না অ-লক্ষ্মী'র ব্রতে। যশোহর ও ফরিদপুরে নারিকেল-মালা, কলাগাছ, পেঁচা, এবং ধানের ছড়া লক্ষ্মী পূজায় অবশ্যই প্রয়োজন হয়। আবার প্রাচীন সংস্কারানুযায়ী 'শূয়রের দাঁত' ও 'কুবেরের মাথার খুলি' নারকেল মালা ও ধানের ছড়ায় প্রতীকে বোঝানো হয়। একদা এই তামসিক বা তান্ত্রিক উপকরণগুলি অপরিহার্য ছিল। আজকে শুধু প্রতীকই রয়েছে। বাংলার এই লক্ষ্মীর সঙ্গে মেক্সিকোর শস্যদেবীর রূপগত সাদৃশ্য আছে। মেক্সিকো ও পেরুতে শস্যদেবীর সামনে নারীবলি দেওয়া হত এবং বলি প্রদত্ত নারীর মাথাটা দেবীর উপাচার হিসাবে অর্পণ করা হ'ত। বাংলা দেশেও তাই 'নারকেল মালা' মাথার পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে লক্ষ্মীপূজায় কলার খোল দিয়ে নৌকা তৈরী করা হয়। এতে সমুদ্রগামী, নদীচারী বাঙ্গালীর বাণিজ্য জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যাপদে ও মঙ্গলকাব্যে (ধনপতি, চাঁদসদাগর) বাঙ্গালীর বাণিজ্য বিস্তারের পরিচয় আমরা পেয়েছি। নৌকা সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির অবদান। বাংলাদেশে তার চিহ্ন ব্রত-পূজায় আজও পাওয়া যায়। লক্ষ্মী পূজাকে বিশেষজ্ঞরা তাই বলেছেন—এটা একটা কৃষি উৎসব এবং স্পর্শমূলক যাদু এর পূজাচারে একাত্ম হয়ে আছে। বাংলা দেশে লক্ষ্মী পূজার সময় গৃহাঙ্গনে 'অ-লক্ষ্মী বিদায়' নামে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। এই 'অ-লক্ষ্মীই' প্রকৃত কৃষিদেবী আর্যেতর মানবসমাজের লক্ষ্মী। ব্রাহ্মণ্য ও শাস্ত্রীয় পূজাচারের প্রাবল্যের যুগে 'অ-লক্ষ্মী' অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয় হয়ে উঠোনে আশ্রয় পেল। অনেক ক্ষেত্রে পুরোহিতেরা বাঁ হাতে পূজা করেন এই 'অ-লক্ষ্মী'কে। মেয়েরা বলেন : 'অ-লক্ষ্মী বিদায় হ' লক্ষ্মী আসে ঘরে'।[১] অনেকটা ভূত ও প্রেত-তাড়ানোর মত। বাংলাদেশে 'গার্সীব্রতে'ও অনুরূপভাবে ভূত তাড়ানোর রীতি আছে। লক্ষ্মীর পাঁচালী ও ব্রতকথা বাংলার মেয়েরা প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পাঠ করেন। বৃহস্পতিবার মেয়েদের 'লক্ষ্মীবার'। পৌষলক্ষ্মীকে মেয়েরা ছড়ার মধ্য দিয়ে বন্দনা করেন :

"ধান এলো ছালা ছালা
তাই তুলতে এত বেলা

---

১. অবনীন্দ্রনাথ : গৃহস্থের বড় ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীপূজার পূর্বে, ঘরের বাহিরে একটি পূজা চলে; তাকে বলা হয় 'অ-লক্ষ্মী বিদায়'। এটি শাস্ত্রোক্ত দীপান্বিতা।...... আচমনান্তে সামান্যার্ঘ্য ও আসন-শুদ্ধি করিয়া অ-লক্ষ্মীর ধ্যান যথা 'ওঁ অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাং কৃষ্ণবস্ত্র পরিধানাং কৃষ্ণ গন্ধানুলেপনাং তৈলাভ্যাক্ত শরীরাং মুক্ত কেশীং দ্বিভুজাং বামহস্তে গৃহীত ভস্মনীং দক্ষিণ হস্তে সমার্জনীং গর্দভারূঢ়াং লৌহাভরণ ভূষিতাং বিকৃতদ্রংষ্ট্রাং কলহপ্রিয়াং' ইত্যাদি।

—বাংলার ব্রত

কোথায় রাখি ধানের ডালা
ঐ দেখ না ধানের গোলা।
গোয়ালে গরু মরাই এ ধান
তাতেই লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান॥"

শেষের পদটি অত্যন্ত অর্থবহ। কারণ লক্ষ্মী 'গোয়ালে' ও 'মরাইতে' অধিষ্ঠান করেন। গৃহের বাইরে প্রকৃত লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। এই লক্ষ্মীই কৃষির লক্ষ্মী। 'অসুর' ও 'দানবে'র লক্ষ্মী। 'কুৎসিৎ' বা 'কুরূপা' বলে শাস্ত্রকারগণ এই লক্ষ্মীকে বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তারা কল্পনা করেছেন এক 'সুন্দরী লক্ষ্মী'। এটা তাদের মানসসুন্দরী, মানসী, লক্ষ্মীপ্রতিমা। প্রকৃত শস্যদেবী নন। পৃথিবীর প্রায় সবদেশের কৃষি-কর্মের সঙ্গে বিভিন্ন পূজাচার লগ্ন হয়ে আছে। কালক্রমে এই ছোট ছোট পূজাচার সমষ্টিচেতনার আলোকে উৎসবে পরিণত হয়েছে।[১]

'সারা বাংলা দেশে মৃগশীর্ষ বা মৃগশিরাকে অগ্রহায়ণ বললেও কাঁথির লোকেরা একে বলেন 'মগশির' মাস। মগশির শব্দের অর্থ শীর্ষ স্থানীয়। মগশির মাস শস্য সঞ্চয়ের মাস। ঘরের বউ হলেন গৃহলক্ষ্মী। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, এই মাসে তাঁকে নিজের বাড়ীতে আসতেই হবে, প্রথম বৃহস্পতিবারে ধান্য সংস্থাপনের জন্য। ধান্য সংস্থাপনের দিন লক্ষ্মীর আসনের সমস্ত পুরাতন জিনিস জলে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে সাজাতে হয়। নতুন ঘটে আম্রপল্লব তার মাঝখানে একটি আস্ত কাঁচা সুপারি দিয়ে তাতে চুয়া, চন্দন, সিঁদুর দিয়ে সাজানোর পর মনে হয় যেন একটি ছোট্ট কচিমুখ। ঘটের সামনে তিনটি বেতের তৈরী কুন্‌কেতে সাদা ধান ভর্তি করে ওগুলোর উপরেও আস্ত কাঁচা সুপারী দিয়ে সাজায়। আসনের সামনে একটি নতুন চুপড়িতে সাদা ধান ভরে অনুরূপ ভাবে সাজিয়ে রাখে। লক্ষ্মীর ডানদিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কল্পনা করে তিনটে গোবরের মূর্তি তৈরী করে মাথায় গুঁজে দেয় তিনটি ধানের শীষ। বাইরের উঠানের দিক থেকে ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত পিটুলিগোলা জল দিয়ে কমল বনের ভিতর দিয়ে কমলার আগমনীর পদ-চিহ্নের আলপনা দেওয়া হয়। ফলমূল ইত্যাদি নৈবেদ্যাদিসহ পূজার শেষে ধান-ভর্তি চুপড়িটিকে গোলার ভিতরের পুরাতন ধানের চুপড়িকে বের করে তার জায়গায় নতুনটিকে স্থাপন করে। আবার যেদিন খরচের জন্য গোলা ধান বেরোবে সেদিন প্রথমে চুপড়িটিকে বের করে গোলার নীচে রাখে, প্রয়োজন মত ধানগোলা

১. **Agricultural operations are associated with a series of ritual festivals.**
—Encyclopaedia of the Social Sciences. Vol. V/1954
Edited : Edwin R. A. Seligman.

থেকে বের করে নিয়ে পুনরায় ওটিকে গোলার মধ্যে যথাস্থানে রাখে ও খরচের ধান থেকে তিনমুঠো ধান তুলে নিয়ে গোলার মধ্যে ফেলে দেয়। এই ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের নাম 'আগজ'। 'আগ' শব্দের অর্থ অগ্রভাগ। বছরের প্রথম যেদিন গোলা থেকে খরচের ধান বেরোয় তাকে বলে 'মচা অনকুন'। 'মচা' শব্দের অর্থ গোলা, 'অনকুন' শব্দের অর্থ নিষ্ক্রমণ আরম্ভ। এককথায় গোলা থেকে প্রথম ধান বের করার দিনকে 'মচা অনকুন' বলে। ঐদিন বাড়ীর মেয়েরা নিরামিষ হবিষ্যান্ন করেন। দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে 'তরল' (পায়সান্ন) ভক্ষণ। তৃতীয় বৃহস্পতিবারে পিষ্টক ভক্ষণ ও চতুর্থ বৃহস্পতিবারে উপবাস।

এই মাসে প্রতিটি কৃষক-পরিবারে নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নতুন হাঁড়িতে নতুন চাল দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে ভাত রাঁধে। নবান্ন শব্দের নব শব্দকে নবম অর্থ করে প্রায় সব বাড়ীতেই নয় রকমের তরকারী রান্না হয়। প্রথমে রান্না-ঘরের ঈশান কোণে কৃষি-দেবতা ঈশান-শিবের উদ্দেশ্যে একটি কলাপাতায় ভাত ও সমস্ত তরিতরকারী নিবেদন করা হয়। পরে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে নবান্ন দেয়। আবার কোন কোন পরিবারে নতুন চালের 'পিণ্ড' (আতপ চাল, কলা, দুধ, গুড় বা মধু, ঘৃত এই সব একত্রে মাখিয়ে গোল্লা পাকান) ইত্যাদি কৌলিক প্রথা অনুযায়ী ব্যবস্থা করে। যে যতই দরিদ্র হোক না কেন নবান্নের দিন যে যার সাধ্যমত প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। এই প্রসঙ্গে বারো মাসে তের পার্বণের লৌকিক প্রশস্তি তুলে ধরা যাক্।

বারো মাসে তের পর্ব :

"মাঘেতে মকর মিঠা কটুতেলে সিম,
ফাল্গুনে দ্বিগুন মিঠা কার্তিকেতে নিম।'
চৈত্রে শ্রীফল মিঠা খেয়েছিলেন রাম,
বৈশাখেতে শশা মিঠা যোউল মাছে আম।
জ্যৈষ্ঠেতে পাকা আম, আষাঢ়ে কাঁঠাল,
শ্রাবনেতে খই দই, ভাদ্রে পাকা তাল।
আশ্বিনেতে শুয়া নারিকেল, কার্তিকেতে ওল,
অগ্রাণেতে নতুন অন্ন চিংড়া মাছের ঝোল।
পৌষেতে মূলা মুড়ি খেতে লাগে মিঠা,
ঘন আউটা গরম দুধ বাসি পোড়া পিঠা।

বারো মাসে তের পর্ব আর বলব কি?
পান্তা ভাতে বেগুন পোড়া, গরম ভাতে ঘি।[১]

শস্য উৎসব হিসেবে নবান্ন, টুসু, ভোমলা ও লক্ষ্মীব্রতের এবং পূজার এক অসাধারণ মূল্য আছে বাংলার সমাজজীবনে। উৎসব, মেলা-পরব সমাজ-বন্ধনের এক অসামান্য উপকরণ। সমাজ মানসকে আনন্দ চঞ্চল করে উৎসব। পৃথিবীতে এমন মানব সমাজ নেই যাদের পরব নেই, উৎসব নেই, মেলা নেই। রূপকথার ভ্রমর যেমন রাক্ষস-খোক্কসের প্রাণ, উৎসব তেমনি মানব সমাজের প্রাণ। দেশের, সমাজের বাইরের রূপ বদলালেও এক পরাজেয় সঞ্জীবনী শক্তি যুগ-যুগান্তরেও দেব-দেবী, উৎসব, পাল-পার্বণ, ব্রতানুষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখে। এখনও পৌষে, ভাদ্রে, আশ্বিনে, অঘ্রানে, ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির রঙ্গশালায় ফুলফোটানোর খেলা চলে; আর গাঁয়ের দেব-দেউলে, 'দেওথানে', তুলসীতলায় সাঁঝ-সকালে জ্বলে মাটির প্রদীপ। মানত করে হাতি-ঘোড়ার-পুতুল, সিন্নি দেয় পঞ্চাননকে, সত্যপীর ও মানিকপীরকে। দরগা আর দেউল এক হয়ে যায়। সমাজ ভুলে যায় বর্ণের বেড়া। হিন্দু-মুসলমান তখন একই দেবতার কৃপাকাতর। সেইজন্যই মনে হয় মেলা ও পরবগুলি সমন্বয়ের তীর্থ। ভারতীয় লোকসমাজের অমর আত্মার মিলন দেউল।

ভাদু:

ভাদু প্রান্ত বাংলার একটি লোকোৎসব। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলেই এর প্রসারণ সীমা। টুসুও তাই। ভাদ্র-সংক্রান্তিতে ভাদু উৎসব হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে হয় টুসু। পৌষ মাস শস্য মাস। ভাদ্র মাসও তাই। বাংলাদেশে দু'রকমের ধান জন্মে। এক: আমন—অগ্রহায়ণ-পৌষে সংগ্রহ করা হয়। দুই: আউস-ভাদ্র মাসে চয়ন করা হয়। শস্য আহরণের মাসে অনুষ্ঠিত হয় বলে গবেষকেরা টুসু ও ভাদুর মধ্যে সাদৃশ্য আছে মনে করেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন: পূর্ব-দক্ষিণ মানভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম এই অঞ্চল ব্যাপিয়া কুমারীদিগের মধ্যে ভাদ্রমাসে যে গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হিন্দু প্রভাববশতঃ বর্তমানে একটি পূজার আকার ধারণ করিয়াছে—তাহা ভাদু পূজা নামে পরিচিত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আদিবাসীর 'করম' উৎসবেরই একটি হিন্দু সংস্করণ মাত্র।···আদিবাসীর করম-উৎসব বর্ষা-উৎসব, ভাদু উৎসবও

১. পূর্ণচন্দ্র বাস/চতুষ্কোণ/পৌষ। ১৩৭৮

বর্ষা উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে।[1] করম উৎসব মূলতঃ বৃক্ষবন্দন', বৃক্ষোৎসব। উৎসবকাল যদিও বর্ষা। ভাদু উৎসব বর্ষাকালে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভাদুর সঙ্গে বৃক্ষের প্রত্যক্ষ সংযোগ কোন আচারে দেখতে পাওয়া যায় না। উর্বরতাবাদের সঙ্গে এর একটা সংযোগ রয়েছে। ভাদুকে কেউ কেউ 'মদনোৎসব'ও বলেছেন। কেননা এই উৎসবের নৃত্য-গীতে নর-নারী অবাধ মেলামেশা করত। বিশেষত বাগ্‌দী, বাউরী, মালো, মাহাত এবং ভূমিজরা নৃত্যগীত করত এই উৎসবে। এই উৎসবে অবাধ যৌন মিলনের কোন বাধা নিষেধ ছিল না। সম্ভবতঃ এই অবাধ যৌন সংগমের ফলে সম-রক্ত পরিবারের সৃষ্টি হয়। একে নৃতত্ত্বে বলা হয়েছে—'কনস্যানগুইন পরিবার প্রথা'। এই ধরণের পরিবার প্রথা অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। এই প্রথানুসারে মাতাপিতা ও সন্তানের যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্পর্ক সিদ্ধ ছিল। শাক্যদের মধ্যে ভগ্নিবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বুদ্ধদেব নিজ মাতুলকন্যা গোপাকে বিয়ে করে-ছিলেন। আদিবাসীদের মধ্যে যে যৌন সংযোগের অবাধ স্বাধীনতা ছিল, সেটা আজ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত। কেননা সমাজ-বন্ধনের মূলনীতি টোটেম ও ট্যাবুর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। বাঙালী সমাজে তাই সমগোত্রের মধ্যে রক্তসম্পর্ক বা বিবাহ নিষিদ্ধ। ভাদু 'মদনোৎসব' কিনা এ বিষয়ে কোন বাস্তব তথ্য নেই। তবে প্রাক্তন আচার স্মৃতির সঙ্গে এর যোগ থাকা বিচিত্র নয়। প্রান্ত-বাংলায় প্রতি বছর সাঁওতালদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার 'বাহা' নামে এক বার্ষিক উৎসব হয়। সেখানে দূরদূরান্তের পল্লীর যুবক-যুবতীরা সমবেত হন। চলে নাচ-গান গভীর রাত পর্যন্ত। এই নৃত্য-গীতের মধ্যে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন হয়। পরে 'পাহান' উপযুক্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই বিবাহকে সমাজ-স্বীকৃতি দান করেন।

ভাদু উৎসবে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে প্রান্ত বাংলায়। পুরুলিয়ার পঞ্চকোটের রাজা ছিলেন নীলমণি সিংহ দেবশর্মা। তাঁর আদরের কন্যার নাম ছিল ভদ্রেশ্বরী। ভদ্রেশ্বরীর কাহিনীই ভাদু নামে প্রচলিত—এটাই লৌকিক বিশ্বাস। এর সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীও মিশেছে। সে অর্বাচীনকালের কাহিনী। লৌকিক গানের মধ্য দিয়ে যে লোককথাটি মানভূম অঞ্চলে প্রচলিত তা কাহিনী-রসের দিক থেকে চমৎকার। যেমন—

প্রশ্ন : জানো কি ভাদুরাণীর পরিচয় ?
যেথা সেথা ভাদুর পূজা কি কারণে হয়।

---

১. বাংলার লোকসাহিত্য। পৃঃ ১৮১

এল ভাদু কোথা হ'তে
কে পারে তাই সন্ধান দিতে ?

উত্তর : শুনেছিলাম মালভূমেতে রাজবাড়ীতে জন্ম হয়।
ভাদু আমার রাজার মেয়ে, পণ ছিল যে করবে না বিয়ে,
ছিল তাই আইবুড়ো হ'য়ে কত লোকে কত কথা কয়—
আইবুড়ো বয়সে ভাদু, চিনে নিলে আপন বঁধু
পান করে রাইকমল মধু, সেইত পতি সুনিশ্চয়॥
ভাদু আবার ছেলেবেলা, করেছিল কত লীলা
যৌবনেতে রাজবালা চোখের অগোচর হয়॥
সারা ভাদর লীলা করে সংক্রান্তিতে লুকালো রে,
'হা ভাদু', 'হা ভাদু'—বলে রাজারাণীর ধারা বয়॥
সেই অবধি রাণীরাজা, প্রচার করেন ভাদুর পূজা
ভক্তিতে যে করে পূজা, দূরে যায় তার যম ভয়॥
অদ্যাবধি ভাদ্রমাসে আসে ভাদু ভাবাবেশে
বিভু বলে ভালবেসে দাও গো সবে ভাদুর জয়॥[১]

—এই কাহিনীতে ভাদু ভদ্রেশ্বরী রাজকন্যা। ড: সুধীর করণ মনে করেন: 'ভাদু উৎসব ব্যক্তিপূজা বা স্মৃতিপূজার একটি বিশিষ্ট নজীর মাত্র। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগেই ভাদু পূজার সূত্রপাত হয়।[২] পঞ্চকোট রাজকন্যার অকাল বিয়োগ ব্যথা প্রজা সাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। কাজেই সেই বেদনার দিনটি স্মরণ করার জন্য ভাদ্রসংক্রান্তির পূর্বদিন ভাদু-জাগরণ হয়। সাঁওতালী উপকথায় পঞ্চকোটরাজ দেবতায় পরিণত হন। তাঁকে বলা হয়েছে 'বোঙা'। বিচিত্র ভাবানুষঙ্গের মিশ্রণে ভাদু উপাখ্যান এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন প্রচারিত হ'য়েছে। সেজন্য নানা উপকরণ এর সঙ্গে মিশে গেছে। যৌবনের বনকুসুম ভদ্রেশ্বরী। তার স্মৃতিপূজা আজও মানভূম, মল্লভূমের বাগ্‌দী, বাউড়ীরা পালন করেন। বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বাউড়ীরা ভাদুমূর্তিকে নিয়ে শবযাত্রা করেন। টুসুর মত ভাদুর আগমনে চলে নাচ-গান। মেয়ে-পুরুষের কণ্ঠ মুখর হয় গানে গানে: আনন্দে কেউ গান—

১. সীমান্ত বাংলার লোকযান/পৃ: ১৩৩
২. Indian Folklore—Oct—Dec. 1957 p. 68

আমার ভাদু ঘরকে এলো
কুথায় বসাব ?
পিয়াল গাছের তলায় বেদী,
আসন সাজাব।
আ-না-না-না
আমার সোনার ভাদু
কোলে তুলে নাচাবো।

—ভাদুর সঙ্গে টুসুর ভাবগত একটা ঐক্য আছে। উভয়েই বড় স্নেহের পুতুল। ভাদুমূর্তি পদ্মাসনা, অপূর্ব সুন্দরী। মানুষকে দেবত্ব আরোপ করা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'দেবতাকে প্রিয়' আর 'প্রিয়কে দেবতা' করাই ভারতীয় মানসিকতার প্রধান ধর্ম। ভাদুর মত টুসুতেও বাৎসল্য রস দেখতে পাই মেয়েদের গানে। যেমন :

আমার টুসু তুলসী বনে
তুলসী বাস করে।
কাল্‌কে যাবে ভাসানে গো
রইব আমি কেমন করে ?

ভাদ্র সংক্রান্তির দিন ভাদুর বিসর্জন হয়। সেদিন জয়পুরে (পুরুলিয়ায়), পককোটে বিরাট মেলা বসে। ভাদুর বিসর্জনেও শোভাযাত্রা হয়। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য যে টুসুর ভাসানে কোথাও টুসুর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না। শুধু গোবর নাড়ু আর চোড়ল বিসর্জন দেওয়া হয়। ভাদু ভাসানে কিন্তু ভাদুর মৃন্ময়ী মূর্তিই বিসর্জিত হয়। হিন্দু প্রভাব এখানে প্রত্যক্ষ। ভাদু বিসর্জনের করুণ বিষণ্ণ কান্না প্রকৃতিতে প্রতিধ্বনিত হয়। ভাদ্র ফসল ঘরে এলো ; কিন্তু রিক্ত মাঠের কান্না যেন মায়ের বিষণ্ণ কান্নায় ধ্বনিত। ভাদু বিসর্জন দিতে গিয়ে মেয়েদের কণ্ঠ বেদনায় গুমরে উঠে।

প্রাণে ধৈর্য ধরে
প্রাণের ভাদু বিদায় দি কেমন করে।
সারা বছর কেঁদে কেঁদে গো পেয়েছি বছর পরে
সুখের হাট ডুবাই কেমনে বিপদেরি সাগরে॥

বিষণ্ণ রাগিনীতে ভরা ভাদু গানের রেশ পুরুলিয়ার আকাশ-বাতাস মুখর করে ভাদ্রসংক্রান্তিতে। বছর বছর মেয়েরা ভাদুর স্মরণে এই উৎসব উদ্‌যাপন করে বলেই একে বলা চলে 'স্মরণ উৎসব'। 'স্মরণ উৎসব' আজও হিন্দুদের মধ্যে

প্রচলিত আছে। যদিও শাস্ত্রীয় মণ্ডনকলা 'শ্রাদ্ধানুষ্ঠান'কে বিশিষ্টতা দান করেছে। একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই উৎসব 'স্মরণ উৎসব'। একে 'পূর্বপুরুষ পূজা'ও (Ancestor Worship) বলা চলে। অনেকে বলেছেন ভাদু টুসুর অনুকরণে গড়ে উঠেছে।[১] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ'কথা সত্য নয়। কেননা টুসুতে ভাসানের বেদনা ও বিষণ্ণতা আছে বটে; এই বেদনা ও বিষণ্ণতা বিরহ যন্ত্রণায় দুর্মর নয়। বরং আনন্দ রসময়। টুসু ফসল সংগ্রহের উৎসব। কাজেই নর-নারীর মন পৌষের সোনালী পরিবেশে আনন্দে উজ্জ্বল থাকে। অধিকন্তু টুসুতে প্রাক্তন কোন মর্মান্তিক উপাখ্যানের স্মৃতি নেই। সেজন্য পৌষ লক্ষী টুসু আদরিনী হলেও বিদায় দৃশ্য 'ট্র্যাজিক' নয়। ভাদুর ভাসান প্রকৃতপক্ষেই 'ট্র্যাজিক', করুণ রসঘন।

ভাদু উৎসবে একদিকে রয়েছে ভাদ্র ফসল আউস ধান; আবার অন্যদিকে রয়েছে এক রাজকন্যার মর্মান্তিক জীবন কথা। উভয় পর্ব কিন্তু একসঙ্গে সৃষ্ট হয়নি। প্রথমটির সঙ্গে পরবর্তী পর্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে। সুতরাং ভাদুকে মিশ্র-প্রকৃতির উৎসব বলা চলে। একাধারে প্রাচীন এবং অর্বাচীন।

সয়লা উৎসব :

'সয়লা উৎসব' মেদিনীপুর, হুগলী, বাঁকুড়া অঞ্চলে এবং পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের কোন ঋতু নেই, কাল নেই। জীবন অসীম, কাল নিরবধি। সুতরাং সীমার বন্ধনে এই উৎসবকে বেঁধে দেয়নি লোকসমাজ। এর ভাবনায় আনন্দ আছে, আছে মুক্তি।

"সয়লা উৎসব হল বন্ধুত্বের উৎসব।" এই মন্তব্য করেছেন বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও 'বন্ধুত্বের উৎসব' প্রচলিত রয়েছে। আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে আজও এই ধরনের উৎসব রয়েছে। 'নববর্ষ' বা 'নিউ ইয়ার্সডে', দুর্গোৎসবের 'বিজয়াদশমী'কে মিতালি উৎসব বলা চলে। 'রাখীবন্ধন' আজও আমাদের সংস্কৃতিতে সেই মিতালি উৎসবের জীবন্ত নিদর্শন হিসেবে প্রচলিত রয়েছে।[২]

গ্রামদেবতার থানকে বা গ্রামদেবতাকে আশ্রয় করে এই উৎসব বিকশিত হয়। নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন এই মিতালি উৎসব 'Festival of friendship' বহু প্রাচীনকালের স্মৃতিচূর্ণ বহন করে। এই উৎসব আদিম সমাজের একটি সামাজিক

১. সীমান্ত বাংলার লোকযান।
২. বাংলার স্ত্রী-আচার/পৃঃ ২১/ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী সংকলিত/বিশ্বভারতী প্রকাশন

অনুষ্ঠান। টুসু উৎসবে 'টুসুসই পাতানো' অনুষ্ঠান মিতালি উৎসবের নামান্তর মাত্র। টুসুর 'মালা বদলে' লোকসমাজে বিশেষতঃ মেদিনীপুর, পুরুলিয়া অঞ্চলের মেয়েরা পারস্পরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করে। বাংলাদেশে বিবাহ উৎসবে পাড়া-পড়শীদের মিতালি স্থাপনার জন্য 'পানখিলি' বিতরণ করা হয়। সধবারা সাধারণতঃ এই 'পানখিলি' অনুষ্ঠানে যোগ দেন। "পানখিলি'র দিন থেকে বিয়ের পূর্বদিন পর্যন্ত প্রতি রাত্রেই মহিলারা উৎসবের গান করে থাকেন।[১] মানব সভ্যতা বিকাশের পথে বহু জাতির লোকের পারস্পরিক মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে পৃথিবীর বিভিন্ন উপকণ্ঠে। গোষ্ঠী, পরিবার, গ্রাম, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র, বিশ্বরাষ্ট্র প্রভৃতির বিবর্তন ধারায় মানবিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করেছে এক আদিম মিতালির ভাব (Primitive Comradeship)। পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ না করলে, প্রীতি-প্রেম-ভালবাসার রাখীবন্ধন না করলে সমাজের বিকাশ এত ত্বরান্বিত হত না। পৃথিবীতে মানবসমাজ গড়ে উঠত না। তাই মনে হয় 'সয়লা', 'টুসুসই', 'মালাবদল', 'বিজয়া', ঈদ ইত্যাদি পরবের একান্ত প্রয়োজন ছিল লোকসমাজে। উৎসব মাত্রেই কল্যাণ ধর্মে উজ্জ্বল। সান্তের সঙ্গে অনন্তের, সীমার সঙ্গে অসীমের, একের সঙ্গে অন্যের, দেবতার সঙ্গে মানুষের মিলন সাধন করাই উৎসবের মূলকথা। বাংলার মেলার প্রত্যক্ষ পটভূমিতে আমরা এই সত্যের অরুণালোক দেখতে পাই।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে শুধুমাত্র দৃশ্য জগৎই সব কিছু নয়। অদৃশ্য অমৃতলোকও তার অধ্যাত্ম চেতনায় আলোময় হ'য়ে উঠেছে। শুধুমাত্র বর্তমান জীবনই নিঃশ্রেয়স নয়, অতীত জীবনও আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয়। শাস্ত্র তাই বিধান দিয়েছে পিতৃপুরুষ বন্দনার—শ্রাদ্ধ-তর্পনের। দেবতা আমাদের আত্মীয়। আমরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করি। আত্মায় বিশ্বাস করি। সেই জন্য পৌষে 'আকাশপ্রদীপ' জ্বালি। কালীপূজায় 'দাপাবিতা' করি। 'দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি'—এটা শুধু কাব্যসত্য নয়, আধ্যাত্মিক সত্যও বটে। স্বর্গের সঙ্গে এ যেন মর্তের অনন্তকালের এক মধুর মিতালি। এ শুধু অন্ধকার থেকে আলোর পথে অভিসার নয়। বরং অমৃতলোকে আত্মার প্রতিসরণের আলোর দিশারী। 'আকাশ প্রদীপ' স্বর্গের সঙ্গে মর্তলোকের আলোক সেতু॥

ঈদ্-উল্-ফিৎর :

মিতালি উৎসব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে প্রসঙ্গক্রমে বাংলার মুসলমানদের ঈদ্-উল-ফিৎর এর আলোচনা করতে হয়। রমযান মাসে 'ঈদ্-উল-ফিৎর' অনুষ্ঠিত হয়। আরবীতে 'ঈদ্' শব্দের অর্থ হ'ল 'আনন্দ'। এই রমযান মাসে

নিষ্ঠাবান্ মুসলমানেরা ঊষা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করবেন। পবিত্র কোরাণের বিধান অনুসারে এই উৎসবে কয়েকটি করজ—অবশ্য পালনীয় বিধান পালন করতে হয়। রমযান মাসের উপবাসকে বলা হয় 'রোজা'। 'রোজ' শব্দজাত। ইসলামের পঞ্চরুজ বিধান অনুসারে 'রোজা' পালন করা হয়।

প্রথম : 'কালিমা'—ধর্মীয় অনুশাসন বা বিধি নিষেধ
দ্বিতীয় : 'নমাজ'—প্রার্থনা
তৃতীয় : 'শওম'—উপবাস
চতুর্থ : 'হজ'—তীর্থযাত্রা
পঞ্চম : 'জকৎ'—দান

রমজানের রোজা বা উপবাস অবশ্য পালনীয়। বাংলা দেশের ধর্মোৎসবে ভক্ত্যারা যেমন 'সংযম' করেন, এখানেও তেমনি। উপবাস চিত্তশুদ্ধ করে, চিত্তের একাগ্রতা বাড়ায়। মহাত্মা গান্ধীও চিত্তসংযমের জন্ম উপোস করা প্রয়োজন মনে করতেন। কৃচ্ছ ও সংযম অভ্যাসের দ্বারা মুসলমানেরা দৈহিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করেন। বৌদ্ধদের 'পঞ্চশীলের' মত ইসলামের 'পঞ্চশীল' পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের সোপান। 'তেলাওয়াৎ' (কোরান পাঠ), 'নমাজ' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চিত্তের একাগ্রতা আসে। তারপর সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে 'আজানের' ধ্বনি উঠে। যেন বিশ্বকে ব্রতী জানায়—আমার ব্রত শেষ হয়েছে, আল্লার মহিমা বিশ্বের কাছে ঘোষণা কর। তারপর পরস্পর মেলামেশার আনন্দে মুখর হয়। ব্রতীরা 'শরবত' ইত্যাদি পান করেন। আর চলে সান্ধাহ্নিক ভোজন পর্ব। আরবী ভাষায় একে বলে : 'ইফতার'। আবার ভোররাত্রে একবার আহার করেন রোজা শুরু করার আগে। একে বলে 'সেহেরী'। রাত্রে 'তারাবেত' নামাজে সবাই সমবেত হন। একমাসকাল এই পর্ব চলার শেষে 'খুশির ঈদ' দেখে তাদের কঠোর ব্রত সাঙ্গ করেন। 'ঈদগাহের' বা সমবেত নামাজের পর পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন। প্রীতি বিনিময় করেন। যেন দুর্গোৎসবের 'বিজয়া' পর্ব। 'ঈদ-উল-ফিৎর' এর অন্তিম দিনে প্রত্যেক মুসলমান দীন-দুঃখীদের দান করেন সামর্থ্যমত। একে 'খেৎরা' বা 'খয়রাত' বলে। ইসলাম ধর্ম মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য বিধানের জন্ম এই বিশেষ উৎসবগুলির সৃষ্টি করেছে। একে মুসলমানদের 'মিতালি উৎসব' বলা চলে। এবং 'মহরম'কে বলা চলে 'স্মরণ উৎসব'। ইমাম হোসেনের কারবালা প্রান্তরে অমর আত্মদানের স্মৃতি ইসলাম জগৎ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে 'মহরম' উৎসবে। 'মহরমের' 'আলম' বা ধ্বজা দণ্ড রাঢ় বাংলার ইন্দ্রধ্বজ বা ঈদ পরবের সঙ্গে তুলনীয়। ভাদু উৎসবের মত 'মহরম' করুণ স্মৃতিবহ উৎসব।

এই স্মরণ উৎসবে শোভাযাত্রা বের করা হয় 'তাজিয়া' শবাধার সহ। এবং শোভা-যাত্রীরা শোকসূচক কালো বস্ত্র পরিধান করেন। মহরম মাসের প্রথম দশদিন ধরে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়।

সত্যপীর :

সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের উৎসব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত আছে। মেয়েদের ব্রত কথাতেও সত্যপীর আসন পেয়েছেন। সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাঠ করে মুসলমান 'দরবেশ'গণ বাংলাদেশের গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়াতেন। হিন্দু-মুসল-মানের মিলনতীর্থ হয়েছে সত্যপীর, মানিকপীর এবং গাজীসাহেবের দেউলে বা দরগায়। বেদ আর কোরানের অনুশাসন এখানে কেমন যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে এই উৎসবে। সত্যনারায়ণের ব্রতের পাঁচালীতে আছে : 'বেদ আর কোরান বুঝিয়া দেখ এক। জগতে নাহিক দুই শুন পরতেক॥' বিশ্ব এক এবং অভিন্ন। ঈশ্বর, আল্লা যে নামেই ডাকিনা কেন-ভগবান এক।

'সিরনী' সত্যনারায়ণের পূজার প্রধান উপকরণ। এই উৎসবের কোন তিথি নেই। পূর্ণিমা-সংক্রান্তি বা শনি-রবিবার এই পূজা করা চলে। ব্রতকথায় বলছে : ভাল ভাল লোক যত পুর মাঝে আনি। সওয়া সের সোনা দিয়া করিল সিরনী॥ মানিকপীর পশুর দেবতা। সত্যপীর মানুষের দেবতা। 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'তে সত্যনারায়ণের অপরিসীম ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে এইভাবে :

ওঝায় কি করে যারে কামড়ায় সাপে।
সত্যপীর রোষে যদি রাখে কার বাপে॥
মৃতবৎসা দোষ ঘুচে আর কাক বন্ধ্যা।
দুর্জনের দুঃখ বাড়ে সত্যপীর নিন্দা॥
সত্যপীর কিছু নহে যেইজন বলে।
শমন শিকল তার লাগে পায়ে গলে॥
সিরনী মানয়ে যেবা হ'য়ে দুই মনা।
সিদ্ধ নহে তার কার্য শুধু বিড়ম্বনা॥

—সত্যপীর এক অজ্ঞাত কারনে বাংলার হিন্দু সমাজে এবং মুসলমান সমাজে আসন করে নিয়েছেন। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতকের পরবর্তীকালে পৌরাণিক হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে বাংলার মুসলমানদের এক সহজ যোগ সাধন হয়েছিল। বাংলার মুসলমানেরা মূলতঃ নিম্নবর্ণের হিন্দুর ধর্মান্তরিত রূপমাত্র। সেজন্য স্মৃতিগত সংক্রমণশীলতা পরস্পর পরস্পরকে কাছে টানে। সংস্কৃতি লেন-দেন করে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাক্ আধুনিক কাব্যসাহিত্য ও কেচ্ছা কাহিনী এই সত্যতা প্রমাণ করে।

পীর ও গাজি সাহেব ২৪ পরগণার লোকপ্রিয় গ্রামদেবতা। সুন্দর বনাঞ্চলে গাজীসাহেব, বিবিমা, বনবিবির সঙ্গে পীরেরও সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রামদেবতার গুণাবলী পীর ও গাজীসাহেবের মধ্যে আরোপিত করে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা লোকেরা বিশেষতঃ জেলে, মালো, কাঠুরে, বাগ্‌দী, বাউড়ী, কৈবর্ত প্রভৃতি এই দেবতাগুলির পূজা করেন। গাজীর পটচিত্র দক্ষিণ বঙ্গের এক উল্লেখযোগ্য লোকশিল্প। বাংলা দেশের যুগসন্ধির সময় পীর ও ফকিরেরা গ্রাম্য দেবদেবীর সঙ্গে সন্ধি করেন। ফলে এক অভিনব সংস্কৃতি সমন্বয় ঘটে বাংলা দেশের লোকায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।

রথযাত্রা :

"যাত্রা, বলিলে সচরাচর গমন বুঝায়। কিন্তু ইহার একটি বিশেষ অর্থ—উৎসব। তাই আমরা বলি—রথযাত্রা, দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা।" পূর্বের দ্বাদশ যাত্রার মধ্যে অন্যতম হলো রথযাত্রা। চড়কে যেমন দোল, এখানে তেমনি চলা—যাত্রা এই যাত্রা জীবনের, বিশ্বের।

আষাঢ় মাসের উৎসব রথযাত্রা। দেবতা গমন করেন আর ভক্ত-পূজারী তাঁর অনুগমন করেন। জগন্নাথদেবের রথযাত্রায়ও তাই ঘটে। এই যাত্রা উৎসব জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা থেকে শুরু হয় এবং শেষ হয় উল্টোরথে। জগন্নাথের রথ। সঙ্গে রয়েছেন সুভদ্রা-বলরাম। পুরীতে (উড়িষ্যায়), মাহেশে (হুগলীতে) বিরাট মেলা বসে রথযাত্রা উপলক্ষে। বাংলার বহু গ্রামে জগন্নাথের মন্দির আছে। ২৪ পরগণার মাহিনগর—মালঞ্চে প্রায় চারশ বছরের পুরানো এক জগন্নাথ-মন্দির আছে। মন্দিরের একমাত্র বিগ্রহ জগন্নাথ। জগন্নাথের মূর্তি অত্যন্ত চমকপ্রদ। আবক্ষ একটি কাষ্ঠ-মূর্তি। এই মূর্তি প্রসঙ্গে পৌরাণিক একটি উপাখ্যান আছে। একদা জরা নামক ব্যাধের শরের আঘাতে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু ঘটল। সব্যসাচী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের মৃতদেহ জামানিক তীর্থে (পুরীতে) দাহ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু দেহ সম্পূর্ণ দগ্ধ হ'ল না। কাঠের গুঁড়ির সঙ্গে দেহাংশ জড়িয়ে রইল। দাহকারীরা এই অবস্থায় কাঠসহ দেহাংশ সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। নাতি দূরে কিছু শবর জাতির লোক বাস করত। শবর-রাজ বিশ্ববসু গোপনে সেই ভাসমান্ কাষ্ঠাংশ সংগ্রহ করল এবং নিভৃতে বনান্তরালে সেই কাষ্ঠাংশ নিত্য পূজা করতে লাগলো। পাঞ্জাব রাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কৌশলে সেই কাষ্ঠাংশ অপহরণ করলো বিশ্ব বসুর কাছ থেকে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশ্বকর্মাকে বললেন একটা জগন্নাথ মূর্তি তৈরী করতে ঐ কাষ্ঠাংশ দিয়ে।

বিশ্বকর্মা বললেন, মূর্তি তৈরী করার সময় কেউ যেন না দেখেন দেখলে মূর্তি অপূর্ণ থাকবে। বিশ্বকর্মা মূর্তি গড়া শুরু করলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও তিনি বের হলেন না। এমন সময় রাজা দরজা খুললেন। দেখলেন মূর্তি অপূর্ণ। হাত পা তৈরী হয়নি। ঐ মূর্তিই "জগন্নাথ" নামে প্রসিদ্ধ হল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথের দেউল স্থাপন করলেন পুরীতে। তিনি শবরদের জগন্নাথ পূজার সেবক নিযুক্ত করেন। এই হলো পৌরানিক উপাখ্যান।

ঐতিহাসিকদের ধারনা শবর জাতি নীলপাথর পূজা করত কোন এক কালে। কালক্রমে ঐ পাথর জগন্নাথদেব হলেন। তারপর কাষ্ঠমূর্তিতে জগন্নাথ বিরাজ করলেন। জগন্নাথ হলেন জগতের নাথ। জগতের নাথ মহেশ্বরও। পাথর পূজার রীতি ভারতে এবং ভারতের বাইরে অত্যন্ত প্রাচীন। সেই আদিম লিঙ্গ প্রতীক পাথর কালক্রমে মূর্তিতে পরিণত হল। যেমন হ'য়েছে ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, শিব ইত্যাদি। অবয়বহীন গাছ-পাথর ভারতের সংস্কৃতিতে, মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই হলো লোকায়ত বিশ্বাস। এটা লোকায়ত ধর্ম মানসিকতার বিবর্তন ধর্মের ফলশ্রুতি।

স্নান পূর্ণিমায় জগন্নাথ দেবের স্নান। সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রার স্নানোৎসব হয়। রথযাত্রার দিন মন্দির থেকে বের হ'য়ে এঁরা অন্যত্র কিছুকাল কাল কাটান। লোকবিশ্বাস মাসির বাড়ীতে। লৌকিক বিশ্বাসে মানুষ ও দেবতা এক হয়ে যায়। প্রায় দশদিনান্তে আবার মন্দিরে ফিরে যান। একে বলে 'উল্টোরথ' বা ফিরতি রথ। চট্টগ্রাম থেকে হুগলী পর্যন্ত রথযাত্রার ব্যাপক প্রচলন আছে। রথযাত্রার সময় বিগ্রহ পূজার্চনার ভার থাকে অব্রাহ্মণদের হাতে। প্রাচীনকালের শবরদের স্মৃতি আজও প্রবহমান বলে মনে হয়। এই উৎসবে কোন জাত বিচার নেই। কালের চক্রতলে সব সমান। কোনারকের 'সূর্যচক্র' জীবনের চক্রলীলার প্রতীক। জগন্নাথের রথচক্রও সেই সত্যের পরিচয়বহ। ধর্ম ও শিল্প যেন এক হয়ে বিরাজ করছে, এক যেন অন্যের পরিপূরক।

ইতিপূর্বে অনেক দেব-দেবীর সমন্বয়ী প্রতিভার কথা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু জগন্নাথের রথযাত্রার মত সার্থক উৎসব ভারতে আর নেই। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক জাতি, এক প্রাণ, একতা একমাত্র রথযাত্রায় দেখা যায়। যবন, মুসলমান, শবর, ম্লেচ্ছ সবাই এখানে আসন পেয়েছে। এটাই যেন রবীন্দ্রনাথের কল্পলোকের বাস্তব 'ভারততীর্থ'। রথের পথই দেবতার ধূলামন্দির। মানুষ ও

---

১. বাঙালীর পূজা—'স্নানযাত্রা'/ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

দেবতার এমন সুন্দর ও সহজ যোগ অন্যত্র দুর্লভ। জীবন ও জগতের চক্রলীলায় রথযাত্রা মানুষকে অমৃতের দিকে নিয়ে যায়। এখানে যেন মুক্তির আনন্দ, বন্ধনের বিরতি।

রথযাত্রা বহু প্রাক্তন স্মৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে, অনেক পৌরাণিক ও আদিম উপকরণ আত্মসাৎ করে আজকের লোকপ্রিয় রথযাত্রায় পরিণত হ'য়েছে। জগন্নাথ দেবের পূজার দিন যে ভোগায় উৎসর্গ করা হয়, তাকে বলে 'লাবড়া'—খিচুরি। এই মিশ্র ভোগায় উৎসর্গ শাস্ত্রীয় বলে মনে হয় না; বরং লোকায়ত রীতির অনুগামী। কথিত আছে, জগন্নাথদেবের মন্দিরে নিত্য উপাসনায় 'দেবদাসী'রা—(দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীতা) নৃত্য-গীত করত। দক্ষিণ ভারতে এখনও সেই রীতি প্রচলিত আছে দেবতার মন্দিরে। মানভূম অঞ্চলেও দেখেছি 'নাচ্‌নী' নামে একশ্রেণীর নৃত্য-গীত পটীয়সী নারী 'টুসু', 'ভাদু', 'ছো' প্রভৃতি অনুষ্ঠানে এমনকি ধর্মোৎসবেও নাচ-গান করেন। তারা দেবদাসীর 'সমতুল্য' সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক কারনে এবং সামাজিক ব্যভিচারিতার জন্য এই প্রথা কিছুটা কমে গেছে। 'দেবদাসী' প্রথাটা শবর বা অন্য কোন আর্যেতর সাংস্কৃতিক উপকরণ বলে মনে হয়। সেই সূত্রে রথযাত্রা ও জগন্নাথদেবের পূজা-উৎসব মূলতঃ প্রাচীন ও আর্যেতর বলে ধারণা হয়। রথযাত্রা সূর্যযাত্রার সাদৃশ্যবাচক বলে রথযাত্রাকে সৌরউৎসব বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। বিশেষতঃ সূর্যের দ্বাদশ যাত্রার অন্তর্ভুক্ত বলেই সৌরউৎসব মনে করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন উপকরণ মিশ্রণের ফলে রথযাত্রা এখন মিশ্ররূপ লাভ করেছে। 'স্নানযাত্রা' বলেও বাংলাদেশে রথযাত্রার নামান্তর প্রচলিত আছে। 'স্নান' যেহেতু উর্বরতাবাদের সঙ্গে আদিম ভাবানুষঙ্গে যুক্ত, সেই কারণে রথযাত্রাকে আদিম উর্বরতার উৎসবও বলা চলে।

বাংলার লোকউৎসব : সমাজ বন্দন

'মাতা ভূমি, তুমি আমাকে সুষ্ঠুভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করো; তুমি কবি অর্থাৎ ঋষির মতো, আকাশের সঙ্গে মিলিত হয়ে, আমাকে ভূতি অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির স্থির আসনে প্রতিষ্ঠিত করো।' [অথর্ববেদ/ভূমিসূক্ত/অনুবাদ :

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়]

এক

পৃথিবীর বুকে মানুষের কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলশ্রুতি হলো সমাজ-সংগঠন ও তার বিশ্বব্যাপ্ত প্রসারণ। এই সমাজকে অবলম্বন করেই মানুষের

বহুবিধ সৃজনশীল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিকাশ। একটি বীজ থেকেই যেমন বনস্পতির সৃষ্টি হয়, তেমনি একটি মানব থেকেই মানবসমাজের বিকাশ ঘটেছে। জীব জগতের এটাই বংশগতি। সংস্কৃতি সমাজ সংপৃক্ত বলেই এর বিকাশও জীব জগতের মত। জন্ম-জরা-মৃত্যু শাসিত মানব জীবনের মত সাংস্কৃতিক জীবনেও জন্ম-জরা-মৃত্যু আছে। উৎস, বিকাশ, সম্প্রসারণ, সংকোচন, বিভাজন ও বিকিরণের নানা সূত্রে সংস্কৃতি জীবকোষের মত সম্প্রসারিত হয়।

বস্তুতপক্ষে মানব সভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্তর হলো কৃষির উদ্ভাবন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই সভ্যতা—সংস্কৃতিতে কৃষি এক যুগান্তকারী ঘটনা। হিন্দুদের প্রায় সব পূজা-পার্বণ কৃষিমূল ও অন্নমূল। উৎসব ছিল ঋতুচক্র, কালিক। কৃষির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিল বর্ষণ ও অনা-বর্ষণ। ফলে বৃষ্টির আবাহন ও অনা-বর্ষণের বিতাড়নের সূত্রে নানা লৌকিক যাদুমূলক অভিচারের সৃষ্টি করেছে আদিম প্রাণবাদী মানুষ। বীজবপন বা শস্য আহরণের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছিল নানা দেবতা। ক্ষেত্রদেবতারা অধিকাংশই নারী। এঁদের যেমন আছে প্রজনন শক্তি, তেমনি আছে পালিকা শক্তি, আর আছে রক্ষণ শক্তি। অধিকাংশ ক্ষেত্রদেবতার উৎসবে সামাজিক ভোজ, নৃত্য ও সঙ্গীত অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠে। এমন কি কোন কোন উৎসবে শিল্পকলা (যেমন আলপনা ও দেয়ালচিত্র) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

দুই

এখানে একটি উৎসবের গঠন কাঠামো বিশ্লেষণ করলে বাংলার লোকউৎসবের রূপ-দর্শন অনুসরণ করা সহজ হবে। বাংলার অসংখ্য লোকউৎসবের মধ্যে নববর্ষ উৎসবকেই নির্বাচন করা যাক্।

নববর্ষ :

এখন যদিও বাংলাদেশে বৈশাখ মাস থেকেই নববর্ষ শুরু হয়, কিন্তু বেশ প্রাচীনকালে নববর্ষ শুরু হোত অগ্রহায়ণ মাসে। সূর্যের চক্রপথকে সেকালে চতুরঙ্গ পর্বে বিভক্ত করা হোত, যেমন—উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, জলবিষুব ও মহাবিষুব। উত্তরায়ণে শীত ঋতু, দক্ষিণায়ণে বর্ষা, জলবিষুবে বসন্ত এই ছিল ঋতুক্রম। বর্তমানে বাংলাদেশে মহাবিষুবে অর্থাৎ বসন্তেই নববর্ষ হচ্ছে।

‘ঋগ্‌বেদের কালে হিমবর্ষ ও শরৎবর্ষ এই দুইটি বৎসর ছিল। পরে আর

একবর্ষ গণিত হইতে থাকে।'[১] মার্গশীর্ষ হলো অগ্রহায়ণ। ভারতবর্ষে রাজা বিক্রমজিতের আমল থেকেই বিক্রমসংবতের প্রচলন। সম্ভবতঃ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বিক্রমজিত সিংহাসন আরোহন করেন। এই পুণ্যদিন থেকেই বিক্রমসংবত প্রচলিত হয়। ১৫১৭ অব্দ থেকেই এই সংবতের প্রবর্তনা। এই সাল গণনা বিক্রমী সাল নামে পরিচিত। জাতিভেদে সন-তারিখ গণনার রীতি ও নাম ভিন্ন। মুসলমানদের সালের নাম 'হিজরী'[৩], হিন্দুদের 'সাল', খৃষ্টানদের 'খৃষ্টাব্দ'।

অগ্রহায়ণ মাস যে সেকালে শস্য ফলনের মাস ছিল এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখেছেন—'ধন্য অগ্রহায়ণ মাস, ধন্য অগ্রহায়ণ মাস বিফল জনম তার, নাহি যার চাষ।' ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অগ্রহায়ণ মাস 'আগাহাণ' নামে পরিচিত। কোথাও কোথাও 'আগন' নাম প্রচলিত রয়েছে।

উত্তরভারতে চৈত্র মাসের শুক্লা তিথিতে বর্ষারম্ভ হয়। এইদিনে কলস স্থাপন, ধ্বজা রোপণ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় ও লৌকিকানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশে বর্তমানে বসন্তে বর্ষারম্ভ হয় বলেই এই সময় বাসন্তী পূজার প্রচলন হয়। অবশ্য আমাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে কোথাও বৈশাখে নববর্ষ উৎসব সম্পর্কিত আচার নির্দেশ নেই।[২] বর্তমানে ব্যবসায়ীরা 'হালখাতা' উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে 'নববর্ষানুষ্ঠান' পালন করেন। চট্টগ্রামে ও আসামে এই বৈশাখী নববর্ষে 'বিউ' বা 'বিহু' উৎসব পালিত হয়। (চট্টগ্রামে এমনি দিনে 'শত্রুনিধনের' (শত্রুবলি) অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। বাড়ির বাইরে প্রাঙ্গনের প্রান্তে প্রবেশ পথে মাটিতে গৃহকর্তা বা সাতক কাস্তে দিয়ে একটি কাল্পনিক শত্রু চিত্র আঁকবেন। তারপর প্রথমে কাল্পনিক শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদ করবেন কাস্তে দিয়ে। এইভাবে পর পর বিভিন্ন অঙ্গ খণ্ডিত করে, 'খইয়ের গুড়ো ও ভাজা কলাই, ছোলা' ইত্যাদি সমেত ছড়িয়ে দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবেন।

সম্ভবতঃ প্রাচীন কৌম জীবনে জীবন সংঘর্ষের ও শত্রুনিধনের এক নির্মম আচার আজও বাংলা তথা ভারতের জনসমাজে নববর্ষের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অথবা বিগত জীবনের পাপকে জীবন থেকে মুছে ফেলার এক রীতি এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। আগামী জীবনকে নিরঙ্কুশ করবার বাসনায় চট্টগ্রাম এবং সন্নিহিত অঞ্চলের জনসমাজে এই রীতির প্রচলন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চৈত্র

---

১. পূজা পার্বণ : যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি

২. হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান : চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

৩. 'হিজরী'—হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতের সময় হতে এই সাল গণনা শুরু হয়। 'মহরম' বছরের প্রথম মাস মুসলমানদের, হিন্দুদের বৈশাখ। খৃষ্টানদের 'জানুয়ারী-এর দেবতা 'জেনুস' (দ্বিমুখ বিশিষ্ট—এক মুখ গত বছরের দিকে, আরেকটা নব বছরের দিকে)।"

গাজনের ও চড়কের পর আসে ১লা বৈশাখ নববর্ষের প্রথমদিন। গাজনের সন্ন্যাসীরা দৈহিক ক্লেশ ও সাধনার মধ্যদিয়ে শিব, ধর্ম বা সূর্যকে তৃপ্ত, তুষ্ট করে নবজীবনের জন্য আশীর্বাদ কামনা করে। লোকবিশ্বাস এই চড়কের বাণফোড়ার মধ্য দিয়ে কোন মানুষ নবজীবনের সুখ সমৃদ্ধির আশ্বাস পান। অতীতে অগ্রহায়ণে বা চৈত্রমাসে বর্ষারম্ভ হোত কোন কোন অঞ্চলে। এক একটি ঋতু এক একটি তাৎপর্য নিয়ে আমাদের জীবনে আসে বলেই বর্ষ শুরুর প্রথম মাসটি আমাদের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ মাসে নববর্ষ উৎসবকে শান্তিনিকেতনে গভীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন নৃত্য ও গানের প্রবর্তনায়। রুদ্র বৈশাখ নবসৃষ্টির গভীর অর্থবহন করে আনে আমাদের কাছে। বৈশাখী ঝড় নববিধানের দুর্ধর্ষ আশ্বাস নিয়ে আসে বাঙ্গালী জীবনে। মনে-প্রাণে আমরা প্রস্তুত হয় আগামী দিনের জন্য। উপরন্তু সামাজিক সংহতির এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান নববর্ষ। বাঙালী এই উৎসবে আপনাকে ক্ষুদ্র সীমা থেকে বৃহত্তর প্রীতি ও প্রেমের অনাবিল জগতে উত্তরণ করে। এই জীবনচক্র আনন্দের ও মুক্তির।

পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই বর্ষ গণনা হয় সৌরমাস অনুসারে। সূর্যের অয়নাংশ সংক্রমণ এবং উদয়াস্ত অনুযায়ী দিন, তারিখ ইত্যাদি গণনা করা হয়। হিজরী সনের গণনা করা হয় চান্দ্রমাস অনুসারে। চান্দ্রমাস সৌরমাসের চেয়ে কম দিনে হয় বলে সৌর বর্ষের দিন চান্দ্রবর্ষের চেয়ে বেশি। বর্তমানে ভারতে শকাব্দকে রাষ্ট্রীয় বর্ষ হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রামনবমী, সংবৎ, হিজরী, ও বঙ্গাব্দ প্রভৃতিও প্রচলিত আছে। হজরত মহম্মদ নবধর্ম প্রচারের জন্য যেদিন থেকে মক্কা ছেড়ে মদিনায় যান সেদিন থেকেই হিজরী সনের গণনা শুরু হয়। সম্ভবত বিক্রমজিৎ বা বিক্রমাদিত্যের নামানুসারে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে 'বিক্রম সংবতের' প্রচলন হয়। অবশ্য আকবর পরবর্তী-কালে 'ফসলী সাল' গণনা শুরু করেছিলেন অগ্রহায়ন মাস থেকে। এই মাসেই শস্য তোলা হতো গোলায়। শস্যই ছিল সেদিনের সম্পদ। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অগ্রহায়ণ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : 'ধন্য অগ্রহায়ণ মাস ধন্য অগ্রহায়ণ মাস ;/ বিফল জনম তার, নাহি যার চাষ।' পরবর্তীকালে বৈশাখ থেকেই বর্ষ গণনা শুরু হয়। শকাব্দের হিসাবে বর্ষশুরু করা হয় চৈত্রমাসে চৈত্র সংক্রান্তির শিব বা ধর্মের গাজন ও চড়ক উৎসবে। যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি বলেন : 'প্রাচীনকালে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নববর্ষ উৎসবের অনুষ্ঠান হত। দোলযাত্রা, বা হোলি সেই উৎসবেরই স্মারক।' [পূজাপার্বণ]। অন্নদামঙ্গল কাব্যের কবি ভারতচন্দ্র লিখেছেন : 'বৈশাখে এদেশে বড় সুখের সময়। / নানা ফুল গন্ধে মন্দ গন্ধবহ

হয়।' রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বৈশাখকে একটু গভীরতর অর্থে গ্রহণ করেছেন তাঁর কল্পনা কাব্যের 'বৈশাখ' কবিতায়। তিনি লিখেছেন: 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,/ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,/তপঃ ক্লিস্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল কারে দাও ডাক—/হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।'

বসন্তের আগমনে (২১ মার্চ) পারস্যে 'নৌরুজ' বা নববর্ষ উৎসব হয়। তের দিন চলে এই উৎসব। শীতের শেষে গাছে গাছে নূতন ফুল ফোটার প্রাক্কালে নববর্ষ খুবই তাৎপর্যময়। নৌরুজের শেষদিন অরণ্ডন। সেদিন কেউ ঘরে থাকেন না। সকলেই মাঠে, প্রান্তরে, বৃক্ষছায়ায়, পাহাড়, পর্বতে, নদীর তীরে চলে যান। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরেন। নৌরুজের সময় প্রত্যেক বাড়িতে গম, ধান ও বার্লির বীজ জলে ভিজিয়ে অঙ্কুরিত করা হয়। যেন আমাদের 'জাওয়া ডালি।' নৌরুজের শুরুতেই ঘরে রাখতে হয় 'হাপ্তসীন।' সুন্দর কার্পেটের ওপর রাখা হয় সাতটি পবিত্র উপাচার যেমন—শিরিন (মিষ্টি), সবজে (সবুজ শাক), ক্ষীর (দুধ), শিষা (আয়না), সাবাদ-এ-মাচি (এক পাত্র মাছ), সাঙ্গাক নান (সাঙ্গাক রুটি), সীব (আপেল)।

চীনদেশে নববর্ষের নাম: 'সিনসিয়ান'। পয়লা জানুয়ারি এবং মকর সংক্রান্তির (২১ ডিসেম্বর) দিনও নববর্ষ পালন করা হয় এদেশে। 'নিয়ৎ' বা ড্রাগন নাচ নববর্ষের প্রধান আকর্ষণ। 'নববর্ষে 'সু স্থ' (সুপ্তি ?) ও স-ই-ছেন দেবতার মূর্তি পূজা করেন চীনারা। 'স-ই-ছেন' হিন্দুদের গণেশের মত সিদ্ধিদাতা দেবতা। ধূপ ও প্রদীপ দিয়ে তাঁর পূজা করা হয়।

জাপানেও জানুয়ারীর পয়লা তারিখ নববর্ষ পালন করা হয়। জাপানে নববর্ষ যেন জাতীয় উৎসব। বর্ষ বরণ করতে গিয়ে জাপানীরা নানা মাঙ্গলিক উপাচার (কেদোমাৎসু) ব্যবহার করেন, যেমন বাঁশ ও পাইন পত্রগুচ্ছ গৃহদ্বারে টাঙানো হয়। এগুলি যেন স্থায়িত্ব ও ন্যায় পরায়ণতার প্রতীক। 'খড়ের বিনুনি' আমাদের ধানের গুচ্ছ বিনুনির মত ঘরের শ্রীবৃদ্ধি করে। পবিত্রতার নিদর্শন কমলালেবু রাখা হয় ঘরে। একটি ফার্ণ পাতা (উরাজিরো) উর্বরতার প্রতীক হিসেবে ঘরে রাখা হয়। 'কোবু' সাগরলতা সকলের দীর্ঘজীবন কামনার জন্য ব্যবহার করা হয়, যেমন বাঙ্গালী হিন্দুরা আশীর্বাদ করার জন্য দূর্বাদল ব্যবহার করেন। জাপানীরা কাগজের তৈরী বা জীবন্ত চিংড়ি মাছ ঘরের দরজায় মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসেবে ঝুলিয়ে রাখেন। গ্রীক দেবতা 'জেনুসের' (Janus) মত নববর্ষে মানুষের দৃষ্টি একদিক যেমন থাকে অতীতের দিকে, অন্যদিকে তেমনি একটি দৃষ্টি থাকে

ভবিষ্যতের দিকে। প্রত্যেক দেশেই এই মনোভাব অভিব্যক্ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বৈশাখ' কবিতায় বৈশাখকে আবাহন করে লিখেছেন :

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হ'য়ে যাক।
যাক পুরাতন স্মৃতি যাক ভুলে-যাওয়া গীতি
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।
মুছে যাক সব গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে-শুচি হোক ধরা।
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ,
মায়ার কুজ্ঝটি—জাল যাক দূরে থাক॥

কৃতজ্ঞতা জানানোর উৎসব :

'চিরকাল ভেদে দেশে দেশে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান আচার ব্যবহারের প্রকারভেদ দেখা যায়। একই উৎসবের বিভিন্ন দেশে তার বিভিন্ন নাম। পশ্চিমবাংলায় যখন নতুন ফসল ওঠে তার অনুষ্ঠানকে 'নবান্ন' উৎসব বলা হয়। তামিলনাড়ুতে সেই একই অনুষ্ঠানের নামকরণ 'পঙ্গাল'। আসামে যার নাম 'ভোগালিবিহু।' এমনি আরও কত আছে। তেমনি পশ্চিমপারেও রয়েছে নতুন শস্যের উৎসবানুষ্ঠান। সুদূর আমেরিকাতেও এমন ধরনের একটা উৎসবের প্রচলন রয়েছে। এসব উৎসবের কারন হল ভাগবানের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানানো ছাড়া আর কিছুই নয়। নতুন ফসল ওঠার সময় মানুষ ভুলে যেতে চায় অতীতে ফেলে-আসা সব দুঃখ, দুর্দশা-কষ্টের দিনগুলোকে। যা হয়ে গেছে তা তো হয়েছেই—তাকে ভুলে গিয়ে নতুন ফসলকে বন্দনা জানানো উচিত। নতুন ফসলকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যেই মানুষ মেতে ওঠে আনন্দ উৎসবে। এই আনন্দ উৎসবেরও কারন হিসাবে দেখা যায় নিছক ঈশ্বরের উপাসনার ব্যাপার। ঐ উৎসবের মাধ্যমে দেবতার আরাধনা করা হয়। নতুন ফসল দিয়ে দেবতাকে আরাধনা করার গূঢ় অর্থ হল ঈশ্বর বা দেবতার প্রতি মানুষের চরম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। সেই কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যই ঐ উৎসব-অনুষ্ঠান। এমনি এক উৎসবকে আমেরিকাবাসীরাও স্মরণ করে থাকেন—যাকে ওঁরা 'কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন দিবস উৎসব বলে থাকেন।'

মানিক বাগ/আনন্দবাজার/ডিসেম্বর ২/১৯৮৪

পুণ্যাহ :

বাংলার নববর্ষ উৎসবে স্থানীয় ও সার্বজনীন এই দু'রকমের লোকাচার দেখা যায়। 'পুণ্যাহ' নামে একটি সার্বজনীন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পুণ্যাহের অর্থ পবিত্র দিন। পবিত্র কাজের পক্ষে প্রশস্ত দিন। মধ্যযুগের বঙ্গদেশে জমিদারেরা প্রজাবর্গের কাছ থেকে এই দিনেই বছরের শেষ খাজনা আদায় করতেন। রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি শিলাইদহে এই অনুষ্ঠান হত। দয়ালু জমিদার প্রজার খাজনা মকুবও করতেন এইদিনে। মিষ্টি, পান, সুপারি প্রজাবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হোত। সুখ-দুঃখের খবরাখবর নেওয়া হোত, কুশল বিনিময় হোত 'পুণ্যাহে'। এখন এই অনুষ্ঠান প্রায় লুপ্ত। এই অনুষ্ঠান মানুষে মানুষে মিলন সাধন করে। প্রীতির রাখীতে সমাজবন্ধন হয়।

হালখাতা :

'হালখাতা' হালাকাটার মত অনুষ্ঠান। বছরের শুরুতেই বাণিজ্যে লক্ষীর যেন অধিষ্ঠান হয় এই ভরসায় ব্যবসায়ীরা কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে নতুন খাতা মহরৎ করেন। গ্রামে-গঞ্জেও হালখাতা করা হয় শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে। গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভার্থীদের এই দিনে আপ্যায়ণ করার রীতি রয়েছে। পুরানো হিসাব-নিকাশ, লেন দেন এইদিনেই মিটিয়ে ফেলা হয়। শুধু লেন-দেন নয়, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে আন্তরিক ভাব বিনিময় এই অনুষ্ঠানের অন্যতম দিক। এতে সমাজবন্ধন সুদৃঢ় ও মানবিক সম্পর্কে সুন্দর হয়ে উঠে।

আমানি :

'আমানি'[২] একটি লোকাচার। ডঃ এনামুল হক বলেছেন : 'আমানি' শব্দটি 'আমপানী' অথবা 'অন্নপানীয়'—এই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার শব্দটি থেকে উৎপত্তি লাভ করে থাকবে। শব্দ দু'টির বিবর্তনের ধারা এই রকম : আমপানীয় 7 আম আনিঅ 7 আমআনি 7 আমানি। এর অর্থ অসিদ্ধ (আম) চাউল জাত জল। আর অন্নপানীয় 7 অন্ন আনিঅ 7 আমআনি 7 আমানি : অর্থাৎ সিদ্ধ চাউল জাত টক পানীয় ; পান্তাভাতের পানি বা জল।

এটা আদিম রীতির পরিচয়বহ। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকেরা বৈশাখের প্রথমদিনে 'আমানি' খেয়ে চাষের কাজে যান। চৈত্রের শেষ দিনে অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তির দিন সন্ধ্যায় গৃহিনী এক হাঁড়ি পানিতে কম পরিমাণ আতপ চাল বা 'আম চাল' সারারাত ভিজতে দেন। এবং তার মধ্যে একটি কচি

আমের ডাল বসিয়ে রাখেন। পয়লা বৈশাখের ভোরবেলায় (সূর্যোদয়ের পূর্বে) ঘুম থেকে উঠে গৃহিনীরা ভেজা চাল সকলকে খেতে দেন। এবং আম্রপল্লব দিয়ে সকলের গায়ে জল ছিটোতে থাকেন। এদের ধারণা নববর্ষে সুখ-সমৃদ্ধি হবে এবং সকলে শান্তিতে সারা বছর কাজ করবে। এ যেন হিন্দুদের পূজার 'শান্তির জল'। এখনও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

বৈশাখী :

বৈশাখের অগ্নিস্নানে মানুষের দেহে-প্রাণে আসে শুচিতা। তাই গৈরিক সন্ন্যাসী গাজনে পড়েন উত্তরীয়। সংযম শুচিতায় দেহের রক্তক্ষরণ পৃথিবীতে আনবে শস্য, আনবে তৃষ্ণার বারিধারা, আনবে রোগমুক্তি—এই বিশ্বাসের দোলায় দুলছে, ঘুরছে সন্ন্যাসী। চড়কের চড়কি ঘূর্ণন জীবনচক্রে যেন ষড়ঋতুর পরিক্রমন।

'বৈশাখী' পাঞ্জাবের শিখদের ফসল আহরণের উৎসব, আনন্দের উৎসব, খালসার উৎসব। বাংলাদেশে বৈশাখী মেলার প্রবর্তনা মাত্র কয়েকবছর পূর্বে শুরু হয়। নববর্ষের প্রথম দিনে এই উৎসব মেলা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। নববর্ষ-বৈশাখী মেলা প্রসঙ্গে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন :

'আমাদের অধুনাতম নববর্ষ এদেশের গ্রীষ্মকালীন আর্তব উৎসব ঐ ঋতূৎসব উদযাপনের একটা বিবর্তিত নব সংস্করণ। এর ঐতিহ্য প্রাচীন, কিন্তু রূপ নতুন। নতুন সংস্কার, নতুন সংস্কৃতি, নতুন চিন্তাধারা অবারিত স্রোতে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে এমন এক নতুন আবহ, যাকে একটা দার্শনিক পরিমণ্ডল বলে উল্লেখ করতে হয়। এ পরিমণ্ডলে পুরাতন বিলীন, জীর্ণস্তূপ নিশ্চিহ্ন, মিথ্যা বিলুপ্ত ও অসত্য অদৃশ্য। আর নতুন আবির্ভূত, নবজীবন জাগরিত, সুন্দর সুস্মিত ও মঙ্গল সম্ভাবিত। কালবৈশাখীই এর প্রতীক। সে নববর্ষের অমোঘ সহচর, নবসৃষ্টির অগ্রদূত, সুন্দরের অগ্রপথিক ও নতুনের বিজয় কেতন।' এরই মধ্যে কাল বৈশাখীর দুর্ধর্ষ আশ্বাস আমাদের চালিত করে নবসৃষ্টির পথে।

বাংলার একটি লোকউৎসব উৎসব ও বিকাশ-কাঠামো

বাংলার লোকউৎসবের উৎস অনুসন্ধান করতে করতে আমাদের পৌঁছে যেতে হবে বাংলার ব্রতের ও লোকাচারের আদিম স্তরে। ধরে নেওয়া যাক্, সূর্যই আমাদের তাবৎ ক্রিয়াকর্মের নিয়ন্তা। সূর্যোদয়, আলো, উত্তাপ, অবসন্ন অপরাহ্নে অস্তগমন-এই দিনচক্রের সঙ্গে মানুষের বলন, চলন, ফসল ও জীবনচক্র যুক্ত। তাই মনে হয় আদিম ভাবনায় অনুসঙ্গে সূর্য—বসুন্ধরা—বর্ষণ—কর্ষণ—চলন—দোলন-ফলন—আহরণ—বীজায়ন অন্তরঙ্গভাবে সম্পৃক্ত। বাংলার ইতুপূজা বা ইতুব্রত

থেকেই বলা চলে বাংলার লোকউৎসবের যাত্রা শুরু। আমরা এই উৎসব উৎস প্রসঙ্গ এইভাবে সাজাতে পারি।

সাঁওতালরা 'সিংবোঙ্গা' সিংবোঙ্গার পূজা করেন। অর্থাৎ আকাশে সূর্যকে পরমদেবতা মনে করেন। আর মর্তের শ্রেষ্ঠ দেবতা মোড়ল ও পঞ্চায়েত। আমরাও তাই ইতুকে (মিত্র/সূর্য) আকাশের অধিদেবতা মনে করি, আর পৃথিবীকে শস্যশালিনী করার জন্য করি যাদুমূলক অসংখ্য লোকাচার।

মূলভাব	লোকাচার	কাল/ঋতু
১. বোধন	ইতুব্রত/মাঘমণ্ডল	অগ্রহায়ণ/মাঘ
২. সৃজন	তোষলাব্রত	অগ্রহায়ণ
৩. ফলন	পৃথিবীব্রত	বৈশাখ
৪. আহরণ	হালাকাটা/নবান্ন	পৌষ/অগ্রহায়ণ

পশুবলি থেকে নরনৃত্যসহ বৃষ্টি অনুকারী নানাবিধ লোকাচার পালন করি। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন গণদেবতা শিব। শিবকে নিয়ে নানা লোকাচার, উৎসব, মেলা বিকশিত হয়েছে এদেশে। শিবরাত্রি, গাজন, চড়ক, গম্ভীরা এদের মধ্যে অন্যতম। চৈত্র থেকে শুরু করে শিব-উৎসব চলে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত। শিব চতুর্দশী (ফাল্গুন), শিবের গাজন (চৈত্র/আষাঢ় সংক্রান্তি), শিবপূজা বা ব্রত (জ্যৈষ্ঠ)— এই হলো শিব উৎসবের কালক্রম। অনুরূপভাবে বাংলার কৃষি বিষয়ক লোকাচার ও উৎসবকে এই ভাবে সাজাতে পারি :

কাল	পার্বণ
কার্তিক	হালপ্রবাহ/হলকর্ষণ/গোবন্দনা
অগ্রহায়ণ	শূকর হালা/হালাকাটা
—	নবান্ন
পৌষ	খামার পূজা/পৌষ আগলানো
—	ঠাকুর ওঠানো
মাঘ	ঠাকুর ওঠানো/লাঙল পূজা
বৈশাখ	ধানমুঠ
জ্যৈষ্ঠ	ধান রোপণ
আশ্বিন	নল সংক্রান্তি

অবশ্য কৃষি বিষয়ক উৎসব-পার্বণগুলির কালগত ক্রমের পরিবর্তন ঘটেছে বাংলার লোকসমাজে চাষাবাদের প্রবর্তনার ফলে। জয়া, সোনা, রত্না, পদ্মা, তাইচুং, আই আর ৮, আই. আর ২৫, ইত্যাদি ধান যান্ত্রিক মরশুমে আবাদ করা হয়। ফলে কৃষি-লোকাচারের কালক্রমের পরিবর্তন ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের কৃষি উৎসব সংক্রান্ত ঋতু মানসিকতার যেমন পরিবর্তন ঘটছে, তেমনি লোকাচারের কালগত ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়।

কৃষি উৎসব কৃষির স্মরণ উৎসব। করম উৎসবে যেমন করম রাজা ও রাণীর মিলন উৎসব, তেমনি সূর্য ও পৃথিবীর মিলনের উৎসব। এ যেন 'জাওয়াপরব' অর্থাৎ বীজের অঙ্কুরায়ণ। জীবনের নবায়ণ। বীরভূমের ভাজোও এইরকম একটি অনুষ্ঠান।

উৎসবের বিশ্বজনীনতা :

উৎসবের তিনটি সার্বজনীন রূপ পাওয়া যায়। যেমন :

(ক) সামাজিক : দেবতার সঙ্গে বা পূজার সঙ্গে জনগোষ্ঠীর সামাজিক যোগাযোগ সৃষ্টি করা।

(খ) লোকবিশ্বাস : জনসাধারণের বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে দৈবশক্তির সংযোগ।

(গ) পরাশক্তি : মানুষ যে সমস্ত শক্তিকে পরাক্রান্ত মনে করে তার আধিপত্য স্বীকার করে সরল থেকে জটিলতর সমাজ বন্ধনের দিকে অগ্রসর হওয়া।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় উৎসব হলো সমগ্র সমাজের আনন্দময় চৈতন্যের প্রকাশ। ফসল আহরণ নবান্ন, পুণ্যদিন, মহাত্মার জন্মদিন, বা দেবতার যাত্রা, দুর্গোৎসব, ঋতু উৎসব—যাই হোক না কেন প্রত্যেকটি উৎসবের সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের চৈতন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে। আরো জড়িত রয়েছে সমগ্র প্রকৃতি, প্রাণীজগৎ ও সৌরমণ্ডল।

পুরী, মাদুরাই ও চিদাম্বরমের মন্দির, মেলা ভারতীয় লোক উৎসবের ক্ষেত্রে বৃহত্তম জন-আকর্ষক। শতাব্দীর ঐতিহ্যবোধ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষের সমষ্টি চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। মুসলমানদের ঈদ-উল্-ফিতর (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) রমযানের উপবাস ভঙ্গ করে প্রার্থনা ও প্রীতির সম্প্রসারণে এক অনবদ্য মিলনোৎসবে পরিণত হয়। এমন কি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও মুসলমানদের সঙ্গে এই উৎসবে একাত্ম হন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

মাদ্রাজ (তিরুচিরাপল্লী, মাদুরাই) অন্ধ্রপ্রদেশের ও মহিশূরের প্রায় সর্বত্রই

পঙ্গল-সংক্রান্তি অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারীতে। পঙ্গল ফসল আহরণের উৎসব। বাঙালীদের নবান্ন উৎসবের মত পঙ্গলে পায়েস, পিঠে খাওয়ার রীতি আছে। এমন কি গবাদি পশুকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করে নবান্ন অর্পণ করা হয়, যেমন করা হয় বাংলার বাঁধনা পরবে। সঙ্গীত সহযোগে গোধূলি লগ্নে পশুর শোভাযাত্রা পঙ্গলের আকর্ষণীয় বিষয়। এই উৎসব উপলক্ষে মাদ্রাজে ষাঁড়ের লড়াই খুবই উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

মাদুরাই অঞ্চলে সপ্তদশ শতকের শাসক তিরুমালা নায়কের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মন্দিরের দেবদেবীর 'ভাসান উৎসব' অনন্যতা অর্জন করেছে। স্বর্ণাভরণ, ফুল ও রেশম বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত দেবকুলকে শোভাযাত্রা সহকারে মারিয়াম্মান টেপাকুলকে সুসজ্জিত ভাসমান মঞ্চে উপবেশন করিয়ে বাদ্যসহযোগে পুষ্করিনী পরিক্রমণ করা হয়।

'শিবরাত্রি' ভারতীয় হিন্দু রমনীদের অন্যতম ব্যাপক পালিত উৎসব। শিবের আরাধনায় বা শিবব্রতের কুমারীরা ব্যাপকভাবে এই উৎসব পালন করেন। এমন কি নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরেও ফাল্গুন মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বারানসী, চিদাম্বরম, কালহস্তী, তাঞ্জোর, খাজুরাহো, তারকেশ্বর, কেদার-বদ্রী, দক্ষিণেশ্বর শিবমন্দিরে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে রাজস্থানের উদয়পুর, জয়পুর অঞ্চলের গাঙ্গোর পরবের কথা উল্লেখ করতে হয়। উত্তর ভারতের হোলি পরবের পরই এই পরব অনুষ্ঠিত হয়। এটাও মূলত পার্বতী উৎসব। পার্বতী অবশ্য এই উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু।

উদয়পুরের রমনীরা মাথায় পেতলের সুন্দর কারুমণ্ডিত কলস নিয়ে শোভাযাত্রা করে গৌরী মন্দিরে যান। সেখানে গৌরীকে স্নান করানো হয় এবং পুষ্প অর্ঘ্য দেওয়া হয়। জয়পুরের মহারাজবাড়ি থেকে হর-পার্বতীর মূর্তিসহ হাতিঘোড়ার যাত্রা বের করা হয়। পশ্চিম বাংলার নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বৈষ্ণবেরা দোলযাত্রা অনুষ্ঠান করেন এই সময়। উড়িষ্যার পুরীতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা একটি উল্লেখযোগ্য দেবযাত্রা উৎসব। পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার মাহেশের রথযাত্রাও উল্লেখযোগ্য উৎসব। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রথে বসিয়ে শোভাযাত্রা করানোই রথযাত্রার অন্যতম উপলক্ষ্য। রাজস্থানের 'তীজ' উৎসবে দেবী গৌরীকে নিয়ে শোভাযাত্রা করার একটি উৎসব শ্রাবণ মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় লোকউৎসবে সূর্য, গাছপালা, সর্প, ফসল ও মানুষ কিছুই বাদ পড়েনি। আদিম লোকভাবনার পল্লবিত বিকাশ ও পুষ্পিত প্রকাশ ঘটেছে লোকউৎসবে। সাপকে নিয়ে বাংলার মনসা ও উত্তর, দক্ষিণ ভারতের নাগপঞ্চমী একটি অনন্য

সাধারণ উৎসব। কেউটে নামক বিষধর সাপকে কেন্দ্র করে এই উৎসব। গুপ্তধনের রক্ষক, যৌন বাসনার ও প্রজননের প্রতীক সাপ লোকবিশ্বাসে দেবতার আসন পেয়েছে ভারতবর্ষে। বাংলার মনসা, দক্ষিণ ভারতের মকাম্মা এই রকম সর্প বিষয়ক দু'জন দেবতা। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেই এই দেবতার উৎসব হয়। এই এই সময় জলা-জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে সাপের প্রাদুর্ভাব ঘটে বেশি। সমুদ্রমন্থনে অনন্ত নাগের ভূমিকা আমাদের জানা আছে। বিষ্ণু অনন্ত নাগের ওপর বসেই বিশ্বের সংরক্ষণ করতেন। শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন এমন আর একটি উল্লেখযোগ্য ভাগবতের ঘটনা। রাজস্থানের যোধপুরে এখন পৌরাণিক অনন্ত সাপের কাপড়ের প্রতিমূর্তি তৈরী করে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ভাদ্র-মাসে উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'রক্ষাবন্ধন' নামে উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবের সঙ্গে স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের একটি কাহিনী যুক্ত হয়ে আছে। কথিত আছে স্বর্গের আধিপত্য নিয়ে দেবতা ও অসুরের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাঁধে। দেবতারা অসুরদের অত্যাচারে প্রায় স্বর্গহারা হতে চলেছেন। এমন সময় ইন্দ্রের রানী ইন্দ্রের হাতে রেশমের একখণ্ড 'রাখী' পরিয়ে দিয়েছিলেন, ইন্দ্র যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে দেব-অসুরের যুদ্ধে রাখী পরার ফলেই ইন্দ্র জয়লাভ করেছিলেন। এখন এই উৎসব রক্ষার প্রাচীন মানসিকতা থেকে সমাজবন্ধনের প্রীতি ও ভালোবাসার সর্ববিস্তারী সামাজিক সংহতির উৎসবে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ চক্রান্ত' প্রতিরোধ করার জন্য 'রাখী উৎসব' পালন করেছিলেন এবং এই উপলক্ষে কয়েকটি বিখ্যাত গান রচনা করেছিলেন। এর অন্যতম গানটি হলো :

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ॥

বৈশাখের প্রথমদিনে এখানকার হিন্দুদের নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্বভারতে এই দিনেই নববর্ষ পালিত হয়। শিখ সম্প্রদায়ও এই মাসে 'বৈশাখী' উৎসব পালন করেন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গুরু গোবিন্দ সিংজী শিখদের 'খালসা'

সংগঠন করেছিলেন। পাঞ্জাবে বৈশাখেই চাষীরা ফসল আহরণ শুরু করে। বৈশাখী উৎসব আনন্দের উৎসব, প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্যের উৎসব। পাঞ্জাবীরা ভাংরা নৃত্য ও সঙ্গীত সহযোগে এই উৎসব পালন করেন প্রতি বছর। বাংলার নববর্ষ শুভ সংকল্প ও প্রীতি বিনিময়ের উৎসব, পরম আনন্দের শুভদিন।

ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতন ঐতিহ্যধারা আজও কিছু কিছু পূজা-পার্বণ ও ও উৎসব-মেলার মধ্যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বৈশাখী উৎসব থেকে দোলযাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত উৎসবগুলি আনন্দ-উপভোগ ও যৌবনের চাঞ্চল্যেপূর্ণ। বর্ষশেষের চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনের সন্ন্যাস কামনা-বাসনা ও ভোগাসক্ত মানুষকে ত্যাগের নির্দেশ দেয়: 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথা'—এই ঔপনিষদিক বাক্যই আমাদের নিরন্তর স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ভোগে আনন্দ নেই, ত্যাগের মধ্য দিয়েই ভোগের সার্থকতা। 'মা গৃধঃ' —লোভ করো না। লোভের মধ্যে রয়েছে পরম পাপ। পাপ মৃত্যুর পথে চালিত করে। উৎসব আমাদের অমৃতের দিকে চালিত করে, অভয় মন্ত্র দেয়। সেজন্য দোলযাত্রার আমোদ-উল্লাসের শেষেই চৈত্রের গাজনে ত্যাগের ডাক আসে। 'বাবা ভোলানাথের চরণে সেবা লাগি'—এই শব্দগুচ্ছ এনে দেয় সন্ন্যাসী শিবের সাধন মন্ত্র। শিবের সাধনার মধ্যেই বর্ষশেষ। তারপর নবজীবন।

রবীন্দ্রনাথ ক্রান্তদর্শী কবি ছিলেন। তিনি উৎসবের মধ্যেই ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি উৎসবকে দেখেছেন মহামানবের আনন্দ তীর্থরূপে। তাই স্বদেশ চেতনায় 'ভারতীর্থে' বলেছেন:

> এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।
> এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
> এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
> এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার।
> মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা।
> সবার-পরশে পবিত্র-করা তীর্থ নীরে—
> আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

উৎসবের মূলমন্ত্রই হলো 'সবার পবিত্র পরশে' পবিত্র হয়ে ওঠা। সকলের আনন্দে আনন্দিত হওয়া। মানবস্বীকৃতিই উৎসবের মূল কথা। শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ 'হলকর্ষণ' ও 'বৃক্ষরোপণ' উৎসব প্রবর্তন করেছিলেন। এই উৎসব প্রসঙ্গে তিনি বলেন: আজকের উৎসবের তাই দুটি অঙ্গ। প্রথম হলকর্ষণ—হলকর্ষণ আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য, শস্যের জন্য; আমাদের নিজেদের প্রতি কর্তব্যর পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। কিন্তু এর দ্বারা বসুন্ধরার যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ

করবার জন্য আমরা কিছু ফিরিয়ে দিই যেন। ধরনীর প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপনের এই আয়োজন।' হলকর্ষণ মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলার উৎসব। ফলনের উৎসব। ফসলের উৎসব। কৃষিবিদ্যার প্রথম উদ্ভাবনের স্মৃতিবহ উৎসব, ভারতবর্ষ আজ চলছে কৃষির চক্রে। এই চলন বসুন্ধরার উৎপাদিকাশক্তির জাগরণে ধন্য, সুন্দর।

বিশ্লেষণ :

'ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ রবির উত্তরায়ণ আরম্ভে নূতন বৎসর আরম্ভ করিতেন। তোমাদের দোলযাত্রা তাহারই স্মৃতি। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল ছয় সাত সহস্র বৎসর পূর্বে প্রথম দেখিয়াছি, ইহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমার দোল দেখিয়াছি।[১] লোকউৎসব প্রাচীন অথচ নবীন, চলিষ্ণু। আমাদের উৎসবের আন্তর বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচিত হল।

দোলন :

দোলযাত্রাই দেখি দোলন। যাত্রা শব্দের অর্থ গমন। পরে এর অর্থ হয়েছে দেবতার উৎসব। উৎসব মাত্রেই হিন্দুরা দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেন বা প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে কেন্দ্র করে উৎসব করেন। এখানেই দেবতার বোধন। যে দেবতা গমন করেন, বহু লোক তাঁর অনুগমন করেন। 'রথযাত্রা' এইভাবেই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার গমন—অনুকারী উৎসব। দেবতা চলেন, পুরোহিত চলেন, তাই হাজার হাজার ভক্ত-পূজারীও চলেন। লোক চলে, জীবনও চলে।

সূর্য চলেন, তাপ, আলো দান করেন। সূর্য শক্তির উৎস। বর্ষচক্রে সূর্যের চলন থেকে সৃষ্টি হয় ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে সৃষ্টি-প্রাণের চাঞ্চল্য ও বৈচিত্র্য। সূর্যের উত্তরা গতি উত্তরায়ণ আর দক্ষিণা গতি দক্ষিণায়ন। অয়ন শব্দের অর্থও গতি। ইউরোপে উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে নববর্ষ শুরু হয়। পয়লা জানুয়ারী তাই সেখানে নববর্ষের প্রথম দিন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এখন পয়লা জানুয়ারীতে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। "ষোল শত বৎসর পূর্বে পৌষ সংক্রান্তির দিন উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। পরদিন ১লা মাঘ নূতন বৎসরের প্রথম দিন। সেদিন আমরা দেব-খাতে প্রাতঃস্নান করি। লোকে বলে মকর স্নান।"[২] 'ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এক একটা ঋতুউৎসব বা স্মরণোৎসব উপলক্ষ করে নববর্ষ শুরু হয়।' আমাদের

১. পূজা-পার্বণ/যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ২. প্রাগুক্ত

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বছর গণনার অব্দও বিভিন্ন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিক্রম সম্বৎ, মধ্যভারতে শকাব্দ, আসামে শঙ্করাব্দ, উড়িষ্যা ও গুজরাটের বৈষ্ণবদের মধ্যে চৈতন্যাব্দ ইত্যাদি প্রচলিত আছে। বাংলাদেশে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সাল প্রচলিত আছে। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে বাঙলা সালকে বলেছেন 'তারিখ-ই-ইলাহী'। তাই বাংলার হিন্দু মুসলমান এই সালকেই মেনে নিয়েছেন।

'দোলন' ব্যাপারটা জীবন-প্রান্তিক যেমন, তেমন মানুষের সীমায় চলার দিগন্তস্পর্শী। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা বা রাসলীলা। কৃষ্ণ বস্তুত সূর্যসম্ভব ব্যক্তিত্ব। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ রাধা নক্ষত্রে অবস্থান করেন। আবার শ্রাবণী পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন। সেদিন শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা। এই ঝুলনই হলো দোলন। এ শুধু শ্রীকৃষ্ণের দোলন নয়, এ যে সূর্যের দোলন, এ যে নর-নারীর, জীব-প্রকৃতির দোলন। একটা স্থির বিন্দু থেকে দোলুক্ষমান দোলকের দুই প্রান্তবর্তী সুরে সমতালে চলনকে বলে দোলন। ধরা যাক, 'ক' অবলম্বন, 'খ' ঝুলন্ত সূত্র ও 'গ' দোলক। অতএব এই ভাবে—
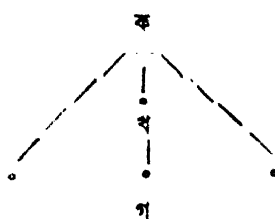
দোলনকে বোঝানো যেতে পারে। দোলন সূত্রানুসারে প্রতি সেকেণ্ডে দোলকের যে ক'টি পূর্ণ দোলন সম্ভব তাদের বলা হয় দোলনের কম্পাঙ্ক। কম্পাঙ্ক (n) × দোলনকাল (T)

$$= \text{একক সময় } (1)$$

$$\text{বা,} \quad nT = 1$$

$$\therefore \quad n = \frac{1}{T} \text{ এবং } T = \frac{1}{n}$$

$$\therefore \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

টীকা: T = দোলনকাল
L = দোলকের দৈর্ঘ্য
g = দোলনস্থানের অভিকর্ষজ ত্বরণ
π = ধ্রুবক সংখ্যা সমান 22/7 প্রায়।

Vide: Concise Science Dictionary/Oxford University Press/New York, 1984.

এই বিশ্ব দোলন জীব প্রজন্মকে ভারসাম্যে রক্ষা করে। মহাজাগতিক গ্রহপুঞ্জের অবস্থান ও সূর্যের অভিকর্ষজ ভারসাম্য এতে রক্ষিত হয়। গ্রহের গতি জীবেরও গতি। নিউক্লিয়াস (+) থেকে ইলেকট্রনের (−) মধ্যবর্তী আকর্ষণবল যে গতিচাঞ্চল্যে অপকেন্দ্রের বলকে সংহত করে তাইতো বিশ্বদোলন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সোনারতরী কাব্যে 'ঝুলন' কবিতায় সুন্দরভাবে এই বোধকে কাব্যায়িত করেছেন এই ভাবে :

আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা
নিশীথ বেলা।

এই জীবন মহাসাগরে তুফান উঠেছে। 'ভিতরে বাহিরে জেগেছে মহাকল্লোল। 'উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল,/উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল,/বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিনী—মত্ত বোল।/দে দোল্ দোল্।' এইত জীবন-মরণ দোলন, এই বিশ্বসৃজনের দোলন।

[illegible]লন :

পার্বণ শব্দটাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় চলনকে, গ্রন্থি বা সন্ধিকে। 'বারমাসে তের পার্বণ' মানে হলো গাঁট পেরিয়ে ঋতুতে ঋতুতে ফুলে-ফলে বিকশিত হওয়া। মানুষের জীবনে যেমন, তেমনি জীবজগতে, প্রকৃতিতে চলছে এই চলন। বিজ্ঞান বলে : 'matter in motion'। যে প্রাণশক্তি (elan vital) জীবদেহে সঞ্চারিত হয় প্রতি মুহূর্তে, তা আবার কালক্রমে এক সময় সীমায় নিঃশেষিতও হয়। কালের সীমায় স্থান ও সত্ত্বর সঙ্গে সমতা রেখে চলনই জীবন। মরণ জীবনের প্রান্তিক অভিকর্ষ। তারপর জীবনের মহাসাগরে মরণখেলা। রূপান্তরণ। এই লীলাই জগতের প্রাণলীলা। পৌষপার্বণে যেমন ষোড়শ উপাচারে রন্ধন ও ভক্ষণ, তেমনি দশহরার দিন ভোজ্যান্তর বা অরন্ধন। কোথাও শ্রাবণের সংক্রান্তিতে বা কোথাও ভাদ্র সংক্রান্তিতে হয় অরন্ধন। বাঙালী গৃহস্থ বাড়িতে আগুন জ্বলে না। পূর্বদিনের রান্নাকরা অন্নব্যঞ্জন পরদিন ভোজন করা হয়, এই 'পান্তা' বাংলার কৃষকের প্রিয় ভোজ্য। প্রয়োজনীয় আহার্য।

'অম্বুবাচী'তে বসুন্ধরা রসসিক্তা হন। তাই রজঃস্বলা বসুন্ধরার দেহে হলকর্ষণ নিষিদ্ধ। তিন দিন বিরতি। রমণীর ঋতুস্রাবের মত। তিন দিন শুচিতা পালন করবে। পুরুষ সংগম নিষিদ্ধ। অম্বুবাচীর তিন দিন পর হলকর্ষণ, বীজবপন, জনশ্রুতি এই সময় বঙ্গদেশে বর্ষারম্ভ হত। তাই প্রাচীন বাংলায় অরন্ধন ও অম্বুবাচী একই দিনে অনুষ্ঠিত হত। এই দিন বীজ বপনের মহাকাল।

আমাদের দেশে ঋতুর চলনে উৎসব হয়। উৎসবের বৈচিত্র্যও তাই ঋতুর

সংগমে ও পরিবর্তনে, এ যেন কালের সীমায় শৈশব, কৈশোর, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যে উত্তরণ। চৈত্র-বৈশাখ = বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় = গ্রীষ্ম, শ্রাবণ-ভাদ্র = বর্ষা, আশ্বিন-কার্ত্তিক = শরৎ, অগ্রহায়ণ-পৌষ = হেমন্ত, মাঘ-ফাল্গুন = শীত।[১] বর্তমানে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ = গ্রীষ্ম, আষাঢ়-শ্রাবণ = বর্ষা, ভাদ্র-আশ্বিন = শরৎ, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ = হেমন্ত, পৌষ-মাঘ = শীত, ফাল্গুন-চৈত্র = বসন্ত। এইভাবে ঋতু, কাল চলছে। হয়ত পরিবর্তনও হবে কালান্তরে।

মিলন :

প্রাচীন বাঙলায় কতগুলি উৎসব সৃষ্টি হয়েছিল সমাজের সংহতির দিকে লক্ষ্য রেখে। সমাজের গোড়ার দিকে 'সয়লা', সইপাতানো, মিতালিসূচক 'বিজয়া দশমী' ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জামাই ষষ্ঠী, গৃহপ্রবেশ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, ষষ্ঠী, নববর্ষ উৎসব-মেলা ইত্যাদি। সমাজের মূলে রয়েছে ব্যক্তি, পরিবার। এর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বর্ণাশ্রিত সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সমান্তরাল ও তির্যক সম্পর্ক রয়েছে। আত্মীয় ও রক্ত সম্পর্কের যৌগিক ক্রিয়াও সমাজকে করেছে সংহত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই মিতালি উৎসব রয়েছে। লোকায়ত স্তরের মেলা, মহোৎসব, সম্মেলন, ধর্মসভা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক কণিকাগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে খণ্ড খণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে বলয়ে বা বৃত্তে মিশে যাচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্লীন বিরোধে এই সংস্কৃতির রেণুগুলি কোথাও ধর্মীয় বা উগ্র আঞ্চলিকতার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বিরোধ বাধছে এটাই সমাজবিজ্ঞানসম্মত রীতি। যেমন—
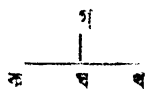
ক ও খ সমাজ-সমান্তরাল রেখা। গ ও ঘ সংস্কৃতি রেণুর লম্ব। পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করছে 'ঘ' বিন্দুতে। এইভাবে বহু লম্ব অঙ্কন করে সংস্কৃতি সমাজ সংঘাত ও মিলনের চিত্র অঙ্কন করা যায়।

আমরা চলন, দোলন ও মিলন এই ত্রি-স্তরে বাংলার লোকউৎসবের উৎস ও বিকাশধারাকে বিভাজন করে দেখেছি। আবার এই ত্রি-স্তর একে অন্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্পৃক্ত। সমাজের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবতরঙ্গগুলি যখন ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আছড়ে পড়ে তখনই সংঘাতে চূর্ণ কণিকাগুলি প্রাথমিকভাবে চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হয়। আবার

১. ২৪১ শকে = ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই রকম ঋতুবিভাগ ছিল। পূজাপার্বণ/পৃঃ ৬১

কালস্রোতে এই বিচ্ছুরিত কণিকাগুলির শাশ্বত মূলবাহী কণিকাগুলিতে সমন্বিত হয়ে সমাজ-অগ্রচলনকে ত্বরান্বিত করে। এতেই সমাজ চলে, দোলে ও মিলে।

অরণ্যদেবতা : আলোকচিত্রসার

সৃষ্টির প্রথম পর্বে পৃথিবী ছিল পাষাণী, বন্ধ্যা জীবের প্রতি তার করুণার কোনো লক্ষণ সেদিন প্রকাশ পায় নি। চারিদিকে অগ্নি-উদ্গীরণ চলেছিল, পৃথিবী ছিল ভূমিকম্পে বিচলিত। এমন সময় কোন্ সুযোগে বনলক্ষ্মী তাঁর দূতীগুলিকে প্রেরণ করলেন পৃথিবীর এই অঙ্গনে, চারিদিকে তাঁর তৃণশস্পের অঞ্চল বিস্তীর্ণ হল নগ্ন পৃথিবীর লজ্জা রক্ষা হল। ক্রমে ক্রমে এল তরুলতা প্রাণের আতিথ্য বহন করে। তখনো জীবের আগমন হয় নি ; তরুলতা জীবের আতিথ্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়ে তার ক্ষুধার জন্য এনেছিল অন্ন, বাসের জন্য দিয়েছিল ছায়া। সকলের চেয়ে তার বড়ো দান অগ্নি : সূর্যতেজ থেকে অরণ্য অগ্নিকে বহন করেছে, তাকে দান করেছে মানুষের ব্যবহারে। আজও সভ্যতা অগ্নি নিয়েই অগ্রসর হয়ে চলেছে।

মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদান-প্রদান ; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারাল ; যে তার প্রথম সুহৃদ্ দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইটকাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা করে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। আজকে ভারতবর্ষের উত্তর-অংশ তরুবিরল হওয়াতে সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ হয়েছে। অথচ পুরাণপাঠক মাত্রেই জানেন যে, এক কালে এই অঞ্চল ঋষিদের অধ্যুষিত মহারণ্যে পূর্ণ ছিল উত্তর ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়াশীতল সুরম্য বাসস্থান ছিল। মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে ; প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে—এক সময় এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য—সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে—আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে দিন তাঁর ফল, দিন্ তাঁর ছায়া।

এ সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাতে বড়ো বড়ো বন ধ্বংস করা হয়েছে; তার ফলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে ঝড়, কৃষিক্ষেত্রকে নষ্ট করছে, চাপা দিচ্ছে। বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রাণকে, চারি দিকে তারই আয়োজন করে রেখেছিলেন—মানুষই নিজের লোভের দ্বারা মরণের উপকরণ বিধাতার অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করেই মানুষের সমাজে আজ এত অভিসম্পাত! লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা-কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।

আজ অনুতাপ করবার সময় হয়েছে। আমাদের যা সামান্য শক্তি আছে তাই দিয়ে আমাদের প্রতিবেশে মানুষের কল্যাণকারী বনদেবতার বেদী নির্মাণ করব এই পণ আমরা নিয়েছি। আজকের উৎসবের তাই দুটি অঙ্গ। প্রথম হলকর্ষণ—হলকর্ষণ আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য, শস্যের জন্য; আমাদের নিজেদের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। কিন্তু এর দ্বারা বসুন্ধরার যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ করবার জন্য আমরা কিছু ফিরিয়ে দিই যেন। ধরণীর প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন। কামনা করি, এই অনুষ্ঠানের ফলে চারি দিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক, ফলে শস্যে এই প্রতিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।' —রবীন্দ্রনাথ

রথযাত্রা :

হিন্দুদের মধ্যে একটি শাস্ত্রবচন আছে : 'রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'। রথ দেখলে পুনর্জন্ম হয় না। অর্থাৎ মুক্তি ঘটে। বিভিন্ন দেবতার রথযাত্রা হয়। কার্তিক পূর্ণিমায় পরেশনাথের রথযাত্রা, জগন্নাথের রথযাত্রা ছাড়াও জৈন, বৌদ্ধদের রথযাত্রা প্রচলিত ছিল ভারতে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (খৃঃ ৫ম শতাব্দী) ভারতে পরিভ্রমণকালে বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের রথযাত্রা দেখেছিলেন। কর্ণাটকের চিদাম্বরমে পৌষ মাসে শুক্লা একাদশীতে নটরাজের রথযাত্রা, চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমীতে ভুবনেশ্বরের রথযাত্রা, বিজয়া দশমীতে মেদিনীপুর জেলায় রঘুনাথ বাড়িতে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রী রঘুনাথ জীউর রথযাত্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'হরিভক্তি বিলাসে' কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশীতে বিষ্ণুর রথযাত্রার উল্লেখ আছে। কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় কর্তাভজা সম্প্রদায় বৈশাখ মাসে রথযাত্রা করতেন।

নেপালে দেবীযাত্রা, কুমারী যাত্রা, ভৈরবী যাত্রা, লিঙ্গ যাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন যাত্রার প্রচলন আছে। বাংলার স্মার্ত রঘুনন্দনের কাল (ষোড়শ শতক) থেকেই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা প্রচলিত হয়েছে। পরবর্তী কালে মাহেশের রথযাত্রা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১]

এই রথের সঙ্গে মুসলমানদের তাজিয়ার আপাত সাদৃশ্য আছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লিখেছেন: 'আসলে তাজিয়া একটি সমাধি ভবনের প্রতীক। সমাধি ভবনটি কারবালার অন্যায় যুদ্ধে শহীদ হোসেনের। আজও এই সমাধিতে শ্রদ্ধা ও মর্মবেদনা জানাতে লক্ষ লক্ষ মুসলিম ইরাকের কারবালা যান।...এটি সমাধিভবনের মিনার।'[২]

'ইরান শিয়া অধ্যুষিত দেশ। এখনও শতকরা ৯০ জনের বেশি শিয়া আছেন এখানে। শিয়ারাই তাজিয়া প্রচলন করেছিলেন। ইরানী মুসলমানদের ধর্মীয় রীতিনীতির সঙ্গে স্বভাবত এ ব্যাপারটা ভারতে চলে আসে এবং চালু হয়।' রথ ও তাজিয়ার ঐতিহ্য তাই অতি প্রাচীন। রূপসাদৃশ্য এই দুই উৎসব ভিন্ন হলেও তাজিয়া ও রথ যেন সাদৃশ্য মণ্ডিত। উভয় ক্ষেত্রেই 'চলন' সামান্য ধর্ম।

রজঃসংক্রান্তি:

'রজঃসংক্রান্তি ওড়িশার এক প্রধান পাবণ। শুরু হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে। এই পার্বণটি ব্যাপকভাবে এবং সাড়ম্বরে তিন দিন ধরে পালিত হয় ওড়িশার ঘরে ঘরে মাতা, বধূ ও কন্যাদের দ্বারা। ঠিক কবে থেকে এই পার্বণের উৎপত্তি তার কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও—এটা যে ওড়িশার একটি প্রাচীন উৎসব সে বিষয়ে সবাই নিশ্চিত। ধর্মীয় মতে, আষাঢ় মাসের শুরুতেই ধরিত্রী হয় রজঃস্বলা। তাই জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিন থেকে দোসরা আষাঢ় পর্যন্ত এই পার্বণ উদ্‌যাপনের কাল। পার্বণ উদ্‌যাপনকালে স্ত্রীলোকদের অস্নাত থাকতে হয় তিন দিন। নিয়মানুসারে চতুর্থ দিনে তাঁরা পুণ্যস্নান করে পবিত্র হয়, নতুন বস্ত্র পরিধান করে এবং শিব ও বরুণ দেবের পূজো দেয়। অতঃপর গৃহসংলগ্ন কিছুটা ভূমি পরিষ্কার করে গোবর জল দিয়ে লেপন করা হয় এবং সেইখানে মহিলাগণ অল্প অল্প করে জল ঢালেন—এই ক্রিয়ার নাম হল ধরিত্রী স্নান। বিশ্বাস, এই স্নানে ধরিত্রী হয় পবিত্র। সেই সঙ্গে বন্দনা করা হয় ভূমিলক্ষ্মীর। প্রার্থনা

১. ভূমিলক্ষ্মী/২ শ্রাবণ ১৩৮৭
২. প্রাগুক্ত

করা হয় সুবৃষ্টির, যাতে ঐ বছর উত্তমরূপে কৃষিকার্য সম্পন্ন করা যায়। কামনা করা হয় শস্যপূর্ণা বসুন্ধরার। রজঃপার্বণকালে ব্রতিনীর রান্নাকরা খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। রজঃর পূর্বদিন চালের গুড়ো গুড় ও নারকেল সহযোগে পিঠা প্রস্তুত করা হয়। তাকে বলা হয় রজঃপিঠা। সেই পিঠা ও ফলমূল হয় ব্রতিনীর আহার্য। রজঃউৎসবের আর একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল, মেয়েদের এই সময় দোলায় চড়তে হয়। বাঁশের খুঁটি অথবা গৃহসংলগ্ন গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি বেঁধে কাঠের দোলা তৈরি করা হয়। দোলায় চড়ে মেয়েরা ওড়িশার অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবময় দিনগুলির ইতিহাস সংগীতের মাধ্যমে স্মরণ করে। ধর্মীয় নির্দেশ অনুসারে, রজঃতে ভূমিকর্ষণ নিষেধ—এই নির্দেশ এখানে কঠোরভাবে মানা হয়। তাই রজঃউৎসব উদ্‌যাপনের পর থেকেই ওড়িশাতে শুরু হয় চাষবাসের কাজ।' অম্বুবাচীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রমথেশ ভট্টাচার্য/ভূমিলক্ষ্মী/২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০

বসন্ত উৎসব :

'বসন্ত-উৎসবের নাম ছিল ফল্গু (বা ফল্গু-উৎসব) অর্থাৎ রঙীন ধুলো খেলা। ইহা হইতে এই উৎসবের বিশিষ্ট নৃত্যগীত রীতির এবং তথা হইতে সেই গানের নাম হয় অবহট্‌ঠে 'ফগ্‌গু', প্রাচীন গুজরাটীতে "ফাগু"। তেমনি রাস-নৃত্যগীত হইতে অবহট্‌ঠে "রাসউ", প্রাচীন গুজরাটী-রাজস্থানী-হিন্দীতে "রাসো, রাসা, রাস"। মেয়েলী নাচ গানের নাম 'চর্চরী' [বিক্রমোর্বশীর চতুর্থ অঙ্কে অপভ্রংশ গানের সঙ্গে যে নাচের (অথবা অঙ্গভঙ্গি ?) নির্দেশ আছে, তাহার মধ্যে "চর্চরী" ও "জম্ভলিকা" পাইতেছি। এই নাচ ও অঙ্গভঙ্গি পুতুলের। সেকালের অভিনয়ে মানুষ অভিনেতার সঙ্গে পুতুলও রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইত। 'নট নাট্য নাটক' (১৯৮৬)] হইতে অবহট্‌ঠে ও প্রাচীন গুজরাটীতে "চচ্চরী, চাচারী", বাঙ্গালায় "চাচরি" এখন লুপ্ত গ্রাম্য-উৎসবের নাম রহিয়া গিয়াছে। 'জম্ভলিকা'' নাচ হইতে আসিয়াছে রাজস্থানী "জামাল" গান। বাঙ্গালায় ইহা একদিকে 'ধামালী''তে অপরদিকে "ঝুমুর"এ পরিণত। পুতুল নাচের সঙ্গে নৃত্যগীত অভিনয় হইলে বলিত "পাঞ্চালিকা"।—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস/১ম। পূর্বার্দ্ধ/শ্রীসুকুমার সেন

ভুষম-পূজার গান :

'উত্তর বাংলার লোকসংস্কৃতির বিকাশে রাজবংশী রমণীগণ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সাধারণ মানুষের আবেগের গতিশীল অভিব্যক্তি ঘটে লোক-

সংস্কৃতির মাধ্যমে। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত গাঁয়ের মানুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে উদরান্নের জন্য। সবাই ভগবানে বিশ্বাস করে। ভূত-প্রেতকে বিশ্বাস করে। তাদের খুশী করতে নানাবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। সাধারণ মানুষ তাদের চিরাচরিত প্রথায় বিশ্বাসী। পুরাতনের ধারাকে কিছুতেই অস্বীকার করতে চায় না ; অসত্য বলে বর্জন করতে চায় না। পুরাতন প্রথার প্রতি, পুরাতন আচার-আচরণ ও বিশ্বাসের প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস।

লোকসংস্কৃতি যে কটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে অন্যতম স্তম্ভ হল লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্য মূলতঃ মৌখিক। তথাকথিত লেখাপড়া না-জানা চাষাভূষা দিন-মজুর, জেলে, কামার, কুমোর প্রভৃতি সাধারণ মানুষেরা নিজেদের কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে অচেতনভাবে রচনা করে ফেলে লোকসাহিত্যের বিপুল সম্ভার। এইভাবে গড়ে উঠেছে নানা দেশে নানাবিধ লোককথা, লোককাহিনী, লোকগীতি, প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি। লোকসাহিত্যের ভিত্তিভূমি মাটি ও মানুষ।

উত্তর বাংলার রাজবংশী রমণীগণ প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকর্মে অংশ গ্রহণ করেন। বর্ষার দিনে কোমরে খলুই বেঁধে জাঁকই, ঠোসা, বুরুং হাতে নিয়ে মাছ ধরতে বেড়িয়ে পড়েন। আবার এরাই সাইটলপূজা, সুবচনী, হুদুম দেও ও তিস্তাবুড়ির পূজায় মেতে ওঠেন পূজার আনুষ্ঠানিক পর্বের পর শুরু হয় রাজবংশী রমণীগণের নাচ ও গান।

বর্তমান প্রবন্ধে রাজবংশী রমণীগণ কর্তৃক বরুণ দেবতার আবাহনকে কেন্দ্র করে যে লোকসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

বরুণ দেবতাকে রাজবংশীগণ হুদুমদেও বলে থাকেন। হুদুমদেওয়ের পূজা একটি পুরাতন প্রথা। এ প্রথার মধ্যে ধর্ম ও যাদুবিদ্যার সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। হুদুমপূজা প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ডাঃ, ডাঃ, হান্টারের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। হান্টার বলেন যে হুদুমদেও পূজা পুরাতন কুসংস্কারের একমাত্র চিহ্ন। গ্রামের মেয়েরা দূরে কোন নির্জন স্থানে সমবেত হন। এই অনুষ্ঠানে পুরুষের প্রবেশের অনুমতি নেই। অনুষ্ঠানটি রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়। একটি কলাগাছ কিংবা কাঁচা বাঁশ মাটিতে পোতা হয়। মেয়েরা তাদের জামাকাপড় খুলে ফেলে এবং গাছটার চারদিকে নাচে এবং গান গায়। বিশেষ করে যখন একেবারে বৃষ্টি নেই এবং শস্যরাশি খরায় কবলিত, তখন মূলতঃ অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন অঞ্চলে হুদুমপূজার প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধলেখক কোচবিহার জেলায় তুফানগঞ্জ মহকুমা, জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার

মহকুমা এবং গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী মহকুমায় ব্যাপকভাবে ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছেন। কোচবিহার জেলায় শালবাড়ী, বড়শালবাড়ী, চেংটিমারী, শোলাঙ্গা, ভেলাকোপা, বারকোদালী, বলরামপুর, ভাল্লিকৈলাস এবং চৌকুসী বলরামপুরগ্রামে, জলপাইগুড়ি জেলার কামখ্যাগুড়ি, নাড়াখনি, চিকনীগুড়ি, ও ভাটিবাড়ী গ্রামে এবং গোয়ালপাড়া জেলার গৌরীপুর ও গোকালাসি গ্রামে রাজবংশী রমণীদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি গান সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

হুদুমপূজার উপকরণ :

১. একটি কলাগাছ ; ২. কলাগাছে মালা পড়ানোর জন্য মৌসুমী ফুল ; ৩. মাটির ঘট ; ৪. আম্রপল্লব ; ৫. ষোলটি কাঁচা অথবা পাকা কলা ; ৬. চিঁড়া, দই, গুড়, ৭. কুলা ; ৮. দুটি প্রদীপ কিংবা মোম বাতি ; ৯. সিঁদুর, ধুপধুনা ; ১০. চিল, ফিঙে ও ঘুঘুর বাসা।

ছাম ও গাইন দিয়ে কোটা তুষ জল দিয়ে মাখা হয়। সাতবাড়ী থেকে জল সংগ্রহ করা হয়। তুষের এই পিঠা হুদুম দেওয়ের প্রতীক হিসেবে কলাগাছকে উৎসর্গ করা হয়। এই পিঠা তৈরী করতে পারবে একমাত্র কুমারী মেয়েরা। এক মায়ের যে এক সন্তান সেই পারবে কলাগাছটি রোপণ করতে।

সাধারণতঃ ৬।৭ জন মহিলা পূজায় অংশগ্রহণ করেন। নাচগানের সময় উপযুক্ত বাদ্যযন্ত্র পাওয়া না গেলে, টিন বাজানো হয়। মেয়েরাই বাজায়। পশ্চিম ডুয়ার্সে সাধারণতঃ পরপর তিন রাত ধরে হুদুমদেওর পূজা হয়। তৃতীয় রাত্রির শেষে কলাগাছ, মাটির ঘট ইত্যাদি নিকটস্থ নদীতে কিংবা পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়।

গান : হিল হিলাছে কমরটা মোর
শির শিরাছে মোর গাও
কোনঠে কোনে গেলে এলা
হুদুমার দেখা পাও।
পাটানিধান পড়েছে খসিয়া
আওলা হইছে খোঁপটি মোর
হুদুম দেখা দাওগো আসিয়া
আইলেকরে হুদুম দেওয়া
বসিয়া বসিয়া
তোর পরেই মুই আছোরে বসিয়া

ভিংসলি ভিংসলি কমরটা
তাতেও নাই মোর ভাতারটা
কয়কি মুই কাইবা কয়
কোনঠে গেলে দেখা হয়
দেখা হলে দেহটা জুড়ায়।

পবিত্রকুমার গুপ্ত/হুদুমপূজার গান/সমকালীন/মাঘ, ১৩৮৩

৯. সূর্যপূজা :

'মুঘল সম্রাটদের মধ্যে আকবর ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কল্যাণকামী ও প্রজানুরঞ্জক। তাঁর উদারধর্মমতের জন্যে তিনি গোঁড়া মুসলমানদের কাছে অপ্রিয় হয়েছিলেন, যদিও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা এজন্যে আকবরকে দেবপ্রেরিত বলে মনে করতো। তিনিই প্রথম হিন্দুদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে তিনি রাজনীতির সূক্ষ্ম খেলা খেলেছিলেন তবুও তাঁর মানসিক ঐশ্বর্যের হানি হয় নি। তাঁর দীন-ই-ইলাহী ধর্মমত ধর্মান্ধ ধনী মুসলমানরা না মানলেও সাধারণ মানুষের কাছে তা প্রিয় হয়েছিল। একথা সত্য, আকবর নিজে সাধক ছিলেন না, অধ্যাত্মচেতনার আলোকে তিনি উদ্ভাসিত হন নি। একারণেই বোধহয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত দীন-ই-ইলাহী ধর্মমত তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অবলুপ্ত হয়।

আকবরের কুসংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সূর্যোপাসনায়। তখন দিল্লীতে দুটি প্রধান উৎসব ছিল—নওরোজ ও খোসরোজ। 'নওরোজ-ই-জলালী' নামে যে উৎসবটি পালিত হতো তা ছিল পারসীদের প্রাচীন প্রথা অনুসরণে। আকবর কেবলমাত্র সূর্য উপাসক ছিলেন না। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করতেন যে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র মানুষের দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আকবরের প্রিয়পাত্র বীরবল বাদশাহকে সূর্যের নানা শক্তির কথা শোনান। তিনি বাদশাহকে বলেছিলেন, সূর্য কেবল যে শস্যোৎপাদন, উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পরিপুষ্টিসাধন ও বিশ্বকে আলো দেবার কাজ করে তা-ই নয়, মানুষকে বুদ্ধি দেয়, শক্তিশালী করে। বীরবল আকবরকে বুঝিয়েছিলেন যে রাজা সৃষ্টিরক্ষাকারী তেজের মূল উৎসরূপী সূর্যের উপাসনা না করেন, তাঁর ক্ষমতা, প্রভুত্ব, রাজশক্তি সত্বর লোপ পায়।

নিজের ইচ্ছেতেই মনে হয় আকবর সূর্যপূজা করতেন। তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে সূর্যোদয়ের ও মধ্যরাতের বিশেষ ক্ষণে নহবৎ বাজে। সূর্যের কক্ষপথে ঘোরার বিভিন্ন সময়ে তোপ ও বন্দুক দাগার ব্যবস্থা হয়েছিল। এ কাজটি

প্রচর গণনার জন্যে। আকবর মনে করতেন এইভাবে মানুষকে জানিয়ে দিলে সে খোদার কাছে নিয়মিতভাবে প্রার্থনা করতে পারবে। সবচেয়ে বড়ো পর্ব ছিল 'নওরোজ'। এদিন থেকে সূর্যের সাম্বৎসরিক যাত্রা শুরু হচ্ছে বলে ধরা হতো। এ পর্বের অনুষ্ঠান হতো 'কারওয়ার দিন' মাসের প্রথম তারিখে। ঐ মাসের ১৯ তারিখেও সূর্য উৎসবের দিন বলে মনে করা হতো। রাত্রে দেয়ালী ও সূর্যাস্তের সময় নাকাড়া বাজানোর ব্যবস্থা ছিল।

রাত্রে সম্রাটের প্রাসাদে আলোকসজ্জার আলোর মূল উপাদান ছিল 'স্বর্গীয় আলোক'। বেলা দ্বিপ্রহরে সূর্য যখন মধ্যগগনে থাকে তখন একখণ্ড 'সূর্যকান্তমণি' উপযুক্ত স্থানে থাকতো। সূর্যের কিরণ মণির ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে তুলোর সংস্পর্শে এসে তাকে প্রজ্জ্বলিত করতো। সূর্যকিরণজাত অগ্নি এভাবে সংগ্রহ করে উপযুক্ত লোকের হাতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেওয়া হতো। যে পবিত্র আধারে এই অগ্নি যত্ন সহকারে থাকতো তাকে বলা হতো 'অগ্নিগিরি'।

আকবর সূর্য ও অগ্নি উপাসনা করতেন। যখন তিনি অশ্বারোহণে বাইরে বেড়াতে যেতেন, তখনও সূর্যাস্তের ঠিক আধঘন্টা আগে তিনি শিবিরে বা প্রাসাদে ফিরে আসতেন। তাঁর আদেশ ছিল অসুস্থ বা নিদ্রিত অবস্থায় থাকলেও তাঁকে এই সময় জাগিয়ে দিতে হবে। তখন তিনি হাতমুখ ধুয়ে রাজবেশ, মণিমুক্তা, মুকুট সব খুলে রাখতেন। একাগ্র চিত্তে বসে মনকে নিজের আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করতেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে তাঁর একজন ভৃত্য স্বর্গীয় অগ্নির সাহায্যে জ্বালাতো বারোটি উজ্জ্বল দীপ ও কয়েকটি বাতির ঝাড়। তারপর একজন সঙ্গীতজ্ঞ এসে একটি উজ্জ্বল দীপ হাতে নিয়ে নানা রাগ-রাগিণী পরিবেশন করতেন। গানে ঈশ্বরের গুণকীর্তন হতো। সবশেষে 'বাদশাহের রাজ্য চিরস্থায়ী হোক'—এই প্রার্থনা ক'রে বিদায় নিতেন।

নওরোজের প্রথম দিন আকবর সকলের সামনে ভূমি প্রণাম করতেন এবং হিন্দু ও পারসীদের মতো সূর্যোপাসনা করতেন। উৎসবের অষ্টম দিনে বাদশাহ্ কপালে চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ ক'রে সভায় আসতেন। সেখানে ব্রাহ্মণেরা বাদশাহের হাতে মণিময় রাখী বেঁধে দিতেন। আকবরের রাজপুত মহিষীরা স্বামীর মঙ্গলের জন্য হোম করতেন, শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করতেন। আকবরও সানন্দে 'হোমের টীকা' কপালে নিয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতেন।' সম্রাট আকবরের সূর্যপূজা/আনন্দবাজার/১৩ ডিসেম্বর/১৯৮১/অমিয়কুমার মজুমদার

১০. কৃষি উৎসব 'মুট' :

শরতের পুজোর রেশ শেষ হতে না হতে শুরু গ্রামবাংলা জুড়ে ফসল তোলার উৎসব। 'মুট' আনায় সেই উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা। মুট আনা উৎসব অবশ্য সর্বত্র প্রচলিত নয়। বীরভূমের সাঁওতাল পরগণার ধারঘেঁষা অঞ্চলে এর প্রচলন খুবই। পয়লা অগ্রহায়ণ অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব। পয়লা অগ্রহায়ণই নির্দিষ্ট দিন। তিথিনক্ষত্রের হেরফের হলেও এই দিনেই মুট আনে চাষী পরিবার প্রতি বৎসর। কার্তিকেই আউশ উঠে যায়। কিন্তু তার পরিমাণ তো স্বল্প। আসল ফসল আমন। অনেক এলাকায় বছরে একবার উপার্জিত ধন। সেই ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত। মুট অর্থাৎ ঘরে লক্ষ্মীর প্রবেশ ঘটিয়ে শুরু এই কৃষি-উৎসবের ধারাটিও তাই বহমান। উলু আর শঙ্খধ্বনিতে হিম ঝরান সকালের বাতাস আকুলিত করে ক্ষেত থেকে একের পর এক মুট মাথায় সদ্যস্নাত নগ্ন গায়ে কিষাণ লক্ষ্মীকে প্রবেশ করালেন ঘরে। ঢাকের বাদ্যি নেই, সাজ-পোশাকের ঝলমলে চাকচিক্য নেই, কিন্তু লক্ষ্মীকে ভক্তিনম্রচিত্তে গৃহবধূদের বরণের রূপে পুজোর গন্ধ পাড়াজুড়ে থৈ থৈ করছিল। মুট আনা উৎসব শুধু লক্ষ্মীবরণ নয়, কৃষাণবরণও বটে। ক্ষেতের ঈশান কোণ থেকে আড়াই আলোই ধান কেটে নেয় কিষাণ। আলোই অর্থাৎ হাতের মুঠোতে যতগুলো গুচ্ছ ধরে। এই ধানকাটার ক্ষেতটিও নির্দিষ্ট থাকে। চাষী-পরিবার সুদীর্ঘকাল ধরে পুরুষানুক্রমে সেই একই ক্ষেতের ধান কাটেন মুটের জন্যে। ধান কাটার পর আঁটি বেঁধে কিষাণ তাকে শুদ্ধ বস্ত্রে জড়িয়ে নিয়ে মাথায় চড়ান। খড় কিংবা ধান কিছুই দেখা যায় না। তার আগে কিষাণকে স্নান করতে হয়। মাথায় নেওয়ার পর কথা বলা নিষেধ। গাঁয়ের বাইরে ক্ষেত। গাঁয়ে মুট মাথায় ঢোকার পর গোবর জলের ধারা দিয়ে শঙ্খ এবং উলুধ্বনি দিয়ে কিষাণকে আনা হয় পরিবারের কুলদেবতার মন্দিরে। আলপনা আঁকা পিঁড়িতে বসান হয় দীর্ঘ কলাবউয়ের মত মুটটিকে। পূজা হয় সেইদিন মুটের। কুলদেবতার মন্দির ছাড়াও অনেক বাড়িতে লক্ষ্মীঘরেও এই মুটকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে। যে কিষাণ মুট বয়ে আনেন তাঁকে পোড়া জিনিস সেদিন খেতে নেই। মুট আনার পর চিঁড়ে-দইয়ে তাঁকে ফলার করাতে হয়। মধ্যাহ্নভোজনও করে গৃহস্থবাড়িতে সেই কিষাণ। মুট উৎসবের পরের দিন কুলদেবতার মন্দির থেকে, ঘরে থাকলে সেই লক্ষ্মীঘর থেকে মুটটিকে বের করা হয়। আচ্ছাদন খুলে, ধানগুলো যাতে কিছুতে নষ্ট না করতে পারে তার জন্যে ধানের গুচ্ছটিকে সাদা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে চালে তুলে রাখা হয়। লক্ষ্মীর ধান রাখার রেওয়াজ আছে। হাঁড়ি ভরতি ধান থাকে প্রায় সব গৃহস্থবাড়িতে। বছর বছর

ধান বদল করতে হয়। এ ধানের ভাত হয় না। আতপ করে কিংবা অন্যভাবে নতুন ধানে সেই হাঁড়ি পূর্ণ করার পর আহারের ব্যবস্থা করতে হয়। নতুন লক্ষ্মীর ধানের সঙ্গে তখন মেশাতে হয় এই মুটের ধানগুলিকে। মুটের ধানটি ঝাড়ার মধ্যেও নিয়ম আছে। আছাড় দিলে হয় না। এক আঁটি ধান পায়ে মাড়িয়েও ধান মাড়াই করার উপায় নেই। হাতে করে এই ধানের শীষ থেকে ধানগুলো টেনে নিতে হয়। লক্ষ্মীরূপে এরই তো পূজা হয়েছে একদিন। খড়টিকে গরুকে দেবার উপায় নেই। দেবদেবীর মূর্তি বিসর্জনের মত জলে বিসর্জন করতে হয় এই খড়ের আঁটিটি। শহর দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে জাতিবৈষম্য এবং ছোঁয়াছুঁয়ির কুসংস্কারের আদিম দানোটি এখনও তার রাজত্ব কায়েম করে আছে যথেষ্ট প্রতাপের সঙ্গে। বাগদী, বাউড়ী ইত্যাদিকে মন্দিরে প্রবেশ কিংবা দেবদেবীর কোন কাজে নিয়োজন করা হয় না। অথচ সেখানে লক্ষ্মীকে বহন করে মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে তাকে। এজন্যে বলেছিলাম কিষাণবরণ উৎসবও এটা বটে। কৃষি উৎসবগুলির মধ্যে তথাকথিত নিম্নবর্ণের কিষাণকে এত মূল্য আর কোন কিছুতে দেওয়া হয় না। পয়লা অগ্রহায়ণের সোনালী সকালে গা জুড়ে গৃহবধূদের নতুন ধান অর্থাৎ লক্ষ্মীকে গৃহে প্রবেশ করানর পবিত্র অনুষ্ঠানে মঙ্গলশঙ্খ এবং উলুধ্বনির মুখরতায় এই উচ্ছলতাটুকুও কম কথা নয়।

ভূমিলক্ষ্মী/১২ অগ্রহায়ণ ১৩৮৪/অশোককুমার সেনগুপ্ত

রাঢ়ের কৃষি উৎসব : আখের বাখার

লৌকিক উৎসবে বাঙ্গালী জীবন যেমন উচ্ছলতায় টলমল করে ওঠে তেমনটি কিন্তু পুরানো দেবদেবীর পূজায় পরিলক্ষিত হয় না। এখানে পদে পদে শাস্ত্রের অনুশাসনের ভয় নেই, ভয় নেই শুচিতা-অশুচিতার। ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণের অর্থ না বুঝেও জোড় হাত করে বসে থাকতে হয় না। এমনকি সম্ভ স্নানে, শুদ্ধ বস্ত্রে, নির্জলা উপবাসে, প্রহর গুণতে গুণতে ব্যাকুল হবারও দরকার নেই।

লৌকিক উৎসবে দেবতা নেই। অনেক উৎসবে আবার দেবতার দেখাই পাওয়া যায় না। কেবল অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক আনন্দ মুখরতা এই উৎসবের প্রাণ। যাদু প্রক্রিয়ার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস এই সব উৎসবের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আদিম সমাজে নৈসর্গিক বিপর্যয় ভীতি-বিহ্বল মানুষকে খাদ্য অন্বেষণের জন্য অস্থির করে তোলে। তাই প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ, প্রাগৈতিহাসিক জন্তু জানোয়ারের ভয়, খাদ্য সংগ্রহে বাধা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানলের ভয়, প্রবল প্লাবনের ঝঞ্ঝাট, খাদ্য সঞ্চয় করার জন্য ভাবিয়ে তোলে মানুষকে। বিস্তৃত অতীত হতে মানুষের

মধ্যে খাদ্য সঞ্চয়ের প্রবণতা দেখা যায়। তাই সঞ্চয় করার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করে চলে মানুষ। সংগ্রহ ও সঞ্চয় প্রাচীন সভ্যতার জন্ম দেয়। কেন না সংগ্রহ করার জন্য সে যুগে গোষ্ঠীবদ্ধতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

তবুও গ্রামীন সমাজে এমন কি আজও লৌকিক উৎসবের মধ্যে পুরানো মানুষের যাদু-চিন্তা একটু লক্ষ্য করলে সুস্পষ্ট দেখা যায়। মানুষের ইন্দ্রজাল চিন্তা, অসম্ভব সংঘটনের সব সময় আশংকা, নানা প্রকার বিধিনিয়ম, তুক-তাকের জন্ম দিয়েছে। এই সব বিধিনিয়ম পালন করতে প্রথাগত আচরণীয় বিধির জন্ম হয়।

সঞ্চয়ের কামনা (সুখী থাকার জন্য, সম্বৎসর সন্তান-সন্ততিকে সুখে রাখার জন্য) সেদিনের মানুষকে ব্যাকুল করে তোলে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাঙালী জীবনে এমন বহু অনুষ্ঠান রয়েছে যার মধ্যে বাঁচার জন্য, সন্তান-সন্ততিকে সুখে রাখার জন্য শস্য সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের কামনা বিশেষ প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এই কামনাই কৃষিকেন্দ্রিক জীবনের সূত্রপাত করে। কৃষি জীবনের ধারায় বহু কামনা সঞ্চিত আছে। এই কামনাগুলি অনুষ্ঠানে রূপ পেয়ে থাকে।

কৃষিভিত্তিক গ্রাম জীবনে 'আখের বাঁধার' তেমনি একটি প্রথাগত আচার। এই আচারটি বীরভূমের বহু পল্লীতে অনুষ্ঠিত হ'তে দেখা যায় পয়লা মাঘ সন্ধ্যায়। পয়লা মাঘ শস্য বৎসরের প্রথমদিন। এই দিনে পল্লীগ্রামে অনেক পূজা অনুষ্ঠিত হ'তে দেখা যায়। বিশেষ করে ধান কাটার শেষে জংগলের সেই ক্ষেতে ক্ষেত্র-দেবতার পূজা ও বলিদান অনুষ্ঠিত হয়। জংগলের মাঝে মাঝে যে সব ক্ষেতে বিচিত্র দর্শন পাথরের স্তূপ থাকে, সেই স্তূপকে উপলক্ষ্য করে চাষীরা পূজা ও বলিদান দেয়। বীরভূমে বহু গ্রামে পয়লা মাঘ ব্রহ্মদৈত্য পূজা ও মেলা হয়। সোনাই চণ্ডী, পাথর চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী প্রভৃতি চণ্ডী দেবতার পূজাও পয়লা মাঘ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এই চণ্ডীদেবতা আদিম মানুষের দেবতা। "Chandi the goddess is daughter of a Hadi" "হাড়ির ঝি চণ্ডী মা" is a familiar line which occurs often the collophon". [Folk literature of Bengal/ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন] আবার আদিবাসীদের 'বাধনা' পর্বের শেষদিন পয়লা মাঘ। এই পর্বগুলির ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই পর্বগুলি বহু প্রাচীন কালের। এমনও মনে হয় যে কোন কোন অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে আদিম কালে। বীরভূমে পয়লা মাঘকে 'একেশ' বলে। তখন মাঠের পাকা ধান ঘরে আসতে পৌষের শেষ হয়ে যেতো। নানা রকম রবিশস্যও ঘরে আসতো। তাই 'আখের বাধার' অনুষ্ঠানটি বাঙলাদেশে বিশেষ করে বীরভূমের বহু গ্রামে এখনও

প্রতিপালিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি বহু প্রাচীন ; অনুষ্ঠানে কোন দেবতার পূজা নেই। আদিম মানুষের 'আখের বাখার' একটি আচার মাত্র। মানুষের বেঁচে থাকার কামনা।

পৌষসংক্রান্তির সন্ধ্যাবেলা গৃহস্থের উঠানটিকে উত্তম রূপে নিকানো হয়। গোবরের বিশেষ 'মাড়ুলী' দেওয়া হয়। তারপর উঠানের মাঝে চাল বাটা দিয়ে অনেক বড় একটি গোল দাগ দেওয়া হয়। ঐ গোল দাগটিকে ঘিরে আরও দু' তিনটি গোল দাগ দেওয়ার পর দাগের ধারে ধারে আলপনা দেওয়া হয়। তারপর বৃত্তের মেঝেতে—লম্বালম্বি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য-প্রস্থে কতকগুলি দাগ টানা হয়। তার জন্য কতকগুলি চার কোণ ঘর তৈরী করা হয়। এই ঘরগুলি মানুষের অক্ষয় হওয়ার কামনার চিরন্তন প্রতীক। তারপর প্রত্যেকটি খোপে সরষে, হলুদ এক গাঁট, চাল, ধান, লবণ, কাপাস তুলা, বুট, মুসুরি, আলু, খইল আর সরু ধান, সুগন্ধ চাল, অল্প করে রেখে রেখে প্রত্যেকটি পূর্ণ করা হয়। মধ্যকার খোপে থাকে একটি তামার পয়সা। একটি ঘরে পাক কাটা সুতো দেবার নিয়ম আছে। এখন নতুন কাপড় থেকে সুতো টেনে দেওয়া হয়। ধূপ আর প্রদীপ জ্বলে এই আসরে। সব রকমের কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য রেখে একটি বড় ঝুড়ি ঢাকা দিয়ে রাখা হয় সারারাত। পাশে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। ভোরে উঠে কুল-বধূরা (কাক-কোকিল ডাকবার পূর্বে উঠে) জিনিসগুলি তুলে নেয়। বাড়ীতে সব শস্যের মধ্যে ঐ শস্যগুলি রেখে দেওয়া হয়। ধানের মড়াইয়ে ঐ আখের বাখারের ধান মিশিয়ে দেওয়া হয়। এমনি করে অন্য দ্রব্যগুলি রাখা হয়।

এই আখের বাখার শব্দটি লৌকিক। 'আখের' কথার অর্থ ভবিষ্যৎ, আর 'বাখার' কথার অর্থ মড়াই বা শস্যভাণ্ডার। তাই মনে হয় ভবিষ্যত শস্য ভাণ্ডারের পরিপূর্ণতার কামনায় প্রাচীন কালে এই অনুষ্ঠানটির সূত্রপাত হয়। আজও তার বিরাম নেই। এই অনুষ্ঠানে কোন ব্রত-মংগল বা পাঁচালী বলার রীতি নেই।

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে' বলে এককালে বাঙালী ঈশ্বরীর কাছে বর চাইতো। তেমনি আখের বাখার অনুষ্ঠানের মধ্যে সেই কামনার যেন চিরন্তন রূপ ফুটে ওঠে। এই অনুষ্ঠানটি তাই গ্রাম বাঙলার কৃষি উৎসবের মধ্যে অন্যতম।'*

লোকসংস্কৃতি/অজিতকুমার মিত্র

---

* মেদিনীপুরের 'আইকল', পুরুলিয়া, সিংভূম, বাঁকুড়া, বীরভূমেও 'আখান', 'আইখান যাত্রা' ও সাঁওতালদের 'আ-খাএ্‌র্‌-মুতরা' ও 'আখের বাখারে'র সঙ্গে যৌন ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। এগুলির উৎস এক। অঞ্চলভেদে লৌকিক তাৎপর্য ও আচার ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে কাল প্রবাহে। এই প্রসঙ্গে 'আঞ্চলিক শব্দ : কাঁথি' (পূর্ণচন্দ্র দাস) ও বাংলার আদিবাসী লোকজীবনে আ-খাএ্‌র্‌-মুতরা (যতীন্দ্রনাথ মাহাত) যথাক্রমে লোকসংস্কৃতি পত্রিকার ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৩৮০—৮১ ও ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৩৭৯ দ্রষ্টব্য। হিট্‌টী প্রত্নলেখমালায় একটি শব্দ 'অইক বর্তন', সংস্কৃত 'একবর্তন' (সং 'এক' শব্দের প্রাচীন রূপ ছিল 'অইক')। সম্ভবতঃ 'অইক বর্তন' থেকে 'আইকল' > 'আখান' সৃষ্টি হয়েছে। —লেখক

নবান্ন : অন্নলক্ষ্মীবরণ উৎসব

'হেমন্তের দিন আসে সোনালী ফসলের সুবিশাল ভাণ্ডারটি দুহাতে নিয়ে। সোনার বরণ ধানে মাঠ থৈ থৈ। তারপর চাষীর ঘর উঠোন জুড়ে সোনার শরীরের ছড়াছড়ি। অন্নরূপে একে গ্রহণের অনুষ্ঠানটিই নতুন অন্ন লক্ষ্মীবরণের উৎসব। নির্দিষ্ট কোনদিন নয়, অঞ্চল বিশেষে শুভদিনে এই অনুষ্ঠান। আর সেই সুযোগে একাধিক ধানের উৎপাদন অনেক জায়গায় হলেও এই বড় মরশুমকে কেন্দ্র করেই কিন্তু নবান্ন উৎসবের ধারাটি বয়ে যাচ্ছে। অগ্রহায়ণে-পৌষে।

অনেক এলাকার এক ফসলি ভুঁইয়ের অঞ্চলে ধান ওঠার মরসুম কিছু আগেই শুরু হয়ে যায়। নবান্ন তাই স্বভাবতই সবার আগে। এসব এলাকায় উৎসবের সুরটি প্রায় সেই এক খাদেই বাঁধা। তা বলে আয়োজন অনুষ্ঠানের সেই ঐশ্বর্যময় রূপের উজ্জ্বলতা কি এখনও সমান দীপ্যমান? না এমন কথা বলা যাবে না। কারণ যাই থাক, অনেক নিষ্প্রভ। গ্রামীণ উৎসবগুলির অনেকগুলিই লয়ের দিকে। কিছুর কাঠামোটুকু খাড়া। যাতে রক্তমাংস মেদমজ্জার সঙ্গে জীবনী শক্তির ছিঁটেফোঁটাও দেখা যায় না। নবান্নকে এদিক দিয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। অগ্রহায়ণের গোড়ায় শহর দূরবর্তী এক ফসলি ভুঁইয়ের গাঁয়ে অনুষ্ঠিত নবান্ন চিত্রের এই প্রতিবেদনটি অন্ততঃ সে কথাই বলবে। এবারে বড় ফসল ঘরে। কান পাততেই তাই উল্লাস শোনা যাচ্ছিল। এক পলকেই বোঝা যাচ্ছিল দিনটির গায়ে লেগেছে উৎসবের রঙ। পুজো পুজো গন্ধের ঘন বাতাস শ্বাস টানলেই টের পাওয়া যাচ্ছিল। নবান্ন মূলত রন্ধনের উৎসব। ফসলকে খাদ্যরূপে নেওয়ার উৎসব। তাই গৃহিণীদের বড় ব্যস্ততা এই দিনটিতে। প্রস্তুতিপর্বেই সব উৎসবের মত এরও ব্যস্ততা শুরু হয়েছে ক'দিন আগেই। নতুন চাল চিঁড়ে তৈরি হয়েছে। ঘরের হাঁড়িকুড়ি থেকে রন্ধনশালাটি পর্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ভোগ মন্দির করা হয়েছে। তারপর এই উৎসবের দিন সকালেই স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্রে পূজার আয়োজন, রাঁধার ব্যস্ততা। কোন কোন পাড়ায় কুলদেবতার ঘরেই চলেছে এই রন্ধনের পর্ব। ভাত, পায়েস, ভাজাভুজি, ষোড়শ ব্যঞ্জন। আগে দেবভোগ তারপর গৃহস্থের অন্নগ্রহণ। সকালের পুজো হতেই অবশ্য প্রসাদরূপে নতুন চাল খাওয়ার রেওয়াজ। নাম বাট। ভেজা আতপ চাল দুধ ক্ষীর গুড় নারকেল এবং অন্যান্য ফলের কুচি, আধ আদার মিশ্রিত বাটি ভর্তি একটা আহার। তারপরই নতুন চালের ভাত, পায়েস। চাষী পরিবারে শুধু নিজেদের অন্ন গ্রহণই নয়, অ-চাষী পরিবারগুলির মধ্যে ভাত ডাল তরকারী বিতরণও এই অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গ। গ্রামের দাই, রজক,

চৌকিদার ইত্যাদি তো বটেই অন্য বৃত্তিধারীদেরও চাষী পরিবারে এটা পাওনা। গ্রামের নাই অতীতের প্রসঙ্গে বলল সে ঝুড়ি ভর্তি ভাত নিয়ে গিয়েছে। বাড়ি বাড়ি থালা থালা ভাত। তাই ঝুড়ি নিয়ে যেতে হত। এখন হাতের মুঠোয় দেয়। দশ বাড়ি ঘুরে একথালা ভাত। বর্ষীয়ান এক চাষীরও বক্তব্য তাই। বললেন, মশাই নবান্নর দিন গাঁ জুড়ে ভাতের মেলা। ঘর পিছু অন্ততঃ দশ সের চালের ভাত হত। আজ এখানে কাল ওখানে নবান্ন। এ সময়টায় ভিখারীদের ছিল অঞ্চলে নিত্য ভোজ।

নবান্নও দেখছেন দুবছর পর তাও থাকবে না। গাঁয়ে এখন ভিক্ষেতেও চাল দেওয়ার রেওয়াজ উঠে পয়সা হয়েছে। বর্ষীয়ান চাষীর কথা অসত্য নয়। কিন্তু দূর ভবিষ্যতের কথা থাক, উনিশ শ সাতাত্তরের মরসুমেও এই অন্ন বিতরণের অনুষ্ঠান দেখা গেল। নানা অঞ্চলে শুভ দিনক্ষণ দেখে হচ্ছে। কৃষিক্ষু তবু লয় হয়নি, এও সান্ত্বনা। দিনভোর নবান্ন ভাতের উৎসব। রাত্রিবেলায় গৃহিণীরা এই উৎসব সাঙ্গ করেন একটা অনুষ্ঠানে। তা হল নতুন—পুরাতনের মিলন। নতুন চালের সঙ্গে পুরান চালকে মিশিয়ে নাড়া দিয়ে ছড়া বলতে হয়। ছড়াটির বক্তব্য হল পুরাতনের সঙ্গে নতুন তোমাকে মিলিয়ে নিলাম। অর্থাৎ 'হে পুরাণ তোমাকে বিদায় জানাই নতুনকে আবাহন করি।' কিন্তু তা বলে তোমাকে ত্যাগ করছি না, তুমিও মিশে রইলে আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাঁড়ারে। বাটিতে সামান্য চাল নিয়ে এটি করার রেওয়াজ। কৃষি উৎসবের সেরা এই নবান্ন উৎসব সম্পর্কে গাঁ বাংলায় ভক্তির প্রাবল্য কিন্তু মোটেই কম নয়। সম্পন্ন প্রায় অধিকাংশ চাষী পরিবারই ধান উঠলেও, এই অনুষ্ঠানের আগে নতুন অন্ন গ্রহণ করেন না। বাঙালী মানসিকতায় এই নতুন অন্নলক্ষ্মী বরণের উৎসব ধারাটি শুকিয়ে যাবে না নিশ্চিত। শুধু কাল রূপান্তর ঘটাবে। নতুন ধান এবং নবান্ন তো একই অর্থবাহক।'

অশোককুমার সেনগুপ্ত/ভূমিলক্ষ্মী/১১ অগ্রহায়ণ ১৩৮৪

একটি লোকউৎসবের প্রবাহ : ছাতা উৎসব

কেউ বলে ছাতা পরব আবার কেউ বলে ছাতেম বঙ্গা। প্রাচীন গণ্ডোয়ানা ভূখণ্ডের শাল, পলাশ, হরিতকী, বহড়া, কেন্দু, ধাধকী প্রভৃতি গাছ গাছালী অধ্যুষিত অরণ্য প্রদেশের আরণ্যক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক আদি অস্ট্রেলীয় এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠির মানুষের মধ্যেই এই উৎসব সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ।

অস্তিত্ববোধের ক্রিয়াবাদের ঐক্য একটি কাঠামোগত রূপ নিয়ে দেশজ ও আঞ্চলিক অস্তিত্বের জন্ম দেয়—তাই দেখি ভাদ্রসংক্রান্তি রাত্রিতে হাজারে

হাজারে যে মানুষেরা একত্রিত হন—বিভিন্ন স্থানের ছাতা পরবে তা কোন বিহারী, বাঙালী উড়িয়া সংস্কৃতির মধ্যবিত্ত মানসিকতার টানে নয়—তা হাল ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির অরণ্য আদিম আহ্বানে একত্রিত হন সকলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অধুনা মানভূমের ভূমিজ ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ছাতাউৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তা অতীতকাল থেকে প্রচলিত ছাতা পরবের হিন্দু সংস্করণ মাত্র।

ছাতা উৎসব মূলতঃ বৃক্ষপূজা। এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শস্যোৎসব। অধুনা মানভূমের ভূমিজ ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ছাতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তা সামন্ততান্ত্রিক গন্ধযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে ছাতা উৎসব আরো অনেক বেশী পুরাণো এবং আদিম জনগোষ্ঠির যৌথ লোকউৎসব।

অরণ্যভূমির লোকেরা ভালো করেই জানে কত অপদেবতা পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহার আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকে, তাদের সন্তুষ্ট করতে না পারলে ফসল ফলবে না, আকাশে বৃষ্টি ঝরবে না।

ছাতা পরবের অনুষ্ঠানে বিরাট একটি শাল গাছের খুঁটি পুঁতে তার উপর বেঁধে দেওয়া হয় প্রকাণ্ড এক ছাতা। ছাতাটিকে সজ্জিত করা হয় নানা পুষ্প সম্ভারে। অধুনা স্থানীয় ভূমিজ ভূস্বামী পালকীতে চেপে সাঙ্গোপাঙ্গসহ উপস্থিত হন অকুস্থলে। পূর্বে অবশ্য ঘোড়ায় চেপে যেত। তারপর সকলে একত্র হয়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করে পূজো দেওয়া হয় শালবৃক্ষকে। পূজো শেষ হবার পর সম্মিলিত নরনারীর নাচ-গান শুরু হয়। রেগাড়া টামাকের আওয়াজে মেতে ওঠে আদি-অস্ট্রেলীয় মানুষ আর মাদলের শব্দে মেতে উঠে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মানুষ।

উৎসবের বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এই উৎসব মূলতঃ শস্য-সংক্রান্ত উৎসব। শস্যবর্ধন কামনাই এর উদ্দেশ্য। এতে শস্য উৎপাদন, প্রজনন ক্রিয়া ইত্যাদি উর্বরতাবাদের বিশিষ্ট গুণগুলো সংগুপ্ত থাকে।

জেমস ফ্রজারের মত অনুসারে আদিম জাদুক্রিয়া সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করত। এই জাদুক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে যে বিশ্বাসটি স্থান পেত তা অনুকরণ করলেই প্রার্থিত কামনাকে রূপায়ণ করা সম্ভব।

ঋতুচক্রের পালাবদল, অঙ্কুরোদ্গম, লতাগুল্ম ঔষধি বৃক্ষের জন্ম এবং মৃত্যু সব কিছুকে আদিম মানুষ কোন অপদেবতা বা দেবতার জীবন-কাহিনীর বিভিন্ন অধ্যায় বলে মনে করত। তারা বিশ্বাস করত জাদুক্রিয়াগুলো নিখুঁতভাবে অনুসরণ করতে পারলে যথাসময়ে বৃষ্টি এবং রৌদ্রের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলা যায়, যার ফলে দেবতার জীবনধারাকে সজীব চঞ্চল করে মানুষের কামনা বাসনার উপযোগী করে নেওয়া সম্ভব। আর এখান থেকেই প্রকৃতি দেবতার জন্ম বৃদ্ধি এবং

মৃত্যুকে কেন্দ্রকরে একটি জটিল আচার সর্বস্ব বিশ্বাসের জন্ম হয়। আলোচ্য জনমণ্ডলে এই লোকবিশ্বাস বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান এবং উৎসবের মধ্য দিয়ে আজো রূপায়িত হয়ে চলেছে। কোথাও তা নিষ্প্রাণ কিছু আচার-পদ্ধতিতেও পর্যবসিত, কোথাও তা সমষ্টিগত নৃত্য-গীতে চঞ্চল এবং সজীব। ছাতা পরব এমনি এক উৎসব।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে কৃষিজ উৎপাদন অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে আদিম মানুষের সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হয়ে যেত। সমস্ত শ্রম প্রচেষ্টায় তাই যৌথভাবে অগ্রসর হতে হত। ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কোন জিনিস ছিল না। যৌথ মালিকানার মধ্যে যৌথ প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দেবতা-অপদেবতার রোষ ইত্যাদির হাত থেকে শস্যকে বাঁচানোর জন্য প্রচুর শস্যের ফলনের জন্য, শস্যক্ষেত্রের উর্বরতা বাড়াবার জন্য সেদিন তাদের অলৌকিক জাদুক্রিয়াকে আশ্রয় করতে হয়েছিল—তাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই সময়ই যৌথ সংগীত এবং যৌথনৃত্য জাদুক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল।

আদিম মানুষ বিশ্বাস করত: বিশেষ ধরনের সংগীত বা নৃত্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় (অনাবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি) বা অপদেবতার হাত থেকে শস্যকে রক্ষা, শস্যের দ্রুত বৃদ্ধি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে তাদের সাহায্য করতে পারে। এই আদিম বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে সেদিন যে সমস্ত নৃত্যের মেল বন্ধন ঘটিয়ে আদিম মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল ঝাড়খণ্ডের জনজীবনে আজও তার প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

জনসংস্কৃতি সমাচার/ঝাড়গ্রাম/সম্পাদক : সৌমেন রায়

লোকউৎসব : ভীম পূজা

মেদিনীপুরে সমাদৃত লোকদেবতা ভীমঠাকুর। এই বিচিত্র চরিত্রের লোক দেবতাটি মূলতঃ জেলার সদর মহকুমা এবং ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার কিয়দংশে অদ্ভুতভাবে লোকসমাজে পূজিত হয়। যার আদিম উৎস জেলার অতীতের অন্ধকারে সেই লুপ্তপ্রায় প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। আজও আধুনিক শহুরে সভ্যতার মধ্যে জেলার প্রায় সর্বত্র অনুষ্ঠিত ভীমপূজা এক সার্বজনীন লোক উৎসব রূপে প্রবহমান।

লোকায়ত সমাজে ভীম মূলত চাষী। ভীমের প্রধান কাজ কৃষিকর্ম। মহাভারতে মহাবিক্রমশালী ভীমের অনুকরণে গদা হস্তে বিপুল দেহধারী মাটির মূর্তি নির্মাণ করা হয়। জেলার সদর শহরের ভীমচক, শহরের সন্নিকটে ভীমপুর আজও সেই প্রাচীন ঐতিহ্য প্রমাণ করে। প্রতিবছর মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী

তিথিতে ধান খেতের পাশে রাস্তার ধারে এই দেবতার পূজা হয়। এই দিনটি ভৈমী একাদশী নামে প্রচলিত। যদিও চলতি বছরে এই তিথিটি ফাল্গুন মাসে পড়েছে। মূলতঃ বাগদী, খেতমজুর সম্প্রদায়ের লোকেরা এর উপাসক হলেও জেলা শহরে রাজাবাজারের পঙ্কুরচক, কোতবাজারের ভীমচক, ভাদুতলা, জগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটস্থ এলাকায় এই উৎসবের উদ্যোক্তা শহুরে মানুষরাই।

পূজার মূলমন্ত্র: 'ও ভীমসেন মহাবীর মহাবিষ্ণু প্রসাধকঃ/ত্রাহিমাং বীরবীরেশ ভীমসেন নমস্তুতে/ভীমং কুন্তি সুতং/গদা যুত যুক্তং/ক্রোধান্বিতং ভীষণং। অর্জুনং নরপুঙ্গব নুর হরো/বজ্র ক্ষিপ্রেন শরেন/পাতাল ভাগীরথীংগঙ্গাপুত্র মুখে পতন মুমূর্ষু সময়ে/তং কৃষ্ণং মিত্রং ভজে।' উল্লেখের বিষয় ক্ষেত্রানুসন্ধান লব্ধতথ্যে এই মন্ত্রগুলি সাম্প্রতিক কালে স্থানীয় পুরোহিত কর্তৃক রচিত···ঘটস্থাপন করে পুরোহিত নারায়ণ শিলাসহ মূর্তির সম্মুখে বসে যথাবিহিত হোম, আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি সহকারে পূজার ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন। নারায়ণ, গণেশ ও পঞ্চদেবতার পূজার পর উপরোক্ত মন্ত্রপাঠে ভীম দেবতার পূজা হয়ে থাকে। মূর্তির গলায় বিরাট-আকারের বাতাসার মালা পরানো হয়।

শোনা যায় বাসুদেবের নির্দেশে ভীমদেবতা মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের এই একাদশী তিথিতে উপবাস থেকে নারায়ণ পূজা করেছিলেন। ভীম দেবতাকে নিয়ে জেলায় নানারকমের কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। শোনা যায় শহরের তিন কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত গোপগৃহটি মহাভারতের বিরাট রাজার দক্ষিণ গোলাঘর ছিল। এখানেই পঞ্চপাণ্ডব এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। জেলার সীমান্তে গড়বেতায় গনগনির মাঠে ভীম ও বক রাক্ষসের যুদ্ধ হয়েছিল এরকমও শোনা যায়। ভীমের বিশাল গদা-ঘাতের ফলেই নাকি দাঁতনে একটি বিশাল পুষ্করিণীর সৃষ্টি হয়। গোপগৃহে ভীমের খড়ম প্রাপ্তির কথাও শোনা যায়। কথিত আছে মেদিনীপুরে ভীম প্রথম চাষাবাদের কাজ শুরু করেন। তাই ভীমপূজা কৃষি অনুষঙ্গেরই পরিচয় বহন করে। পূজা শেষে ভীমের মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না। যেন ভীম পূজা শেষে সারা বৎসর বীরত্বের প্রতীক ও প্রহরীরূপে খেত, খামার গ্রাম ও লোকালয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং সমস্ত অশুভ শক্তির বিনাশকারী প্রতীক হিসাবে পরিগণিত হয়।··· তাই এটি সার্বজনীন লোকউৎসব হিসাবে আজও সমাদরের সঙ্গে পালিত হয়।

—সমীরণ মজুমদার

মুর্শিদাবাদের বেড়া উৎসব

মুর্শিদাবাদের বেড়া উৎসব নবাব প্রাসাদের নিজস্ব উৎসব। এ উৎসবের

যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁদেরই বহন করতে হয়। অবশ্য অর্থের অভাব আগের মত আর নবাবী চালে বেড়া উৎসব উদযাপিত হয় না। কথায় আছে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। তবে আচার, অনুষ্ঠান আগের মতই আছে। অর্থাভাবে জাঁকজমক হয়তো কমেছে। এই উৎসবের বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে মাত্র দু-হাজার টাকা। অথচ এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও উৎসবের বরাদ্দ ছিল বত্রিশ হাজার টাকা। প্রাসাদের নথিপত্রে নাকি তার প্রমাণ আছে।

'বেড়া' হিন্দী শব্দ। এর অর্থ নৌকো। বড় নৌকো। অথবা কয়েকটি নৌকোর সমন্বয়ে গঠিত একটি নৌকো বহর। পাটনাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বেড়া উৎসব পালন করা হয়। মুর্শিদাবাদে বেড়া উৎসবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানকার নবাবরা যেভাবে এই উৎসব পালন করে থাকেন, অন্য কোথাও তেমন-ভাবে হয় না। প্রত্যেক বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার হাজারদুয়ারী সংলগ্ন ভাগীরথী বক্ষে বেড়া উৎসব উদযাপিত হয়ে থাকে।

বেড়া শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব। যার নামে মুর্শিদাবাদের নামকরণ, সেই মুর্শিদকুলির আমল থেকে মুর্শিদাবাদের নবাব প্রাসাদে এই উৎসবের পত্তন ঘটে। ১৭০৪ থেকে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুর্শিদকুলি জাফর খান রাজত্ব করেন। কামগার খানের জায়গায় বাঙালার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন মুর্শিদকুলি জাফর খান। বাঙলার ইতিহাসে তাঁর মত একনিষ্ঠ ও দক্ষ শাসক আর দেখা যায়নি। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলা-বিহার-ওড়িশার নাজিম বা নবাব হন। নবাব হয়ে তিনি তাঁর রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) থেকে মকসুদাবাদে (মুর্শিদাবাদে) স্থানান্তরিত করেন। কটেরা মসজিদের মত প্রসিদ্ধ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন (স্থাপিত ১৭২৩) তিনি রেখে গেছেন। প্রবর্তন করে গেছেন বেড়া উৎসব। স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউনটস্ অব বেঙ্গল, হিস্ট্রি অব মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি গ্রন্থেও বেড়া উৎসবের উল্লেখ আছে।

মুর্শিদাবাদে বেড়া উৎসব প্রবর্তন সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। সেই কাহিনী থেকে অনুমান করা হয় ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের পর মুর্শিদাবাদ শহরে বসবাসকারী হিন্দুদের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান দেখে মুসলমানদের মধ্যে উৎসব প্রচলনের প্রেরণা জাগে। একে সংস্কৃতির রাখীবন্ধন বলা চলে। নবাব মুর্শিদকুলি জাফর খান হিন্দুদের পুরোহিত এবং মুসলমানদের মৌলানাদের ডেকে উৎসব প্রবর্তনের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। পুঁথি ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটি সূত্র পাওয়া যায়। দেখা যায়, বহু যুগ আগে পৃথিবীতে এমন একটা সময় এসেছিল, যখন সাতদিন ধরে অবিরাম বর্ষণের ফলে পৃথিবী

ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করতেই নাকি ঈশ্বর তেমনটি করেছিলেন। শিয়া সম্প্রদায়ের এক লক্ষ চব্বিশ হাজার ধর্ম প্রচারকের মধ্যে আদম-এ-সানি হজরত নূ বিরাট এক নৌকো নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন দুর্গতদের ত্রাণ ও উদ্ধারের জন্য। হজরত নূ তুফান-এ-নূ নামেও পরিচিত। ঘটনাটি ঘটেছিল ভাদ্র মাসের শেষ দিকে। জল সরে যাবার পর নূ যেদিন মাটিতে পা রেখেছিলেন, সে দিনটি ছিল ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার। সেই ঘটনার স্মরণে স্থির হয় মুর্শিদাবাদে ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ভাগীরথী নদীতে বেড়া উৎসব পালন করা হবে। তাছাড়া বৃহস্পতিবারের রাত্রিকে বলা হয় 'জুমেরাত' অর্থাৎ শুক্রবারের জুম্মার আগের রাত। সেদিক দিয়েও রাতটি পবিত্র। আর ভাদ্র মাসে নদী ভরাট থাকে, কাজেই উৎসব পালনে কোন অসুবিধার প্রশ্নই ওঠে না। সব মিলিয়ে ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের রাতটি বেড়া উৎসব উদযাপনের পক্ষে উৎকৃষ্ট রাত হিসেবে বিবেচিত হয়। এবং উৎসবটি মুর্শিদাবাদের এস্টেট ফাংসান-এ পরিণত হয়।

পৃথিবী ধ্বংসের অনুরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু ও জৈন ধর্মেও উৎসবের প্রচলন আছে। হিন্দুদের যেমন গঙ্গাপূজা, জৈনদের পর্যসান, শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের তেমনি বেড়া উৎসব। উৎসব শুরু হয় তোপখাট থেকে। রাত্রে মূল অনুষ্ঠানের আগে নবাব প্রাসাদ হাজারদুয়ারী থেকে শোভাযাত্রা বের হয়। অংশ গ্রহণ করে হাতি ও ব্যাণ্ড। হাতির পিঠে থাকে সোনার প্রদীপ। আলোর বন্যা উৎসব প্রাঙ্গণে আলোকিত হয়। দর্শক সমাগম ঘটে অজস্র। এক হাজার কলাগাছ দিয়ে তৈরি মসজিদ, নৌকো প্রভৃতি দিয়ে সাজিয়ে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। (অর্থাৎ ভোগ দেওয়া হয়) মুড়ি, ক্ষীর, পরটা ও কাগজের তৈরি মোরগ। বাজি পোড়ানো এই উৎসবের একটি অঙ্গ। সিন্নি (প্রসাদ) বণ্টন করা হয়। এই উপলক্ষে হাজারদুয়ারী প্রাঙ্গণে মেলা বসে। শহর মুর্শিদাবাদ উৎসবের কোলাহলে মেতে ওঠে। নবাব প্রাসাদে উৎসবের পরশে প্রাণের সাড়া জাগে। স্মরণ করিয়ে দেয় সুদূর অতীতকে। ভাগীরথীর জলে স্পন্দিত হয় হাজার-দুয়ারীর প্রতিচ্ছবি। উৎসবের আলো-আঁধারিতে শিহরণ জাগে মুর্শিদাবাদের বুকে।"

সয়লা : মিলনের উৎসব

সয়লা বা সই-পাতানোর অনুষ্ঠান একটি খুশির উৎসব। এই বিচিত্র উৎসবটি এক সময় বাংলা দেশের সর্বত্র অনুষ্ঠিত হতো। নিম্নবর্ণের সমাজেও সই-পাতানো, মিতেপাতানোর ব্যাপক প্রচলন ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'উৎসব একলার নহে।

মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ'। সয়লা উৎসব বিশেষভাবে মিলনের, মিলনই 'সয়লা'র প্রধান উপাদান। তার জন্যই সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠান। মেয়ের সঙ্গে মেয়ের সই পাতিয়ে, ছেলের সঙ্গে ছেলের বন্ধুত্ব পাতিয়ে পরস্পরকে নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা হতো। মানব সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বন্ধুত্ব স্থাপনের এই অনুষ্ঠিত-উৎসবটি অতি প্রাচীন।

'সয়লার' উৎসভূমি কোথায় সে-বিষয়ে সকলেই নীরব। অনেকে অনুমান করেন 'সয়লা' কথাটি হিন্দী 'সাহেলী' শব্দ থেকে এসেছে। কারণ সাহেলী অর্থ সখী। 'সয়লা' উৎসবের মূল কথাই হলো বন্ধুত্ব বা সই-পাতানো। সাঁওতাল সমাজে এর প্রাধান্য দেখে অনেকে একে আদিবাসীদের উৎসব বলে মনে করেন। নৃবিজ্ঞানীদের মতে এটি আদিম সমাজের প্রাচীনতম 'ইনস্টিটিউশন্'। এম. জে. হারস্কোভিট্‌স্ লক্ষ্য করেছেন, আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের এই সামাজিক অনুষ্ঠানটির ব্যাপক প্রচলন আছে। বাংলার এই লুপ্তপ্রায়, স্বল্পপরিচিত অনুষ্ঠানটির সঙ্গে আফ্রিকার অধিবাসীদের অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য নৃবিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ অনুধ্যানের বিষয় হতে পারে।

মানুষ একা থাকতে পারে না। তাই আদিম যুগ থেকে সে সঙ্গী খুঁজে চলেছে। শুধু নারী-পুরুষের সঙ্গ নয়, খুঁজেছে বন্ধু-সখা-বয়স্যকে, যার কাছে মনের কথা বলা যায়, বিপদে-আপদে-রাজদ্বারে-শ্মশানে-শত্রু সঙ্কটে যার সাহায্য পাওয়া যায়, দেবতার আশীর্বাদের মতো অজস্রধারায়। পুরুষ খুঁজেছে তার সহযাত্রী পুরুষকে, নারী বেছে নিয়েছে অন্তরঙ্গ সখীকে। সাহিত্যেও দেখা যায় সখীর সমাদর। বয়স্য বুদ্ধি দেয় নায়ককে, সখী দূতিয়ালী করে নায়িকার। কোটাল পুত্তুরের দিন কাটে না, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ছাড়া শকুন্তলাকেও কল্পনা করা যায় না। সখা-সখী না থাকলে বুঝি মান-অভিমান, প্রেম-বিরহের সব কলাকৌশলই ব্যর্থ হয়ে যেত। রামায়ণ-মহাভারতেও দেখি সখাই বিপদের দিনে বড় সহায়। রঘুকুলপতি রামচন্দ্রের বিশাল সৈন্য কিংবা ভরতের মতো ভাইয়ের সাহায্য কোন কাজেই লাগল না সীতা উদ্ধারের সময়। অযোধ্যার সেনা অযোধ্যাতেই রইলো, সীতা উদ্ধার করল বানর সেনা—রামের সুগ্রীব সখার সেনা তারা। পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ না থাকলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বহু আগেই ভারতকাহিনীর যবনিকা-পতন হতো না কি? কাব্য, গল্প, লোকগাথা বা রূপকথা সবত্রই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলেছে। হয়তো এর পেছনে কাজ করেছে সেই আদিকালের সামাজিক প্রতিষ্ঠান (ইন্‌স্টিটিউশন)।

'সাহেলী' শব্দ হিন্দী বা মৈথিলী যেখান থেকেই আসুক না কেন, 'সয়লা' বাংলারই উৎসব। বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে বিহার, উড়িষ্যা, আসামে এ উৎসব

অনুষ্ঠিত হয় কিনা জানা নেই, তবে বাংলার বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী থেকে মৈমনসিংহ-ত্রিপুরা পর্যন্ত এই উৎসবের বিস্তার ছিল। গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠানের সময় 'সয়লা' উৎসব হয়। নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয় না বলে এটি নৈমিত্তিক উৎসবের মধ্যে গণ্য। বৈশাখ-শ্রাবণ বা পৌষ মাসেই প্রধানত 'সয়লা'র আয়োজন করা হয়। এর মুখ্য অনুষ্ঠান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বন্ধু নির্বাচন করা। স্থান বিশেষে অনুষ্ঠানগুলির ইতর বিশেষ ঘটলেও মূল উদ্দেশ্য ঠিকই থাকে। অন্যান্য পার্বণের মতো এতেও মেয়েদেরই প্রাধান্য। এখনও যে-সব জায়গায় এই উৎসব চলে আসছে, তাতে অংশগ্রহণ করে মেয়েরাই। গঙ্গাজল, সাগরজল, বকুলফুল, বেলফুল, নাকচাবি, মনের কথা প্রভৃতি ইচ্ছেমতো নাম দিয়ে মেয়েরা এই দিন 'সই' পাতায়। একবার এইভাবে বন্ধুত্বের নামকরণ হয়ে গেলে তখন তারা আর একজন অপর জনের নাম ধরে ডাকে না, পাতানো নামই ব্যবহার করে। দুই সখা বা সখীর একই নাম হলে তারা হয় মিতা। ছেলেরা হয় পরস্পরের সাঙাত। সাঙাতের স্ত্রী সাঙাতনী, সইয়ের স্বামী সয়া।

'সয়লা' উৎসব স্থানীয় দেবতার সামনে অনুষ্ঠিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্পদেবী মনসারই প্রাধান্য দেখা যায়। হুগলী জেলার বাগ্‌দী অধ্যুষিত অঞ্চলে 'সয়লা'র দিন স্থির করে সাপের ওঝা বা গুণীনেরা। তারা তিন বৎসর অন্তর কোন শনি বা মঙ্গলবার এই উৎসবের দিন স্থির করেন। ঘাটাল (মেদিনীপুর) অঞ্চলে গ্রাম দেবতার পূজারী বা গ্রামের মোড়লই 'সয়লা'র দিন ঠিক করেন। হাওড়া জেলায় প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে বা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে 'সয়লা' উৎসব হয়।

'মনসামঙ্গলে' মনসা বলেন ধন্বন্তরি-পত্নীর সঙ্গে সই পাতাবার জন্য :

'সাজিলেন কমলা শঙ্খিনীপুর জাত্যে।
কমলার সঙ্গে দেবী সই পাতাইতে॥
ক্ষীর দধি মালতী চন্দন পান গুয়া।
গন্ধমণি আমলা অগোর চান্দ চুয়া॥
পাট শাড়ী চাঁপা কলা খড়া ভর্য্যা দই।
ওঝার অবলা সঙ্গে পাতাইতে সই॥'

উৎসবে সই-পাতানোর অনুষ্ঠানটিও বিচিত্র। আসরে উপস্থিত হবার আগে অনেকেই মনে মনে 'সই' নির্বাচন করে রাখে। তার একটি ছোট্ট ছবি দ্বিজ দয়ারামের 'সই সাঙাতির কথা'য় পাওয়া যায় :

'ঘরকে আসি দুই জনাতে যুক্তি কৈল মনে।
আমরা করিব সই কার ঘরের সনে॥
দেখি আগে সকল লোক কেমন রূপ করে।
আমার মনে সাধ আছে করিব রায়ের ঘরে॥'

সই-পাতানোর পরে সারা জীবনের হার্দ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সয়ার সঙ্গে সাক্ষাতনীয় পরিহাস দোষাবহ হয় না। 'শিবায়নে' এই সুন্দর উদাহরণ আছে। কৃষকরূপে শিব এসেছেন মর্ত্যে, বাগ্‌দিনীর ছদ্মবেশে গৌরী এসেছেন মাছ ধরতে। আত্মভোলা শিব তাঁকে চিনতে না পেরে পত্নীর নাম-সদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে সই পাতিয়ে ফেললেন, 'চইলে আমার সই আমি তোমার সয়া'। অবশ্য সয়া (সখা) হয়েও আলিঙ্গনপ্রার্থী শিব সইয়ের কাছে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেননি, কিন্তু সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। বরং দুই সইয়ের অতিরিক্ত প্রীতি নিয়ে কিছু হাসির গান শোনালে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গানগুলিও 'সয়লা' উৎসবের অঙ্গ। ত্রিপুরার 'সহেলা' গান এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেখানে এক সখী অপর সখী বাড়ী যাবার পথে গান ধরে:

'সই সই বলিয়া সইনি আছ ঘরে গো,
বেদনী, আগো সই গো।
সইয়ের বাড়ীতে সইয়ে যাইতে পথে হাঁটু পানি গো,
বেদনী, আগো সই গো।
সইয়ের কাছে কইও খবর জাঙ্গাল বাইন্ধ্যা দিত গো,
বেদনী, আগো সই গো।
সইয়ের বাড়ীতে সইয়ে যাইয়ে রইদে কষ্ট পাইলাম গো,
বেদনী, আগো সই গো।
সইয়ের কাছে কইও খবর ছত্র লইয়া আইত গো,
বেদেনী, আগো সই গো।
খিড়কি দুয়ার বেতের বান্ধ সব পালাইল ঘরে গো,
বেদেনী, আগো সই গো।
সইয়ের কাছে কইও খবর বাইর কইরা দিত গো,
বেদনী, আগো সই গো।

'সয়লা' অনুষ্ঠানের সমীক্ষায় দেখা গেছে স্বজাতীয়দের মধ্যে সংখ্যায় বেশি হলেও জাত বা বিত্ত এ উৎসবে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে না। ব্রাহ্মণ ও বাগ্‌দীর সখ্য স্থাপন দুর্লভ নয়। তেলি, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, তাঁতির সঙ্গেও

ব্রাহ্মণের সখ্য স্থাপনের উদাহরণ আছে। সই পাতাবার পরে সইয়ের পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নীকে নিজের পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নীর মতোই সম্মান করতে হয়। সইয়ের পুত্র-কন্যাকে নিজের সন্তানদের সঙ্গে এক করে দেখা হয়, ছেলে-মেয়েরাও মায়ের সইকে 'সইমা' সম্বোধন করে। সুখে-দুঃখে দুই সই জীবনের সব কিছুকে ভাগ করে নেয়। এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক সমাজকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ব্রাহ্মণেরা নিম্নবর্ণের লোকদের গৃহে সাধারণত অন্ন গ্রহণ করেন না, কিন্তু 'সয়লা' উৎসবে আনুষ্ঠানিক সখ্য স্থাপনের পরে ব্রাহ্মণেরা সাজাত বা সইয়ের গৃহে পংক্তি ভোজনে বসতে পারেন। যে সময় অস্পৃশ্যতা নিয়ে ভারতবর্ষের অন্যত্র রীতিমত আন্দোলন চলেছিল, গান্ধীজীকে নামতে হয়েছিল হরিজন আন্দোলনে, তার বহু আগে থেকেই বাংলার একটি ক্ষুদ্র লোকোৎসব কত সহজে সামান্য উপকরণ নিয়ে অসবর্ণ মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ককে দৃঢ়তর করতে এগিয়ে এসেছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

—চিত্রা দেব

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

স্মৃতিভূষণ, অনাথনাথ : বিহিত পূজানুষ্ঠান পদ্ধতি বা পঞ্চতত্ত্ব/কলকাতা, ১৩৩১

করণ, সুধীরকুমার : সীমান্ত বাংলার লোকযান, কলকাতা,

রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙালীর ইতিহাস [আদিপর্ব] কলকাতা ১৯৪৯

মজুমদার, রমেশচন্দ্র : বাংলাদেশের ইতিহাস [প্রথম খণ্ড] কলকাতা

গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার : বাংলার লোকশিল্প, কলকাতা

ঘোষ, বিনয় : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি [১ম—৪র্থ খণ্ড], কলকাতা

বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ : বাংলার লৌকিক দেবদেবী, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস : বাঙ্গালার ইতিহাস, কলকাতা,

পালিত, হরিদাস : আদ্যের গম্ভীরা, মালদহ, ১৩১৯

চক্রবর্তী, অবিনাশচন্দ্র : পূজা ও সমাজ, ১৩২১ কলকাতা

চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার : বাংলা সাহিত্যে মা, কলকাতা

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : লোকসাহিত্য, কলকাতা

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ : বাংলার ব্রত

ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলার লোকসাহিত্য [১ম/২য় খণ্ড], কলকাতা

: বাংলার লোকশ্রুতি, কলকাতা

ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী : সমীক্ষা, কলকাতা

মজুমদার, আশুতোষ : মেয়েদের ব্রতকথা, কলকাতা

চৌধুরী দুলাল : বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, কলকাতা

চৌধুরী, প্রমথ : প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান, কলকাতা

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার : জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, কলকাতা

সেন, সুকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদিপর্ব)

প্রাচীন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী, কলকাতা

সেন, ক্ষিতিমোহন : বাঙ্গালার সাধনা, কলকাতা

: হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা, ১৩৫৬

মিত্র, অশোক (সম্পাদিত) : পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা/[১ম—৪র্থ খণ্ড] কলকাতা

শরীফ, আহমদ : বাঙালী ও বাঙালা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৭৮

Dasgupta, Shashibhusan : Obscure Religious Cults, Calcutta, 1976
Dube, S. C. : India's Changing Villages, Bombay 1967
: Indian Village, Bombay 1967
Roheim, Geza : Psychoanalysis and Anthropology, New york, 1950
Propp, Vladimir : Theory and History of Folklore, 1984
West Bengal Govt. Press : India's Villages, Calcutta, 1955
Indian Council of Social Research New Delhi—A Survey of Research in Sociology and Social Anthropology, Vol. I, II & III/1972, 1974
Publication Division Govt. of India : Festivals of India., 1976
Mead, M. (ed) : Cultural Patterns and Technical Change, Paris, 1953

পত্র-পত্রিকা

ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি
পুরোহিত দর্পণ
লোকসংস্কৃতি পত্রিকা, কলকাতা
ছত্রাক, পুরুলিয়া
আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা
দেশ, কলকাতা
সমকালীন, কলকাতা
কৌশিকী, হাওড়া
কৃষিলক্ষ্মী, কলকাতা
ভারতবর্ষ, কলকাতা
পারের, কলকাতা